অনুশীলন

ও

পুরোহিত।

সম্পাদক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সূচী।

কলিকাতা

৭৭।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

---

৪৯ নং ফিয়ার লেন, "মোহন প্রেস" হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

অনুশীলনের সমালোচনা।

(1) We have received the first five numbers of this Bengali month edited by Pandit Mahendranath Vidyanidhi. It was not long sin that we had an occasion to say, in noticing a book of his, that Pan Vidyanidhi was well known to the literary world as a notable writer Bengali prose. From the numbers before us, we can say that Pand Vidyanidhi has well sustained his reputation. The new magazine contains many pieces and it promises to be a welcome accession to the ranks of the Vernacular literature of the day.

—The Amritabazar Patrika, March 4,1895.

(2) Anushilan vol 1, nos 2 and 3. Out of the thirteen papers embodied in the double number of the above magazine before us, no less than si are devoted to the notice of Bengali Theatricals. Five of these, relate to current plays, and the sixth, rather the first and foremost, contains an account of Amateur theatricals in Bengali which on point of painstaking research forms a valuable contribution on the subject. The magazine is under the supervision of pandit Mahendranath Vidyanidhi., who seems to have taken an active and important part in its conduct.

—*Indian Mirror, 23rd Feb., 1895.*

(৩) "অনুশীলন নূতন মাসিক পত্র ও সমালোচন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধারক। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন' বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অনেক নূতন লেখক নবানুরাগে, নূতন উৎসাহে, ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 'অনুশীলনে' অনেক বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয়, নিজে আমাদের দেশীয় রঙ্গভূমির এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালায় একটী নূতন জিনিষ হইবে। "অনুশীলনে' বেশ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে গ্রন্থাদির সমালোচনা হইয়া থাকে। সমালোচক এজন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।'

—জন্মভূমি. ১৩০১। ফাল্গুন।

(৪) "অনুশীলন—মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত। এই নবপত্রে বিষয়-সন্নিবেশের বৈচিত্র্য ও রচনার পারিপাট্য আছে। নবীন পত্র দীর্ঘজীবী হইলে আমরা সুখী হইব।" —হিতবাদী, ১৩০১। ১১ই ফাল্গুন।

(৫) "আমরা এই পত্রিকার ১ম, ও ২য়, সংখ্যা পাইয়াছি।" "বৌদ্ধমঠ" ও "সখের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত' এই দুইটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধ গুলিও বড় মন্দ হয় নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ১৩০১। ২৮শে মাঘ।
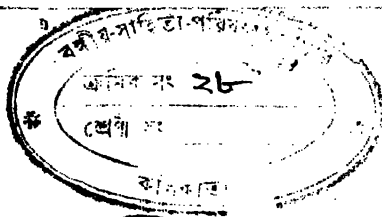
অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় ভাগ } ১৩০২ সাল, বৈশাখ। { প্রথম সংখ্যা।

আহ্বান।

এখন' রয়েছে ছায়া
যদিও ফুটিছে আলো।
এখন' চাহিছে ফিরে
আঁখি যেন ছল ছল
নয়নে আলস মাখা,
হৃদয়ে স্বপন আঁকা,
পরাণ চাহেনা যেতে
তবু বলে চল চল
দুঃখ, ত্রাস, বারমাস
তাই নিয়ে স'রে গেল।

সম্পাত করিয়া অই
পুরাতন চ'লে যায়
ধীরে ধীরে পায় পায়
তবু ফিরে ফিরে চায়;
পড়িছে অঞ্চল খ'সে,
জলে আঁখি যায় ভেসে,
শ্বসিয়া উঠিছে প্রাণ
করিতেছে হায়! হায়!
না জন্মিতে এ জগতে
মরণ পশ্চাতে ধায়।

জন্মিল নবীন উষা
লয়ে মুখ-ভরা হাসি
ফুটিল প্রভাতে নব
কত ফুল রাশি রাশি
ধরণী নয়নতুলে,
হাসিল বেদনা ভুলে,
পলক ফেলিতে কিবা
ছড়াইল রূপ রাশি—
গাহিল মঙ্গল গাথা
বিহগ মধুরে ভাসি।

নবীন প্রভাতে আজ
জাগিছে নবীন আশ—
নবোল্লাসে হৃদি ভরা
থাকে যেন বার মাস
আর যেন ক্ষুণ্ন মনে,
যুঝিনা জীবন রণে,
আর যেন এ পরাণে
নাহি জাগে ভয় ত্রাস
দেবতা—বাঞ্ছিত-সুখে
পূর্ণ কর অভিলাষ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

সমালোচনের অনুশীলন *।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

পরাজিত করিব, এই প্রকার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এবং উত্তোলিত খড়্গ লইয়া অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার প্রতি মনোযোগী না হইয়া বঙ্কিমবাবু কি বলিয়াছেন এবং অমৃত বাবুই বা কি বলাইতেছেন পুস্তকের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তখনও বঙ্কিম বাবুর অন্তর্নিহিত ভাব এবং ব্যবহৃত ভাষা জাগিতেছিল। সুতরাং এক দৃশ্য ও অপর দৃশ্যের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা বা পার্থক্য আছে তৎপ্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর পান নাই; সুতরাং তিনি পুস্তক পাঠ করার অপেক্ষা, যে অভিনয় দর্শন করিয়া অধিক আনন্দলাভ করেন নাই তাহা কিছু বিচিত্র নহে। আবার বলি যে আমার উক্ত অনুমান যে অভ্রান্ত, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমার অনুমানকে সমর্থন করিবার দুইটি বিষয় আছে। কারণ, প্রথমতঃ এমন অনেকগুলি ভদ্রমহোদয়ের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি, যাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং উপন্যাসের ঘটনা তাঁহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অভিনয়ের মধ্যে কোনও বিশেষ অসম্পূর্ণতা বা ব্যবধানতা অবলোকন করেন নাই এবং তাঁহারা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ও আমোদ প্রমোদ প্রদান করিতে পারে না। প্রয়োজন হইলে এই অধীন লেখনিধারকও তাহা প্রমাণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

তৎপরে লেখক বলিতেছেন, পুস্তকপাঠে যে জীবন্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, অভিনয়ে তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহা আমরা যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করি, কিন্তু তিনি পুস্তকপাঠ করিয়া যে শৈবলিনী, প্রতাপ ও

চন্দ্রশেখরকে দেখিতে পাইয়াছেন অভিনয়ে তাহা দেখিতে না পাইয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন সে দুঃখে আমরা আদৌ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিলাম না; এই নিমিত্ত তিনি যদি আমাদিগকে পাষাণহৃদয় বলিয়া গালি-প্রদান করেন, আমরা তাহা অবনত-মস্তকে ও অকাতরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। ভাবিয়া দেখুন "চন্দ্রশেখরের" মধ্যে বঙ্কিম বাবু যে কয়েকটী প্রধান চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার একটীও কি সাধারণ? তাঁহার চন্দ্রশেখর বল, প্রতাপ বল, শৈবলিনী বল, এমন কি দলনীও বল, সমুদয় চরিত্র গুলিই আদর্শ! সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র-প্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলিতেছেন যে চন্দ্রশেখর চরিত্রটী আমাদিগের এ দেশীয় কবির কল্পিত আদর্শ চিত্র, সুতরাং দেখুন চন্দ্রশেখর কেবল আদর্শ চিত্র নহে, তাহা আবার কল্পিত। বঙ্কিমের প্রতাপ যে আদর্শ ও অদ্বিতীয় তাহা বলা বাহুল্য, গিরিজা বাবু তাঁহাকে দেবতা বলিয়া গিয়াছেন, শৈবলিনীও যে স্বাভাবিক চরিত্র নহে, গিরিজা বাবু তাহাও বলিয়া গিয়াছেন, তিনি এক স্থলে বলিতেছেন "শৈবলিনীর চরিত্র যে ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মত হয় নাই এ কথা সম্পূর্ণ আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না।" সর্ব্বশেষে দলনীর অপার্থিব ভাল-বাসাও নিতান্ত অসাধারণ নহে। দেখা গেল, বঙ্কিম বাবুর এই কয়টি প্রধান চরিত্র অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরমোৎকর্ষ নির্লিপ্ত সংসারী চন্দ্রশেখরের ন্যায় চরিত্র সমগ্র বঙ্গদেশে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। মহাবীর আত্মত্যাগী প্রতাপের ন্যায় দেবতার দ্বিতীয় উদাহরণ স্থল কোথায়? একাধারে সাহস ও ভালবাসা লইয়া শৈবলনীর ন্যায় কোন বঙ্গ-রমণী সংসারের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছে? নবাবদিগের উপভোগের নিমিত্ত শত সহস্র রমণী আজন্ম রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু কয় জন বেগম স্বামীর আজ্ঞায় বিষপান করিয়াছে? সুতরাং যে বিষয়ের দ্বিতীয় উপমাস্থল নাই, অথচ যাহা আদর্শ, সে প্রকার বিষয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। মানব যতই কেন চরমোৎকর্ষ বিবেচনা করুক না তথাপি তাহার মধ্যে কতকটা অস-ম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। সেই কারণবশতঃ চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, শৈবলিনী ও দলনীর চরিত্রের গভীরত্ব স্থির করা দুরূহ—কল্পনার দ্বারা এক জন যাহাকে সুসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন, অপর এক জন সেই আদর্শ বস্তুর মধ্যে

আরও কিছু অধিক বিষয়ের আবশ্যক দেখিলেন। কিন্তু কল্পনার মধ্যে এই প্রকার বিভিন্নতা থাকিলেও যত দূর সম্ভবপর ষ্টারের প্রতাপ, চন্দ্রশেখর ও দলনী তাহা পূর্ণতার সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন—তবে বর্ত্তমান শৈবলিনী সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে।

কিন্তু লেখক মহাশয় তাহাতেও সন্তুষ্ট হয়েন নাই—তিনি ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম—শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরকে গ্রন্থকার যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, নাটককার স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়—অভিনেতা-অভিনেত্রীগণও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তৎপরে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে ত্রুটি প্রদর্শন করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত দু এক বার মাত্র প্রয়াস পাইলেও প্রথমোক্ত বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই—কিম্বা করিতে সাহসী হয়েন নাই ;—প্রতাপ সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

তৎপরে লেখক মহাশয় দেড়পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেমের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু আলোচনার বিষয়ের সহিত তাহার যে কি সম্বন্ধ তাহা তাঁহার সমুদয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও বুঝিতে পারা গেল না। প্রধান পাত্র ও পাত্রীগুলির প্রেমের বিশেষণ করিয়া তিনি সমালোচনার মধ্যে কি সাহায্য পাইলেন,তাহা লেখক স্বয়ংই জানেন। তবে যদি এই বিশেষণ কার্য্যে স্বকীয় সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করা তাঁহার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতে হইতেছে যে তিনি দুই স্থলে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাক্যব্যবহার রূপ গাম্ভীর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এক স্থলে বলিতেছেন "চন্দ্রশেখরের প্রেমে কামনা একেবারেই নাই"। যদি এ স্থলে কামনা এই শব্দের অর্থ ভোগেচ্ছা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে লেখকের ইহাই বলা উদ্দেশ্য—যে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ভাল বাসিলেও সে প্রণয়ে শারীরিক সুখভোগের আদৌ সংশ্রব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। চন্দ্রশেখরের প্রেমে কামনা ছিল, কিন্তু তাহা বহির্বিকশিত হইতে পারে নাই। ভোগেচ্ছা ও শাস্ত্রপাঠ এই দুইটি প্রবলশক্তির মধ্যে পতিত

হইয়া তিনি অনেক সময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেন। বঙ্কিমবাবুই বলিয়া গিয়াছেন"এক দিন গভীর রাত্রে চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। * * * সেই বিলাস চাঞ্চল্য-শূন্য, সুষুপ্তি সুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল"। আর একস্থলে "আমার যে বয়স তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই।" আবার "এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি তাহা করিব না"। পুনরায়, যখন তিনি নবাবের বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন তখন দূর হইতে স্বগৃহ দেখিয়া তাঁহার বেশ আনন্দ হইয়াছিল? শৈবলিনীর পীড়াশঙ্কা করিয়া কেনই বা তিনি ভীত হইয়াছিলেন, শৈবলিনী যদি উৎকটরোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে তাহা হইলে আর বাঁচিব না—এ প্রকার চিন্তাই বা চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে কেন উদিত হইয়াছিল? এই সমস্ত বিষয় দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে যে তাঁহার প্রেমে আদৌ কামনা ছিল না? ছিল, কিন্তু—তাহা আর একটি শক্তির দ্বারা পরাভূত হইয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু তাহা হইলেও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। সর্পদৃষ্ট পক্ষী যেমন পলায়ন করিবার নিমিত্ত শতচেষ্টা করিয়াও কি এক মোহিনীশক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নড়িতে পারে না অথচ প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে থাকে—চন্দ্রশেখরের পক্ষে ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। কামনার দ্বারা চালিত হইয়া কখনও কখনও তিনি শৈবলিনীর রূপ দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন—কিন্তু শাস্ত্রপাঠ তাঁহাকে সংসারপথে যাইতে নিষেধ করিত। গিরিজা বাবু বলিতেছেন অন্তঃ-সলিল-বাহিনী ফল্গু নদীর ন্যায় চন্দ্রশেখরের প্রণয় আপন মনেই বহিয়া যাইতেছিল—বাহিরে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

এতৎপ্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন যে "চন্দ্রশেখরের ভালবাসা—স্থির গম্ভীর, গাঢ় ও গভীর। সে প্রেম-সমুদ্রে লহরী একেবারেই নাই। রামানন্দ যে ভাবে জগৎকে ভালবাসেন চন্দ্রশেখর সেই ভাবে শৈবলিনীকে ভালবাসেন।

কথা গুলি শ্রুতি-মধুর কারণ ইহার অধিকাংশই বঙ্কিমবাবুর ; কিন্তু লেখক কি ইহাদিগের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন? পরে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে ত তাহা বোধ হয় না। তিনি লিখিতেছেন "এখনও তাঁহার (চন্দ্রশেখরের) প্রেম জগদ্ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; শৈবলিনীর বিবাহের পর তাঁহার প্রণয় জগৎ ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল।

তাহার "পর প—বাবু" বলিতেছেন, প্রতাপের ভালবাসা, শৈবলিনীর সুখের জন্য। শৈবলিনীকে সুখিনী করিবার জন্য প্রতাপ, নিজহৃদয়কে বলী দিয়াছেন। শৈবলিনী যাহাতে সুখিনী—প্রতাপ আজীবন তাহাই করিতে ব্যস্ত।" এত ক্ষণ পরে লেখকের গুণ গরিমা অবগত হওয়া গেল ; "অমৃতবাবু প্রতাপ, শৈবলিনী, ও চন্দ্রশেখরের চরিত্র ইত্যাদি বুঝিতে পারেন নাই" ইত্যাকার যে সমস্ত বাক্য ব্যবহার করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহার কারণ নির্ণয় করা নিতান্ত আয়াসসাধ্য বিষয় হইবে না। এক্ষণে দৃঢ়তাসহকারে বলা যাইতে পারে যে লেখক স্বয়ংই প্রতাপের চরিত্র আদৌ বুঝিতে পারেন নাই ; তাহা না হইলে তিনি কখনই বলিতেন না যে শৈবলিনীকে সুখিনী করিবার জন্য প্রতাপ আজীবন ব্যস্ত।" প্রতাপ জীবনের মধ্যে কেবলমাত্র দুইবার শৈবলিনীর সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। একবার জীবনের প্রারম্ভে, সেই মধুময় বাল্যকালে যখন প্রাণত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উভয়ে কুল-প্লাবিত গঙ্গার জলে সাঁতার দিতে দিতে ডুবিয়াছিল! আর একবার জীবনের শেষাবসানের অনতিপূর্ব্বে যখন পাপিষ্ঠা শৈবলিনী আত্মসুখের জন্য প্রতাপকে বলিয়াছিল "তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই...এরূপে তুমি আমার সাক্ষাৎ করিও না"—তখন প্রতাপ—শৈবলিনীকে সুখিনী করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিল! কিন্তু প্রতাপ বাল্যকালে সেই গঙ্গার জলে মগ্ন হওয়ার পর হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিল, তাহা কি শৈবলিনীকে সুখিনী করিবার জন্য করিয়াছিল? যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শৈবলিনী যখন বলিল "আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি—"ইত্যাদি তখন প্রতাপ বাহুপ্রসারিত করিয়া শৈবলিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিল না কেন? তাহাকে গালি দিলই বা কেন?" তাহা করে নাই তাহার কারণ এই যে

শৈবলিনীকে সুখিনী করা প্রতাপের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না, প্রতাপ আজীবন যাহা করিয়াছিল তাহা পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর জন্য নহে—তাহা তাহার গুরু চন্দ্রশেখরের জন্য। "চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন।" প্রতাপের জীবনের উন্নতির মূলকারণ চন্দ্রশেখর, প্রতাপ কি সে ঋণ বিস্মৃত হইতে পারে? গিরিজাবাবুও বলিতেছেন "এক চন্দ্রশেখরই প্রতাপের লক্ষ্য হইলেন; * * * প্রতাপ সেই চন্দ্রশেখরের সুখকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিলেন। ইহাই তাহার জীবন—সমুদ্রে একমাত্র পরিদর্শন হইল।" মাননীয় সমালোচক মহাশয় স্পষ্টই লিখিতেছেন যে চন্দ্রশেখরের সুখবর্দ্ধন করাই কৃতজ্ঞ প্রতাপের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; শৈবলিনী তাহার গুরুপত্নী বলিয়া সে তাহাকে বিদখুত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিল—প্রতাপের চরিত্র যে প্রকার পবিত্র ও স্বার্থশূন্য তাহাতে অন্যরূপ বিবেচনা করাই অন্যায়।

প্রতাপ একটি সর্ব্বপ্রধান চরিত্র; সেই চরিত্র সম্বন্ধে আদ্যন্ত একটি ভ্রম ধারণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া লেখক মহাশয় যে অমৃত বাবুর অজ্ঞতার প্রতি দোষারোপ করিবেন, তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবার কোনও কারণ নাই। একটা প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্যের মধ্যে গোড়া হইতে গলদ্ প্রবেশ করাইয়া তিনি যে প্রকার গর্ব্ব করিতেছেন—তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

তাহার পর লিখিতেছেন "জননীর ভালবাসা কোমল, নবনী অপেক্ষাও কোমল।" এ অদ্ভুত উপমার দ্বারা পাঠকের যে অধিক জ্ঞানবৃদ্ধি হয় তাহা নহে। তাহার পরই "দলনীকে অধিক ভাল বাসেন—স্নেহ করেন বলিলেও ক্ষতি নাই।" ভালবাসা ও স্নেহের মধ্যে কি প্রকার পার্থক্য দেখাইতেছেন তাহা বুঝা গেল না।

প্রথম দৃশ্যে শৈবলিনীর সহিত ফষ্টরের কথোপকথন সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন যে "যাঁহারা উপন্যাস পাঠ করেন নাই তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়া প্রকৃত শৈবলিনীকে দেখিতে' পাইবেন না। দেখিবেন একটা সুন্দরী কুলটা যুবতী একটা লম্পট গোরার সহিত গৃহত্যাগ করিতে অগ্রগামিনী।" ইহা পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে লেখক উপন্যাসখানি ভাল করিয়া পাঠ করেন

নাই, অভিনয়-দর্শন-কালীনও ভাল করিয়া মনোযোগ প্রদান করেন নাই।' লেখক যাহা বলিতেছেন বরং পুস্তক পাঠ করিয়াই তাহা মনে হয়। পুস্তকে এই প্রকার ভাব আছে তালবৃক্ষতলে ইংরাজ আসিল, সুন্দরী পলাইল—তাহাকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। সাহেব আসিয়াই বলিল "I come again, fair lady." শৈবলিনী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না"। কোনও লজ্জা নাই, কোনও ভূমিকা নাই, একেবারে সাহেবের সহিত কথোপকথন!

কিন্তু দর্শকে পাছে কোনও প্রকার ভ্রমে পতিত হয়, সেই জন্য বঙ্কিমবাবু যাহা দেন নাই অমৃত বাবু সেই ভূমিকা প্রদান করাইয়াছেন। কথা গুলি অবিকল স্মরণ হইতেছে না, তবে ভাব এই যে শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া আপনা আপনি বলিল আবার সেই মুখপোড়া সাহেব টা এসেছে! তা আমার ভয় কি, আমরা নারী—পুরুষকে খেলিয়ে বেড়ানই ত আমাদিগের কাজ—দেখি কি বলে ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু যে ভাবটি পরে প্রকাশ করিয়াছেন, অমৃতবাবুকে বাধ্য হইয়া তাহাকে আগেই প্রকাশ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত সতর্কতাতেও নিস্তার নাই, অমৃতবাবুর দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে!

দ্বিতীয় দৃশ্যে লেখক মহাশয় চন্দ্রশেখরের পরিচ্ছদ হইতে তাঁহাকে "নব্যবাবু" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। তাহার কারণ দেখাইতেছেন যে "যিনি পুঁথি লইয়া চির উন্মত্ত, কেশ ও গুম্ফ কখনও রাখেন না; বিশেষতঃ যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে এরূপবেশী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন সন্দেহ নাই।" কিন্তু যে ব্রাহ্মণ দিবারাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া বিব্রত, এমন কি যাহার এমন অবসরও নাই যে একবার অতুলা সুন্দরী যুবতী সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃক্পাত করে, সেই নির্লিপ্ত সংসারী অবিরত শাস্ত্রধ্যয়নে নিযুক্ত চন্দ্রশেখরের কি বাহ্যিক আড়ম্বর সংরক্ষণের সময় ছিল? শারীরিক সৌষ্ঠবসম্পাদনের প্রতি ত তাঁহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না; তাঁহার কেশ তৈলাভাবে রুক্ষ ও যত্নাভাবে জটাভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল, সে সময়ের মুসলমানগণের আকার হইতে পার্থক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত সামাজিক নিয়মানুযায়ী শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিতে বাধ্য হইতেন। স্বয়ং বঙ্কিম বাবুও প্রথমাবধি চন্দ্রশেখরকে এইরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, মসৃণমস্তকের সর্ব্বোর্দ্ধ ভাগ হইতে

আস্কন্ধ বিলম্বিত শিখা বা সমুদয় গাত্রে হরিনামের ছাপ মারিয়া চন্দ্রশেখরকে একটি সাংসারিক ও বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় টোলের পণ্ডিত করা গ্রন্থকারের কখনই উদ্দেশ্য ছিল না। তবে তাঁহার "নব্যবাবুর" সংজ্ঞা কোথায়? লেখক বলিতেছেন, কেন শৈবলিনীর মন, চন্দ্রশেখরে আকৃষ্ট নহে তাহা এ দৃশ্যে কিছুই উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।" ইহার অর্থ কি? কেন, প্রথম দৃশ্যেই ত শৈবলিনী সুন্দরীকে সমস্ত বলিয়াছে; লেখক কি বলিতে চাহেন যে চন্দ্র-শেখরের আকৃতি কৃষ্ণকায়, শ্রীফল মস্তক বিশিষ্ট, কৃশ ও কদাকার হওয়া উচিত ছিল? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে শৈবলিনীও চন্দ্রশেখরের চরিত্র লেখক যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত পাঠকবর্গই তাহা বিবেচনা করিবেন।

চতুর্থ দৃশ্যে সুন্দরী ও শ্রীনাথের মধ্যে যে রসিকতার সমাবেশ করা হই-য়াছে, লেখক তাঁহার আবশ্যকতা (?) দেখেন না। কিন্তু শ্রীনাথের চরিত্র বর্দ্ধিত করিয়া সুন্দরীর চরিত্রটি কতদূর বিকশিত হইয়াছে লেখক তাহা দেখিতে পাইয়াছেন কি? কেবল মাত্র ঘটনাকে সরস করিবার উদ্দেশ্যেও উহার অবতারণা করা হয় নাই; সুন্দরীর চরিত্রে কতটা তেজ, কতটা স্বামী-ভক্তি কতটা রসিকতা আছে নাট্যকার এই দৃশ্যে তাহার সূচনা প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্য ষষ্ঠ দৃশ্যে যখন আমরা সুন্দরীর সতেজ বাক্য শ্রবণ করিলাম না, আমরা তখন বিস্মিত হইলাম না—সুন্দরীর পক্ষে যে এ প্রকার বাক্য ব্যবহার করা সম্ভবপর তাহার প্রমাণ আমরা চতুর্থদৃশ্যেই প্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম। এই কারণবশতঃই সুন্দরীর ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক অভিনয় আমা-দিগের আদৌ অপ্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয় নাই—লেখক মহাশয়েরও নিকট তাহা উত্তম বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

তৎপর দৃশ্যে দেবগ্রামবাসিগণকে দর্শকের সম্মুখে আনয়ন করাতে লেখক মহাশয় কথঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়াছেন—কিন্তু আমরা তাহার কোনও কারণ দেখি না। সংস্কৃত নাটকে, বিশেষতঃ কালিদাসের প্রায় সমুদয় নাটকেই বিষ্কম্ভক বলিয়া একটী অধ্যায় থাকে। যে সমস্ত প্রধান ঘটনাগুলি দর্শকের নিকট সহজেই বর্ণিত হওয়া অসম্ভব, কিম্বা যে গুলি বর্ণিত হইলে নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, সেই সেই স্থলে অপ্রধান ব্যক্তির অবতারণা করিয়া, নাট্যকার ঘটনাগুলিকে বিবৃত করেন এবং ইহার সহিত সরস অংশের

প্রবর্ত্তন করাও নিয়মসিদ্ধ; ইহাই বিষ্কম্ভকের প্রধান উদ্দেশ্য ও বিবরণ। পরের দৃশ্যে ফষ্টরের বজরায় শৈবলিনী উপবিষ্টা; একেবারে তাহার মুখ হইতে পূর্ব্বঘটনা প্রকাশিত না করিয়া, যদি অমৃত বাবু কয়েকটি অপ্রধান ব্যক্তির মুখ হইতে ঘটনাটিকে সরস করিয়া অবগত করান, তাহা হইলে, তাঁহার কার্য্য আদৌ নিয়মবিরুদ্ধ হয় নাই। লেখক এ দৃশ্যকে অনাবশ্যক বলিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা না করিলে দর্শকবর্গ কি প্রকারেই বা পূর্ব্ব রাত্রের ডাকাতির বিষয় অবগত হইবেন? লেখকের ভাব বোধ হয়, যদি কতিপয় দস্যু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া লম্ফঝম্পপূর্ব্বক শৈবলিনীকে পাল্‌কি করিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে ব্যাপারটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত! লেখক বড়ই ভাবগ্রাহী!

তাহার পরের দৃশ্য চন্দ্রশেখরের অর্দ্ধ দগ্ধ চণ্ডিমণ্ডপ। লেখক বলিতেছেন, মূল পুস্তক পাঠ করা না থাকিলে এ সকল দৃশ্য বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। কেন? পুস্তকে যে প্রকার দৃশ্যটি বর্ণিত আছে, দৃশ্যপটে তাহা অবিকলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে—ভৃত্য সনাতনের সহিত কথোপকথনে দর্শকমাত্রেরই ঘটনাটি বুঝিতে আদৌ বিলম্ব হয় নাই। লেখক কি বলিতে পারেন, এ দৃশ্যে এমন কিছু নাই যাহা পুস্তকে আছে সুতরাং তাহা বুঝিতে হইলে পুস্তক পাঠ অত্যাবশ্যক?

তৎপরবর্ত্তী চিত্রে গুরগণ খাঁ ও দলনীর কথোপকথন লেখক বুঝিতে পারেন নাই, যেহেতু হয় তিনি আদ্যন্ত মনোযোগী হয়েন নাই, না হয় দূরতাবশতঃ শ্রবণ করিতে পান নাই। গুরগণ খাঁর স্বাগত চিন্তায় সমুদয় ঘটনাই বিবৃত হইয়াছিল সুতরাং উপন্যাস পাঠ করিবার কোনও আবশ্যক দেখি না।

কিঞ্চিৎ পরেই লেখক বলিতেছেন, কিরূপে এবং কোথায় প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল ইহা না বলিলে প্রতাপের চরিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। লেখক প্রতাপের চরিত্র কি প্রকার উপলব্ধি করিয়াছেন আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি, সুতরাং তিনি যে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই অসম্পূর্ণতার ছায়া দেখিবেন তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রতাপ বিশেষ চতুরতা ও সাহস দেখাইয়াছিল,

কিন্তু তাহা কার্য্যে প্রদর্শিত না হইলেও ভাবে সূচিত হইয়াছিল। ফষ্টরের বজরায় যে শৈবলিনী আবদ্ধা, তাহা আমরা জানিতাম এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছিলাম, যে প্রতাপ রূপসীকে বলিয়া গিয়াছে "আমি চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না'। সুতরাং প্রতাপের গৃহে শৈবলিনী ও রামচরণকে দেখিয়া, এবং শৈবলিনীর মুখ হইতে "আমি কোথায় আমায় কে আন্‌লে" ইত্যাকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দর্শকবর্গের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শৈবলিনীর উদ্ধার সাধন হইয়াছে।

আবার প্রতাপ চরিত্রের কথা; লেখক এস্থলে অন্যায়রূপে নাট্যকারের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু লিখিতেছেন "প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুম রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালীন গঙ্গার স্থির শ্বেত বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না তাহা নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" গ্রন্থকারের বর্ণনানুযায়ী সুযোগ্য অভিনেতাও নিজগৃহে শয্যার উপর কে এক জন রমণীকে শায়িত দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—বিমুগ্ধ-নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়াও ছিলেন। কিন্তু লেখকের মন্তব্যানুযায়ী, বহুকাল এই প্রকার বিস্ফারিত-নেত্রে নিদ্রিতা শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া থাকিলে দর্শকমাত্রেরই হাস্যোৎপাদন হইবার একটি কারণ হইত। দর্শকগণ বুঝিতে পারিতেন—কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতাপ এরূপ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান আছেন; অনেকে, প্রতাপ স্বকীয় অংশ বিস্মৃত হইয়াছেন, এ প্রকার মনে করিয়া লইলেও লইতে পারিতেন। এই জন্য নাট্যকার তাঁহার মুখ হইতে স্বগত ভাবে "অনেকদিনের কথা" প্রকাশিত করিলেন। প্রতাপের "অনেকদিনের কথা", সেই সুখময় বাল্যকালের কথা, একে একে সেই ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া দু'জনে সান্ধ্য জল-কল্লোল শ্রবণ করা, সেই আকাশের তারা গণনা করা, জলে, নৌকায়

প্রতিফলিত আলোক দেখা, এবং শুভ্র চন্দ্রকিরণ-প্লাবিত ভাগীরথীর শ্যাম-তটের উপর অর্দ্ধসুপ্ত অসামান্যা সুন্দরী বাল্যসহচরীর অতৃপ্তরূপ দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া থাকার কথা মনে পড়িতে লাগিল—স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহৃত হইতে লাগিল, ইহার দ্বারা কি প্রকারেই বা গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের অপচয় হইল? লেখক বলিতেছেন "প্রতাপের মুখ হইতে শৈবলিনীর দীর্ঘ রূপবর্ণনা আরম্ভ হইল।" কিন্তু তাহা ত আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই—তবে যদি কেহ বলেন যে দূরতা-নিবন্ধন শুনিতে পাই নাই—তাহা সত্য নহে; কারণ, আমরা রঙ্গমঞ্চের অতি নিকটেই উপবিষ্ট ছিলাম। তাহার পর, নাট্যকারকে ছাড়িয়া তিনি অভিনেতার উপর আক্রমণ করিতেছেন। বলিতেছেন, তিনি প্রতাপ-চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাও বলি, এই খানে লেখক বঙ্কিম বাবুর "ধরণে বা ভাবে" মত প্রকাশ করিতে পারিলেন না; কারণ, তাঁহার কল্পিত প্রতাপ অনেকটা দুর্গেশ-নন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজের অনুরূপ। লেখক মহাশয় ভিন্ন প্রতাপের স্বাভাবিক অঙ্গবিক্ষেপ, বীরত্বপূর্ণ অভিনয়, সুস্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ, গভীর আত্মত্যাগ এবং বিশেষতঃ সেই অগাধজলে সাঁতার, সকল দর্শকেরই হৃদয়ে যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও সহানুভূতি ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছিল। সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট প্রতাপের চরিত্রটি যত দূর বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর, অভিনেতা তাহা সম্পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রুটি করেন নাই।

একটা পিস্তল সম্বন্ধে "প-বাবু" বলিয়াছেন, তাহা বালকদিগের ক্রীড়নক মাত্র কিন্তু আমরা যত দূর দেখিতে পাইয়াছি তাহাতে বোধ হইয়াছে যে ইহা নিতান্ত খেলিবার দ্রব্য নহে—এবং যদিও বা হয়, তাহা হইলে বড় বিপদজনক বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, লেখক স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে এই ক্রীড়নকের গুণাদি অবগত হউন, এ প্রকার পরামর্শ প্রদান করা আমাদি-গের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহা লইয়া ক্রীড়া করিতে গেলে যে হস্ত পদ ভগ্ন হইতে পারে—ইহা আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস।

"সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে" "মূল উপন্যাসে নাই" ইত্যাকার কতকগুলি নির্দ্ধারিত বাক্য ব্যবহার করিতে লেখক অতিশয় অভ্যস্ত। সেই অভ্যাস বশত তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ স্বামী উভয়েই দীর্ঘ

বক্তৃতায় নিযুক্ত—ইহা দ্বারা পুস্তকের সৌন্দর্য্য-হানি হইয়াছে; কিন্তু উভয়ে কি বিষয় কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা কি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন? রামানন্দস্বামীর মুখ হইতে যে সমস্ত তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ বহির্গত হইয়াছিল, চন্দ্রশেখরের বহিরাবেগশূন্য হৃদয়ের পক্ষে তখন তাহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে বরং নাট্যকারের ধীশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শৈবলিনী কি প্রকারে প্রতাপকে উদ্ধার করিল, দর্শকবর্গকে তাহা প্রদর্শিত না করাতে, লেখক মহাশয় বিবেচনা করেন যে "তাহাতে শৈবলিনীর চরিত্রের অর্দ্ধেক বাদ দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই অমৃত বাবুকে এ ত্রুটির জন্য বলিতেন।" অমৃতবাবু শৈবলিনী কর্ত্তৃক প্রতাপের উদ্ধার এরূপ ভাবে নেপথ্যেই প্রকটিত করিয়াছেন যে তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শিত হইবারই ন্যায় হইয়াছে। আর একটি কথা এই যে, আমরা পূর্ব্বে যাহা সন্দেহমাত্র করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হইয়াছে। মৃত বঙ্কিমবাবু ঠিক্ কোন্ কথাটি কোন্ স্থানে কাহাকে এবং কি উপলক্ষে বলিতেন, লেখক যখন তাহা বলিয়াছেন, তখন তিনি অন্তর্যামী না হইয়া আর যান না!

তাহার পর যোগবলে ফষ্টরের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহা,লেখক অবিশ্বাসজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। এরূপ বিবেচনার কারণ কি? যোগবল বা physhic forceএর বলে চন্দ্রশেখর যখন শৈবলিনীর মুখ হইতে সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন,লেখক তখন কি তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন? যদি হিন্দু হইয়াও আমাদিগের দেশের যোগবলকে তিনি অবিশ্বাস করেন—তাহা হইলে তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষেই সংঘটিত হইয়াছে বলিতে হইবে; কারণ যে প্রকার বৈষয়িক কাল পড়িয়াছে, তাহাতে গ্যানোর পদার্থবিজ্ঞান খানি ক্রয় করিলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপেক্ষা করা সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অমৃতবাবুও ফষ্টরকে যে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহাইলেন তাহা তাঁহার নিজের সৃষ্ট নহে; বঙ্কিমবাবু নিজেই ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, "রামানন্দ স্বামী ফষ্টরের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ফষ্টর সেই চক্ষুপ্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির

বশীভূত হইল, ক্রমে চক্ষু বিনত করিল, যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে" ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবুর এই কথাগুলি কি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই ?

সর্ব্বশেষে একটি বিষয় পাঠ করিয়া দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, লেখক বহুকাল হইতে নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট। কারণ তিনি পাঠকবর্গকে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে জানাইয়াছেন যে, পার্ব্বত্যপথ দৃশ্যে যে তোপধ্বনি হইতেছিল, তাহা প্রকৃত কামান নহে—সামান্য পটকা, এবং যে সুশ্রাব্য রণবাদ্য হইতেছিল তাহা ইংরাজ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নাদিত মিলিটারি ব্যাণ্ড নহে, কতিপয় অজাতশ্মশ্রু,অশিক্ষিত পিতৃমাতৃহীন দুর্ভাগ্য যুবক রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে গমন করিয়া ধীরে ধীরে কণসাটিনা বাজাইতেছিল। ভীষণ কর্ণভেদী দুম্‌দাম্‌ শব্দ শ্রবণ করিয়া হয় ত অনেকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত, কিন্তু লেখক মহাশয় সেই সমস্ত "গোলামের জাতি" কাপুরুষ বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের একটি মহদুপকার করিলেন। যখন তাহারা শ্রবণ করিবে যে সামান্য পটকা নাদিত হইতেছে এবং কেল্লা হইতেও ইংরাজ সৈন্য রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে না, তখন তাহারা কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্তে অভিনয় দর্শন করিয়া ভয়ের স্থলে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই প্রকার একদেশদর্শী সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গৌরব লাভ করিবার আশা করা অন্যায়। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃই হউক বা অন্য কোনও কারণ বশতঃই হউক কাহারও বিরুদ্ধে স্বমত পরিপোষক বাক্যবাণ প্রয়োগ করাকে প্রকৃত সমালোচনা কহে না। সমালোচনা, ব্যক্তি বিশেষের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইলেও তাহার সহিত যতটা সাধারণের ভাব মিশ্রিত থাকিতে পারে এবং থাকা সম্ভব তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং তাহাই প্রকৃত সমালোচনা নামের যোগ্য। শ্রী—ক।

সতীত্ব।

—:●:—

সতীত্ব অমূল্য রত্ন। এ রত্ন জগতের সকল দেশে অল্পবিস্তর থাকিলেও সকল দেশের জহরী ইহার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। এ রত্ন ভারত-বর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের গৃহে আছে বলিয়াই কেবল এ দেশের লোক ইহার যথার্থ গৌরব উপলব্ধি করিতে পারে। এই অমূল্য ধনের অধিকারিণী হইয়া বিপুল বিভব-শালিনী মহারাণীর যেরূপ গৌরব, ধনধান্যবিহীনা, ভিক্ষান্ন-জীবিনী দরিদ্র রমণীর গৌরব তদপেক্ষা কোনমতে ন্যূন নহে। এ সতীত্ব রত্ন অর্থব্যয়ে লাভ করিতে না হইলেও ধনরত্নাদির ন্যায় বহুযত্নে ও সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। ভারত-মহিলা অর্থাভাবে, অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও এই অমূল্য রত্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। বেগবতী দয়া-নদী যে দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা, সে দেশের অনাথা রমণীগণ সহজ-লভ্য ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনযাপন বরং সুখকর ও শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়া থাকেন, তথাপি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সতীত্ব রত্নের বিনিময়ে অন্ন-সংস্থান করিতে অভিলাষিণী নহেন। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য সকল দেশেই বর্ত্তমান।

রমণীগণ অবলা ও অসহায়া হইলেও, তাহারা হৃদয়-ভাণ্ডারে সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করিতে বিশেষ পটু। উপায়-হীনা কুটীরবাসিনী স্বধর্ম্ম-পরায়ণা ললনার মন অর্থ-লোভে মোহিত হয় না। রূপলাবণ্য-সম্পন্ন প্রতিভাশালী যুবাপুরু-ষের বিমোহন-কারী বপু, সতীত্ব-প্রভায় উদ্ভাষিতা কুরূপা কামিনীর চক্ষে মলিনীকৃত বোধ হয়। সুধা-ধবলিতা, মনোহারিণী রাজ-অট্টালিকা পর্ণশালা-নিবাসিনী ভিখারিণীর লক্ষ্য-স্থল হয় না। ধরাসনে সামান্য শয্যায় শয়ানা ধর্ম্ম-পথে স্থিতা ধর্ম্মশীলা রমণীর চিত্ত, বিলাসী পুরুষের দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও বিচিত্র পালঙ্ক, আকর্ষণ করিতে পারে না। বসন-ভূষণ-প্রিয়া নারী-জাতি একান্ত দুর্লভ-চরিত্র রত্ন দূরে নিক্ষেপ করিয়া অসৎ উপায়ে বসনালঙ্কার পরিতে বাসনা করে না। তাহারা অবলা হইলেও জ্ঞানবলে বলবতী।

অলঙ্কারপ্রিয়া হইলেও ধর্ম্মপথচারিণী বলিয়া লোভসংবরণে আদর্শ-স্থানীয়া। তাহাদের মনের তেজ, সতীত্বের অহঙ্কার, চরিত্রের গৌরব তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ধর্ম্মপথে রক্ষা করিয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত রমণী সতীত্ব-রক্ষার্থ যেরূপ অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, বোধ হয় কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোন দেশের কোন জাতীয় রমণী তদনুরূপ বীরত্ব দেখাইতে পারে নাই। রমণীললামভূতা ভারতবর্ষীয়া ললনার ঈদৃশী চিত্ত-চমৎকারিণী বীরত্ববিবরণী পাঠ করিলে কোন্ নির্দ্দয়-হৃদয় পাষণ্ডের অন্তঃকরণ বিমল আনন্দ রসে আপ্লুত না হয়। মানব জীবন পদ্ম-দলস্থিত জলবিন্দুবৎ অস্থির ও দূর্ব্বাদল শিরে মুক্তা ফল সদৃশ শোভমান শিশির বিন্দুবৎ পতনোন্মুখ সেই অস্থায়ী জীবন রক্ষার জন্য তাহারা স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দিত না। সতী রমণীর চক্ষে জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবনের মায়াজালে জড়িত হইয়া তাহারা কখনও সতীত্ব-রত্নের বিঘ্ন ঘটাইত না। তাহাদের চক্ষে এরূপ অনল আছে যে তাহারা কোপ-কটাক্ষ করিলে অনিষ্টকারী পুরুষ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

যে সমস্ত রমণী, ধর্ম্ম-পথ-চারিণী—পাপহারী হরি তাঁহাদের সহায় হন। ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে করিতে বিপন্ন হইলে, বিপদ-বিনাশন মধুসূদন আসিয়া স্বয়ং সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। পাণ্ডব-সভায় দুরাচার দুঃশাসন যখন ধর্ম্মপরায়ণা দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন তাঁহার সকরুণ বিলাপে পীত-বসন হরি বসনরূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। মহাবল দুর্বৃত্ত দশানন অমিত বল ও বিক্রমে বলীয়ান হইলেও, কেবল সতীর কোপানলেই নিহত হইয়াছিল। সীতা-চরিত্রে সন্দিহান হইয়া যখন রামচন্দ্র সতীকুলের শীর্ষস্থানীয়া প্রণয়িণীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন তিনি অনল আশ্রয় দ্বারা আপন মান রক্ষায় মনঃস্থ করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্ হইলেও সতীর গাত্র স্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না। সতীর তেজঃপ্রভায় অগ্নিদেবের জ্যোতিঃ যেন শ্রীহীন হইয়া নিষ্প্রভ হইল। প্রজ্জ্বলিত অনল শিখা মধ্যে সতীর অঙ্গ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছিল। তখন এই অদ্ভুত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভগবানের অন্তঃকরণ হইতে মোহ-জাল অপহৃত হইয়া

গেল। তখন তিনি সীতার সতীত্ব-প্রভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। কালাকাল বিচার বিমুখ কালও সতীর সম্মুখীন হইয়া আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সাধনে তৎপর হইতে পারেন নাই। তাঁহার তেজোময় যমদণ্ড সর্ব্বভূতের বিনাশ-সাধনের হেতু হইলেও, সতী সাবিত্রী সন্নিধানে হীনপ্রভ হইয়া গেল। সতীর করুণ বিলাপে কাল হৃদয় ও দয়ার্দ্র হইয়াছিল। জগতের ইতিহাসে ইহা কখনও ঘটে নাই, এবং কখনও যে ঘটিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই।

"ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং, সমাজোৎসব দর্শনং।
হাস্যং পর গৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা॥"

পতি দেশান্তরে যাইলে পতি-গত-প্রাণা সতী-সীমন্তিনী,ক্রীড়া,শরীরের সংস্কার, সামাজিক উৎসব দর্শন, হাস্য, পরগৃহে গমন,এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতেন।

পতিপ্রাণা রমণী সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দিনাতিপাত করিতেন। গৃহকার্য্য হইতে অবসর পাইলে, স্বামীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। মনে আনন্দ না থাকিলে, ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হয় না। ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে আমোদ প্রিয় হইতে হয় বলিয়া,প্রোষিতভর্ত্তৃকা ক্রীড়া করিতেন না। রথ,দোল, ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে, বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। লোকারণ্য মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর লোক থাকায়, তন্মধ্যে পতি-বিরহ-কাতরা সতী রমণীর অবস্থিতি কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। পতির বিদেশ প্রবাসে হাস্য ও পরগৃহে গমন বা পরগৃহে বাস তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক বা সুখদায়ক নহে।

কপট দ্যূত ক্রীড়ায় রাজ্যৈশ্বর্য্য হারাইয়া বন গমন করিলে, পতিরতা রাজ-দুহিতা দময়ন্তী নলের সহিত কঠোর বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সতী অতুল সুখের আস্পদ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়া ছিলেন। চির-সুখোচিত রাজান্তঃপুর-বাসিনী কুলকামিনী সিংহ শার্দ্দুলাদি হিংস্র জন্তু, বহুল বিপদ সঙ্কুল, সু-খাদ্য-বিহীন দুর্গম-কাননের ক্লেশ মনে ধারণা না থাকিলে, পতি-বিচ্ছেদ অধিকতর ক্লেশকর বিবেচনায় গৃহবাস ছাড়িয়া স্বামীর অনুগমন করিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যারূপা কুলবধূ কখনও গৃহের বাহির না হইলেও হাস্যমুখী হইয়া স্বামীর দৈবী আপদের অংশভাগিনী হইতেন। কাননে কোমল পদযুগল কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত

হইয়া রক্তোৎপলের অনুরূপ হইলে কখনও সে দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় শয়ন ও কটু-কষায়-ফলমূল ভক্ষণ করিয়া তাহারা সৌধ প্রসাদ-নিবাসে রাজসুখ উপভোগ করা অপেক্ষা, অধিকতর সুখানুভব করিতেন। ধনবানের একমাত্র কন্যা সমাদরে পালিতা হইলেও স্বামীর কুটীর-বাস সুখ-প্রদ-জ্ঞানে সানন্দে কালাতিপাত করিতেন। একদিকে পার্থিব সুখ ও অপর দিকে স্বামী-গৃহে অশেষ ক্লেশ—এই উভয় বিধের শেষোক্তটী তাঁহারা আগ্রহের সহিত স্বীকার করিয়া লইতেন। তাই আমাদের দেশ অতুল আনন্দের স্থান ও পার্থিব স্বর্গ বলিয়া অনুমিত হইত। যে দেশের রমণী স্বামীর জন্য ইহলোকের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভর্ত্তার অংশ ভাগিনী হয়, মলিন মুখ দেখিলে সজল নয়নে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, সে দেশে পুরুষ শাকান্ন-জীবী হইলেও বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

ধন-মদ—মত্ত গজনী-পতি মামুদ, মোগল-কুল-প্রধান তৈমুর, গঙ্গা ভারত লুণ্ঠনকারী আহাম্মদ আলি প্রভৃতি সমস্ত মহাবল রণকৌশলবিৎ মোগল পাঠান, রত্ন-প্রসূ ভারতবর্ষের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বীর-ভার্য্যা বীর-প্রসবিনী ভারত মহিলার উপর আধিপত্য করিতে পারেন নাই। সতীত্ব-রত্ন-লোলুপ দুর্ব্বৃত্ত যবনগণ তীব্র-বিক্রম-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। যে দিন চিতোরের ভীমসিংহ পত্নী পদ্মিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য-প্রতিবিম্ব যবন-চিত্ত-ফলকে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই পদ্মিনীলাভের আশা তাহার মনকে ব্যাকুল করিল। তিনি কারারুদ্ধ ভীমসিংহকে পদ্মিনী বিনিময়ে মুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু সেই ললনাশ্রেষ্ঠা বিপদে অভিভূতা না হইয়া বরং দ্বিগুণ সাহসে ভর করিয়া স্বামীকে সু-কৌশলে বন্দী দশা হইতে বিমুক্ত করিলেন। সতীত্বের প্রভাবে কেবল আর্য্য-রমণী ভীষণ সমর-সাগরে দেহতরি ভাসাইতে পারিয়াছেন। কোমল করে তীক্ষ্ণধার তরবারি ধারণ করিয়া, ভারত ইতিহাসে বীরমহিলার চূড়ান্ত দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। সুবর্ণালঙ্কার সুশোভিতা কমনীয় কলেবরে সুকঠিন লৌহ বিনির্ম্মিত বর্ম্ম-সমাবৃত করিয়াছেন। চরিত্র রত্ন প্রধান লক্ষ্যস্থল বলিয়া তাহারা এতাদৃশী বীর্য্যবত্তা দেখাইতে পারিয়াছেন। অন্য দেশের মহিলা

শিক্ষিতা, জ্ঞান-দর্পিতা ও বুদ্ধিমতী হইয়াও ভারত রমণীর ন্যায় অত্যদ্ভুত বল-বিক্রম দেখাইতে পারেন নাই। শারীরিক বলে আর্য্য-রমণী অন্য দেশের নারী-জাতির অতিক্রম যোগ্যা নহে, কিন্তু তাহাদের মনে যে তেজ দীপ্তিমান, যে তেজঃপ্রভাবে তাঁহারা এবম্বিধ কার্য্য-কলাপ করিতে পারিয়াছেন, সেই তেজঃপ্রভা একান্ত দুর্লভ ও সর্ব্বজাতি সাধারণ নহে। আর আজ কাল যে অস্মদ্দেশীয়া রমণীগণের হৃদয়ে সে তেজঃপ্রভা ক্রমশঃ ম্লানদ্যুতি হইতেছে, প্রাচীন-আর্য্য-রমণীর পথানুসরণ না করাই তাহার প্রধান কারণ। রমণী কায়মনোবাক্যে সতী হইলে কোনরূপ মানুষী বা দৈবী আপদ তাহাদের অভিভূত করিয়া বিড়ম্বনার হেতু হইতে পারে না। যাবতীয় বাধা বিঘ্ন সাহসে ও কৌশলে অতিক্রম করিয়া বিপদ মুক্ত হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের সকল প্রদেশেই সতী রমণীর বসতি আছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়া সতী রমণীর ন্যায় তাঁহারা সতীত্বের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। স্বামীতে দেবত্ব জ্ঞান না থাকিলে রমণী কখনও অতুল সুখে বিসর্জ্জন দিয়া অপার দুঃখার্ণবে নিমজ্জিত হইতে পারিত না, দাসীর ন্যায় সেবাপর হইয়া স্বামি-সুখ-বর্দ্ধিনী হইতে পারিত না, পারিবারিক কার্য্যরত হইয়া উদয়াস্ত শারীরিক পরিশ্রমে সংসার চালাইতে পারিত না। কেবল আপন চরিত্র ও কুলমান বজায় করিয়া চলিলেই সতীর ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। ইহ লোকে পতিই সতীর উপাস্য দেবতা, পতিই তাহার আরাধ্য, পতিই তাহার একমাত্র গুরু। এরূপ পবিত্র ভাব রমণীর মনে না থাকিলে সতী রমণী কি পতির চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিত? পবিত্র প্রেম সকল দেশেই আছে, সকল দেশের রমণীইত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন্ দেশের রমণী প্রাণোপম পতির দেহাবসানে অমূল্য জীবন অনল-শিখায় বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে? যে দেশে পুরুষগণ আপন চক্ষে রমণী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করে, বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরে পরস্পরের ঐক্যমত হইল বিবেচনায় বিমল আমোদ উপভোগ করিবার প্রয়াসী হয়, তত্তৎ দেশের রমণীগণ কি স্বামীর জন্য ইহলোকের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুলালী। *

—:*:—

(সমালোচনা।)

বৃক্ষলতাশূন্য অনাবৃতদেহ ছায়াহীন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বত। সেই কৃষ্ণগিরি সমস্ত দিবসের রবিকিরণে উত্তপ্ত। সে এমনই ভীষণ যে, ভীষণতায়ও যে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহাতে তাহাও নাই! সে এমনই উত্তপ্ত যে, তাহার চারিধারেই দিবানিশি সে উত্তাপ উদ্গীরণ করিতেছে! বুকের ভিতর এমনই উত্তাপ লইয়া নিয়তই সে পুড়িতেছে,—একটু শান্তি, একটু শীতলতা তাহাতে নাই!

এমনই পর্ব্বত। তাহার পদপ্রান্তে অনন্তহৃদয়া, তরঙ্গ ভ্রূকুটীহীনা, স্থিরা, পুণ্যতোয়া নদী। নদীর জল বড় স্বচ্ছ, বড় শীতল। দিন নাই, রাত নাই, অবিশ্রান্ত পদপ্রান্তে পড়িয়া, এই নদী, পর্ব্বতের পানে চাহিয়া আছে। অম্বুকণাসংস্পৃষ্ট শীতল সমীরণ, পর্ব্বতের সে উত্তপ্ত দেহ জুড়াইতে সমর্থ নহে! নদী, আপনার স্বচ্ছ বুকে, অতি ভীষণ হইলেও, পর্ব্বতের সে কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে।

এই পর্ব্বত, আর এই নদী, দু'য়ের মাঝখানে একটী বড় ছোট লতিকা—সে বড় কোমল, বড় মধুর, বড় স্নিগ্ধ। কোমলতায়, মাধুর্য্যে, স্নিগ্ধতায়,—সে বড় সুন্দর! তেমন সুন্দর, কেবল বুঝি প্রকৃতির বিশাল বুকে, আর কবির মানস-উদ্যানেই শোভা পাইয়া থাকে। এ 'কুহক দুরিন্ত পূর্ণ' সংসারে তেমন একটী আর দেখিতে পাই না।

---

* বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত—নূতন উপন্যাস। মূল্য ।৷০ আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। এই সমালোচনা পাঠের পূর্ব্বে, পাঠককে এক বার "দুলালী" পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি। অনেক বলিবার ছিল, নানা কারণে বলিয়া উঠিতে পারি নাই। দুই চারি ছত্রে যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্ট করিয়া ও সব কথা বলিতে পারিলাম না। তবে "কোমলে কঠোরে" মিলাইয়া "দুলালী" রচয়িতা যে কেমন একটু নূতন ধরণের সুন্দর সৃষ্টি অঙ্কিত করিয়াছেন, আমি কেবল পাঠককে, তাহাই দেখাইবার জন্য অন্ততঃ একটুকুও অগ্রসর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। লেখক।

আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে প্রেম-ডোর, তাহাতেই না বিশ্ব বাঁধা? লতিকাও তেমনই, দুই খানি ক্ষুদ্র বাহুতে, পর্ব্বত ও নদী দুই আলিঙ্গন করিয়া আছে। সেই আলিঙ্গনের মাঝে দুইই বাঁধা পড়িয়াছে।

নদীর চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা। লতিকার ক্ষুদ্র পদ্মহস্ত খানি সে চক্ষু চাপিয়া আছে, আর অশ্রু বহিতে দিবে না! পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গে সূর্য্য-কিরণ; লতিকার অন্য হস্ত পর্ব্বতের অঙ্গে, তাহা রবিকিরণ হইতে ছায়া দিবে! বড় সুন্দর সৃষ্টি!

দিনে দিনে, একটু একটু করিয়া নদী শুকাইতে লাগিল। তট-প্রান্তে দাঁড়াইয়া যদি দেখিতে পার, বুঝিতে পারিবে, তাহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিয়াছে!

এক দিন সহসা সেই শেষ মুহূর্ত্ত আসিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন এক বার খুব উজ্জ্বল আলোকে জ্বলিয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্তে, নদীহৃদয়ও তেমনই এক বার খুব স্ফীত হইয়া উঠিল। অগাধ জলরাশিতে পর্ব্বত ঢাকিয়া ফেলিল! মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি পর্ব্বতের সন্তপ্তদেহ জুড়াইল! সে বুঝিল, বুকের আগুন নিবাইতে, পৃথিবীতে এমন কিছু আর নাই! হায়! এত দিন কেন দেখে নাই, কেন এ পদদলিতাকে তুলিয়া হৃদয়ে স্থান দেয় নাই!

তট-প্রান্তে দাঁড়াইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের মত, এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, স্ফীতবক্ষাঃ নদী ক্রমশঃই অবসন্না হইয়া পড়িতেছে, পর্ব্বত ততই যেন পূর্ণ আবেগে তাহাকে বুকের ভিতর টানিতেছে কিন্তু মহাকালের সে মহাকর্ষণে কে বাধা দিবে? সহসা শুনিলাম, নাভি-কুণ্ডোত্থিত নাদস্বরে পর্ব্বত ডাকিতেছে——"গৃহলক্ষ্মী আমার, প্রাণাধিকে, সতী!——"

চমকিয়া দেখিলাম, নদী শুকাইয়া গিয়াছে সে স্থান! ধূ ধূ করিতেছে। ললিত লতিকাটী ভূমিতে আছাড়িয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তের সঙ্গে অদৃশ্য হইল? পর্ব্বত আবার সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, এবার আরও ভীষণ! পুণ্যবতীর পুণ্যফলে, এ কঠোর মূর্ত্তিতেও তবু একটা সৌন্দর্য্য ছিল; সকল সময়ে সে পাপ-উত্তাপ উদ্গিরণ করিতে পারিত না। সে শোভাময়ী গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সে সৌন্দর্য্যও

গিয়াছে। সে স্থান ধূ ধূ করিতেছে; বিশাল পর্ব্বতের বিশাল ছায়া, অতি ভীষণ ভাবেই সে বিশাল শূন্য পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; একবার সেখানে দাঁড়াইয়া পর্ব্বতের পানে চাহিয়া দেখ, পর্ব্বত কি ভীষণ!

এই কঠোরতার পার্শ্বে এখনও তবু সেই "দুলালী" লতিকাটী আছে! নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত ক্রোড়ে যেন নিদাঘ সায়াহ্নের স্নিগ্ধ ছবিখানি সাজান রহিয়াছে! বড় মধুর সৃষ্টি!

পর্ব্বত স্বীয় হৃদয়ে সমস্ত উত্তাপ সঞ্চয় করে, আর সম্মুখে যাহা পায়, তাহাতেই তাহা উদ্গিরণ করে। সে বিষের আগুণ যাহার গায়ে পড়িত তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইত।

বনে একটা মহা কালসর্প বাস করিত। এক দিন, যেমন এক মুহূর্ত্তে সেই ভীষণ পর্ব্বতের এক গহ্বর মধ্যে, এই কাল ভুজঙ্গ আশ্রয় লইল! কাল্ ভুজঙ্গের বিষভরা বুকের যেখানে একটু শূন্য স্থান পাইত অমনই তাহাতে এমনই করিয়া বিষের রাশি ঢালিয়া দিত যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সে অতি ভীষণ হইয়া উঠিত! তাহার ভয়ে, কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না, তাহার অত্যাচারে কেহ সুখ-শান্তি পাইত না! পর্ব্বত—হিংসা! ভুজঙ্গ—কাল্!

সকলেই আকুল-প্রাণে, দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত,—আকাশের বজ্র পড়িয়া এ মহাপাপের ভীষণ মূর্ত্তি সর্ব্বসমেত চূর্ণীকৃত হউক।

এত ভীষণ ও অত্যাচারী হইলেও, পর্ব্বতের হৃদয় একেবারে স্নেহশূন্য ছিল না; বরং সে পাষাণ প্রাণে স্নেহের চিহ্ন বড় গভীর রেখা-পাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে সেই মৃতপ্রায় লতিকাটীকে বড় ভালবাসিত। আপনার প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিত। জগৎ সংসারের তাবৎ প্রাণীকে হিংসা করিলেও, তাহার ভালবাসাটুকু বড় খাঁটি ছিল। সেই পাপেভরা বুকের ভিতর হইতে, কাল মেঘের বুকে, মধুর বিদ্যুৎটুকুর মত, সেই যে এক টুকু বড় পবিত্র মন্দাকিনী বহিত, "দুলালী" লতিকাটীকে সে তাহাতে ডুবাইয়া রাখিত!

বিষম অত্যাচারে, বিষম দ্রূপে সকলকে প্রপীড়িত করিয়া, পর্ব্বত ভাবে, —কি জানি যদি কেহ তাহার সেই অতি যত্নের সামগ্রী, সেই জীবন-সর্ব্বস্ব বুকভরা লতিকাটীর উপর কোন অত্যাচার করিয়া, তাহার প্রতিশোধ

লয়! এই ভাবনার সহিত তাহার ভয় হইতে থাকে। তখন, সকল চক্ষুর অন্তরালে, আপনার আড়াল করিয়া, সে, তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন,—সে কি সর্ব্বনাশেরই দিন!—একদিন বিষম অনর্থ ঘটিল। কাল ভুজঙ্গ কাহাকে দংশনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল! পর্ব্বত অমনই শীকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিল! কিন্তু যে শীকার সে ফাঁদে পড়িল, পর্ব্বত তাহা দেখিল না।

সহসা পর্ব্বতের সর্ব্বদেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল! এমন ভাব তাহার আর কখন হয় নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখে, যেন শুধু অন্ধকার! চারিদিকে যেন শুধু কাহার অভাব! বুকের উপর যেখানে সেই স্নেহময়ী লতিকাটী ছিল, দেখিল—তাহা সেখানে নাই। বুক খালি করিয়া, কে তাহাকে পথ ভুলাইয়া, কোন্ প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়াছে! পর্ব্বত-হৃদয় চঞ্চল হইল।

সেই স্থান, যেখানে ললিত লতিকাটী ঈষৎ বায়ুভরে দুলিত; করুণ আঁখিদুটী আকাশপানে তাকাইয়া, নীরব ভাষায়, কোন অদৃশ্য দেবতার চরণে, প্রাণের কি আকুল ভাষা জানাইত; যেখানে সমীরণ আসিয়া, কত ছলে লতিকাটীর সহিত খেলা করিতে ভালবাসিত, পর্ব্বত দেখিল,—মুহূর্ত্তের বিরহে সে স্থান মহাশ্মশান! সেই সমীরণ বহিতেছে, কিন্তু সে সমীরণে সে মৃদুমধুর সঙ্গীত নাই, সে "হো হো" শব্দে চারিদিক চমকিত হইতেছে! পর্ব্বতের অন্তরের অন্তরতম দেশেও সে শব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে!

পর্ব্বত সমস্ত বুঝিল। অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া কাল্ ভুজঙ্গের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সে যে ফাঁদ পাতিয়াছিল, দেখিল, তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব দুলালী লতাটী তাহাতে পড়িয়া ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। কাল ভুজঙ্গের কাল দংশনে, কোমল-প্রাণার হাসিমুখ খানি মলিন হইয়াছে।

পর্ব্বত, চক্ষে অন্ধকার দেখিল! সেই অন্ধকারে তাহার চক্ষু ফুটিল সেই চক্ষে যেন দেখিল, পদ-প্রবাহিতা সেই স্রোতস্বতী আবার পর্ব্বতের সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া, তাহার উত্তপ্তদেহ শীতল করিতেছে! আবার যেন উভয়ের মাঝখান টুকু হইতে সেই কোমল লতিকাটী দুইজনকে হাতে হাতে ধরিয়া, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর ভাবে, দুই জনকে প্রেম-ডোরে বাঁধিতেছে!!

চক্ষের জলে, সে সুন্দর অন্ধকার টুকু ঘুচিয়া গেল।—তখন?

তখন প্রতিহিংসার আগুন ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, পর্ব্বতের সে ভীষণ মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হইল! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতেছে। পর্ব্বতেরও সেই অবস্থা। সুরে সুর মিশিল!

ভুজঙ্গ তখন গহ্বর ত্যাগ করিল; পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ হইতে আগুন বাহির হইতেছে, সে আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না। বাহিরে আসিল, প্রকৃতি ভীষণা! ভয়ে তাহার জীবাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময়ে হতভাগ্য সভয়ে দেখিল,—পর্ব্বত, সংহার-বেগে তাহাকেই বিনষ্ট করিতে ছুটিয়াছে! তখন সে ভীত প্রাণে কোথায় লুকাইতে চাহিল, কোথায় লুকাইবে? পাপিষ্ঠ, কএকদিন হইল, যৌবন-শোভনা একটী হরিণীকে দংশন করিয়া, তাহার ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ পিতার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল! আজ সেই বিপদের সময় সে দেখিল, যেন সেই কন্যা-হারা পিতা তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার নয়ন হইতে ধক্ ধক্ করিয়া আগুন বাহির হইতেছে! হতভাগ্য, দেখিতে দেখিতে দেখিল, সেই নয়ন নির্গত অগ্নিরাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে মণ্ডলাকারে উর্দ্ধে উঠিল, শেষে ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্রাকারে তাহা তাহার মস্তকে পড়িল! কালভুজঙ্গ বজ্রাঘাতে পাপ-জীবন শেষ করিল!—পর্ব্বত তাহা জানিল না।

জল স্থল ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া বজ্রপাত হইতেছে, তদধিক গভীর গর্জ্জনে পর্ব্বত হৃদয় আলোড়িত হইতেছে। শত্রু সংহার করিতে হইবে, শত্রু কোথায় পলাইল? চারিদিকে অন্ধকার! পর্ব্বত, প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল, প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে শত্রু বিনষ্ট করিল।

আলোক জ্বালিওনা, আকাশের মুখ হইতে মেঘ টানিয়া লইওনা, মেঘের বুক হইতে বিদ্যুৎ বাহির করিওনা! তাহা হইলে, সে আলোকে মহাপাপী দেখিবে,—যাহাকে সে শত্রু ভাবিয়া পদদ্বয়ে চাপিয়াছে, সে শত্রু নহে, সে শত্রু অত্যাচারে-দলিতা তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব সেই দুলালী-লতা?

"পাপিষ্ঠ কি ভাবিয়া, অন্ধকারে, আততায়ীর ছিন্ন মুণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিল। ছিন্ন মুণ্ড মিলিল বটে;—কিন্তু এ কি! সে কাল ভুজঙ্গ কোথায়? এ যে তাহার নয়ন পুত্তলির ছিন্ন মুণ্ড! অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

"এই বার পাপিষ্ঠ আপন হাত আপনি দংশন করিতে লাগিল; অধরোষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া জিহ্বা টানিয়া বাহির

করিবার চেষ্টা পাইল। নাদস্বরে, দুঃখিত ভাবে, পাপিষ্ঠ ডাকিল,—"দুলাল"!

"হরি হরি হরি! সে স্বর আর মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না—একটা বিকট দীর্ঘশ্বাসেই লয় পাইল।

"পাপিষ্ঠ আত্মত্যাগ করিতে,শাণিত কৃপাণ উত্থিত করিল; কিন্তু হাত হইতে তাহা খসিয়া পড়িল। শূন্যে আর এক খানি কোষমুক্ত কৃপাণ দেখিল;—যেমন তাহা ধরিতে গেল,জড় অসি অট্টহাস্য করিতে করিতে কোথায় অন্তর্হিত হইল!

"আবার সেই মৃত কন্যার চাঁদমুখ দেখিতে ইচ্ছা হইল। যাহাকে প্রাণান্ত-পণে ভালবাসিয়া, জীবনের যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, বিধির বিধানে, আজ তাহাকে স্বহস্তে বধ করিয়া তাহার সেই ধূল্যব-লুণ্ঠিত ম্লান মুখ-খানি দেখিতে, হতভাগ্যের অতৃপ্ত ইচ্ছা হইতেছে। পাপিষ্ঠ আর একবার কাঁদিতে চেষ্টা করিল। আবার সেই অতি অস্পষ্ট নাদস্বরে, মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া. হতভাগ্য অতিকষ্টে কহিল,—"মা, দু—লা—ল"!

"পাপিষ্ঠ এবারও কাঁদিতে পারিল না। এই বার সেই (স্থানে) বীভৎস বেশে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। হস্তে ও অধরোষ্ঠে দংশন করিয়া রক্তপাত করিল,—একবার যদি, কোনও মতে ডাক্ ছাড়িয়া, প্রাণ খুলিয়া, একটুও কাঁদিতে পারে!

"হতভাগ্য আবার উপবেশন করিল; মৃত কন্যাকে কোলে লইল; কাটা ধড়টা ও মুণ্ডটা এক করিল; সকল স্মৃতি এককালে জাগাইল; সবটা মন প্রাণ এক করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিল; হরি! হরি! হরি! এবারও অতি কষ্টে, সেই নাভিকুণ্ডোত্থিত নাদস্বরে দুটি দুই মাত্র কথা অতি অস্পষ্ট ভাবে, বিকট নিশ্বাসের সহিত মুখ হইতে বাহির হইল,—

"মা, দু—লা—ল্!"

পর্ব্বতের সে অবস্থা আর দেখিও না; তাহার পানে আর চাহিও না; সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে, দৃষ্টিহীন হইবে, শ্বাসরুদ্ধ হইবে, প্রাণহারা হইবে!

বড় ভীষণ সৃষ্টি!

সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, ও ভীষণতায় "দুলালী" কবির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

——— শ্রীবিপিন বিহারী রক্ষিত।

দোল-যাত্রা।*

(রূপক)

অস্মদ্দেশে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, শ্রীকৃষ্ণের দোল-যাত্রা হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা যেমন শারদীয় মহোৎসব, দোল-যাত্রাও তদ্রূপ বাসন্তী মহোৎসব। এই বসন্তোৎসবের আগমনে নরনারী সকলেই প্রফুল্লচিত্ত ও আমোদ প্রমোদে রত হয়েন কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই হয়'ত দোল-যাত্রার প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন না অথবা করিতে চেষ্টাও করেন না। আবির, গুলাল ও পিচ্‌কারী লইয়াই ইহার কার্য্য নহে কিম্বা ইষ্টকনির্ম্মিত দোলমঞ্চে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দোলাইলে প্রকৃত দোল হইল না। ইহার আধ্যাত্মিক ভাব অতি সুন্দর ও উহা যে যোগিগণের অভি-লষিত বস্তু তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। দোলযাত্রায়, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ (প্রকৃতি ও পুরুষ), চিত্ত (দোলমঞ্চ) সিংহাসন বা দোলচৌকি (মানব-হৃদয়স্থ চতুর্দ্দল পদ্ম) ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ (চৌকী ঝুলাইবার রজ্জুস্বরূপ) এবং মন (সখি)। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর মধ্যে পঞ্চবায়ু রুদ্ধ করিলে, প্রাণ বায়ু, অপান ও ব্যান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া উভয় ভ্রূর যুগ্ম-স্থলে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি জ্ঞান নেত্রে সংযোজিত হয় এবং তন্মুহূর্ত্তে হৃদয়ে চতুর্দ্দল পদ্মাসীন প্রকৃতি পুরুষের (জীবাত্মা ও পরমাত্মার) দোলন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহাই প্রকৃত দোল এবং যোগী পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন না। রাধার উক্তি।—

আইল বসন্ত, জাগিল যুমন্ত
প্রকৃতি সতী, হাসিল আবার।
চ্যূত মুকুল, কদম্ব বকুল
ফুটিল, ছুটিল সৌরভ ভার॥

---

* যথা সময়ে এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু স্থানাভাবে এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। লেখক, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রী—সম্পাদক।

কিংশুক কর্ণিকা, যুঁথি সেফালিকা,
মল্লিকা কণক চম্পক যত।
জাতি গন্ধরাজে, পেয়ে ঋতুরাজে
ধরামাঝে তারা সেজেছে কত॥
আসব আশায় ষটপদ ধায়,
ঝঙ্কার রবেতে ভরিল প্রাণ।
অশান্ত অতনু, লয়ে ফুল ধনু,
বিন্ধিতে সখি হ'ল আগুয়াণ॥
দেখ না বহিল, মলয় অনিল,
শিহরিল মোর অঙ্গ স্বজনি!
চেতনা বুঝিবা হরে এখনি॥

(২)

প্রেমের বসন্ত সখি! হৃদয়ে উদিত দেখি,
চল চল হৃদিনাথে করি অন্বেষণ।
সারা বর্ষ গেল কেটে, সংসার জলধি তটে,
বসন্ত হৃদয় মাঝে উদেনি কখন॥
বিবেক কোকিল কভু, জানা'য়ে দেয়নি বিভু,
রুদ্ধকণ্ঠ ছিল সে যে রিপুর অধীনে।
কাটিয়াছে তম ঘোর, সত্ত্বের নাহিক ওর,
সুমতি মলয় বায় বহে ক্ষণে ক্ষণে॥
পরাণ-অপান-ব্যানে, মিলিয়াছে সংগোপনে,
সুষুম্না প্রস্তুত দেখি দিবা বিভাবরী।
এইত সময় হেরি, লভিবারে সে মুরারী,
কর' না বিলম্ব সখি! চল অগ্রসরি।

(সখীর উক্তি)

(৩)

শোন গো শ্রীমতী!
হেরিতে শ্রীপতি,
চল আশুগতি
বৃন্দাবন ধাম।

বিনা বৃন্দাবনে,
কেমনে সে জনে,
হেরিবে এখানে,
হৃদয়ের শ্যাম॥

পিনহ দুকূল,
ছাড়হ গোকুল,
পাইবারে কূল,
অকূল পাথারে।

সেই ত শ্রীহরি,
ত্রিভঙ্গ মুরারী,
বিপদ কাণ্ডারী
খ্যাত চরাচরে।

যাইয়া তথায়,
হেরি শ্যাম রায়,
জুড়াইবে হায়!
নয়ন তোমার।

রোধি প্রাণ পঙ্কে,
নাশিয়া প্রপঙ্কে,
হৃদি-দোল-মঞ্চে
দোল অনিবার।

পুরুষ প্রকৃতি,
মিলিয়া সংহতি,
দোলে দিবারাতি
কে দেখেছে কবে।

যে দেখেছে দোল,
মিটে গণ্ডগোল,
বলি "হরি বোল"
পার হয় ভবে॥

সখির পরামর্শে বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় শ্রীহরির দর্শন না পাইয়া (মায়াবশতঃ সংযোগরাহিত্যে) বিরহবিধুরা রাধার (সাম্যপ্রকৃতির) সখির প্রতি উক্তি (সৃষ্টি করণের অভিলাষ।)—

(৪)

এই যদি বৃন্দাবন, কোথা বৃন্দাবন ধন,
কেন নাহি শুনি তবে ভ্রমরগুঞ্জন।
কেন বা বহিছে সখি বিরহ পবন॥

* একাদশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যোগক্রিয়ার কার্য্যস্থল।

কেন বা যমুনা-তটে, নাহি হেরি বংশীবটে
উন্মুখ গোকুল কেন ডাকে হাম্বারব।
পিককুল কেন সবে রয়েছে নীরব।
কোথা সে কদম্বশাখী, পীতবাস নাহি দেখি,
ম্রিয়মাণ শুক সারী করে অশ্রুপাত।
কি হেতু ঘটিল সখি এ হেন উৎপাত॥
সরসি কমল শূন্য, কমলাক্ষি বিনা অন্য,
কে আর ঘুচাবে মোর মনের বেদনা।
কৃষ্ণ বিনা অন্য কারে জানাব যাতনা॥
সই বুঝি কোন চোর, হরিয়াছে কানু মোর,
দেখ দেখ শিখীপুঞ্জ পড়ি ধরাতলে।
মোহন বাঁশরি দেখ যমুনার কূলে॥
শূন্য হেরি কুঞ্জবন, অস্থির হতেছে মন,
না মানে প্রবোধ সখি হ'ল একি দায়।
রাধিকার সাথে বাদ কে সাধিল হায়॥

অবশেষে, যাঁহার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ তাঁহাকে আবার কে হরণ করিতে আসিল, অতএব তিনি চক্র করিয়া আমাকে কাঁদাইতেছেন এইরূপ ভাবিয়া রোষভরে বলিতেছেন।—

(৫)

ব্রজপুরে হয়ে বাম, নিশ্চয় ত্যজেছে শ্যাম
গোপীকুল যত সব, না দেখি কিনারা।
শ্যাম অদর্শনে জীয়ন্তে হয়েছি মরা॥
ওহে বাঁকা নটবর, এই তব ব্যবহার,
হইয়া পুরুষ তুমি প্রকৃতি ত্যজিলে।
যা' ছিল ঘটেছে আজি অভাগিনী-ভালে॥

সত্ত্বঃ রজস্তমগুণে,* পরস্পর সংমিশ্রণে,
প্রকৃতি বিকৃত করি সৃজিলে এ ধরা।
তাই বুঝি ছাড়িলে হে আদ্যাপরাৎপরা॥
কেবল হইবে ব'লে, আমারে ছাড়িয়া গেলে,
দেখহে কৈবল্য, মম মানা নাহি তায়।
অনুচিত হেন কাজ ছি ছি রসময়॥

শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরী।

বনফুল।

(একটী পীতবর্ণের বনফুল-দর্শনে রচিত)

সখী ফুলরাণী! কানন-শোভিনী,
তোমার রূপ-মাধুরী।
নয়ন-শান্তি সাজ বাসন্তী
হৃদয়-পরাণ-হারি॥
জীবন ঘোর, সফল মোর,
নিরখি আজি নয়নে।
করুণাময় জগতে ভয়
নমি গো তাঁর চরণে॥

---

* গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি এবং গুণের সংযোগ বিয়োগ আরম্ভ হইলে জীবের সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রথমে মহত্তত্ত্ব, পরে অহঙ্কার, তৎপর বুদ্ধি ইত্যাদি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইয়া থাকে। সৃষ্টি কালীন পুরুষ (পরমাত্মা) জীবাত্মার (প্রকৃতির) আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকেন। পরে মায়াদি জনিত অবিদ্যা নষ্ট হইলে পুরুষ প্রকৃতি ছাড়িয়া দেহমধ্যে লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠিত হইয়া কেবল তিনিই বিরাজ করিতে থাকেন। এইরূপ কেবল তিনিই রহিলেন বলিয়া সেই অবস্থার নাম কৈবল্য।

নয়ন-হারি, রূপ তোমারি
করুণা প্রকাশ যার।
তিনি অনন্ত তিনি প্রশান্ত
অপার মহিমা তাঁর॥
পীত বসনে, বিহরে প্রাণে,
মহান পুরুষ সেই।
করি যতন নিজ বরণ
দিয়াছেন যিনি এই॥
স্রষ্টার একি কৌশল দেখি
অন্তরে তব খেলিছে।
হেরি নয়নে, পাষাণ-প্রাণে
প্রেম নিয়ত জাগিছে॥
রে "বন ফুল" মন আকুল
তোমার মতন হই।
কৃষ্ণ চরণে দীর্ঘ জীবনে
নিয়ত পড়িয়া রই॥
পীত বসনে, ফুল ভূষণে,
কেমন সাজে গো কালা।
নয়ন ভরে' দেখিব তাঁরে
ঘুচিবে প্রাণের জ্বালা॥
(ওলো) ব্রজের বধূ, বলিব শুধু,
শোন গো একটী কথা।
শ্যামা আশায় কুসুম হয়ে'
আজ এসেছি হেথা॥
করিয়ে যতন, মনের মতন
গাঁথনা আমায় ভাই।
কানাই পায়ে, লুটিব বলে
সাধ হয়েছে তাই॥

তাহার তরে, আসিছি ঘুরে'
কত লক্ষ জন্ম ধরে'।
মোদের কানাই, তোদেরও তাই
বাঁধা যে প্রেমের ডোরে॥
ওরে গোপাঙ্গনা, কেড়ে নে'বনা,
তোদের কালাচাঁদ।
হেরিব চরণ কালবরণ
এইটী মনের সাধ।
তরিছে পাপী ঘোর নারকী
না জানি কি গুণ তাঁর।
ডাকে যে তাঁরে পরাণ ভরে,
তার চিন্তা কিবা আর॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

মোগল রাজত্বে পুলিস-প্রণালী।

অনেকের একটা ধারণা আছে, মোগল রাজত্বে নিজ রাজধানী ছাড়া অপরাপর নগরে ও গ্রামে শান্তি সুশাসনের ব্যবস্থা বড় ভাল ছিল না। সে সময়টা অরাজকতার রাজ্য। যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনিই তাহা করিতে পারিতেন। যাঁহার সামর্থ্য ও পদমর্য্যাদা আছে, তিনি বাদসাহের নিম্ন শ্রেণীর লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

পুলিসের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সর্ব্ব সময়েই ছিল। এই টেলিগ্রাফ্ রেলওয়ের দিনে, সভ্যতার উজ্জ্বল কিরণ-তলে বিশ্রাম করিয়া সুসভ্য সুদক্ষ ইংরাজ-শাসনে আমরা যে নিগ্রহ ভোগ করি, বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, আজকাল্কার মতে, অর্দ্ধ সভ্য যথেচ্ছাচারী মোগল

শাসনে প্রজাবর্গ আমাদের অপেক্ষা অনধিক অশান্তির ও নিরাপদতার অবস্থায় ছিল না। এখন বরঞ্চ উপরিতন কর্ম্মচারীরা পুলিসের কর্ম্মচারীদের বল্‌গা শিথিল করিয়া দেওয়াতে প্রজার উপর তাহাদের পাশবিক অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু মোগল-রাজত্বে বাদসাহের নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিত বলিয়া তাঁহার দবদবায় পুলিস কর্ম্মচারীরা বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

বাদসাহ সাহাজানের সভায় এক জন ভিনিস্ দেশীয় চিকিৎসক ছিলেন। বিখ্যাত বার্ণিয়ারের ন্যায় তিনিও অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোগল রাজ্যের ও রাজপুরের, এমন কি অন্তঃপুরের অনেক গোপনীয় ঘটনাবলী তিনি পরিস্ফুট ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই, বিবরণ গুলি পরিস্ফুট হইলেও বিস্তারিত নহে। নানাবিধ গল্প-গুজবে তাহার আদ্যোপান্ত এরূপ ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা অতি দুরূহ ব্যাপার। আমরা "অনুশীলনের" পাঠকবর্গের জন্য যাহা কিছু "পুলিস বিবরণ" হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মোগলরাজত্বে—বিশেষতঃ আকবরের সময়ে, ভারতবর্ষে সিবিল গবর্ণমেণ্ট বলিয়া একটা পরিচ্ছন্ন সজীব শাসন-প্রণালী ছিল না। বাদসাহেরা রাজ্য-বিস্তারে ও জিত সাম্রাজ্য-রক্ষায় যে সমস্ত যুদ্ধাদিতে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহাতে বোধ হয়, দেশটা আগাগোড়াই সৈনিক নিয়মে শাসিত হইত। প্রত্যেক সুবায়, এক জন করিয়া সুবাদার থাকিতেন। সুবাদারের অধীনে একজন কোতয়াল ও একজন কাজি থাকিতেন। কোতয়াল মহাশয়, পুলিস বিভাগে ও কাজি সাহেব, দেওয়ানী বিভাগে কার্য্য করিতেন।

তখন দেশে সভ্যতা বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক উপকরণ-স্বরূপ বিষয়-ঘটিত এত মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইত না। যাহা কিছু ঘটিত, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। উহা কখনও কাজি দ্বারা, আর অধিকাংশ সময়ে স্বয়ং বাদসাহের দরবারে নিষ্পত্তি হইত। কাজি সাহেবের কাজ সুতরাং অনেক কম পড়িয়া যাইত। আরঙ্গজীব ঘোরতর গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁহার আমলে কাজী সাহেবদের অনেক কাজ বাড়িয়াছিল। আর কোরাণের

বিধানানুসারে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মামলা মোকদ্দমায়, স্বামী ও স্ত্রী ত্যাগ ঘটনায়, কাজি সাহেবেরা বিধান দিতেন। আকবরের সময়ে যদিও মদ্য বিক্রয় প্রথা রাজ্য মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি বিষম পদ্যপায়ী জাহাঙ্গীরের আমলে ও সাহাজানের রাজত্বকালে উহা আবার বাড়িয়া উঠে। তখন বিলাতি মদের আমদানী ছিল না। ইক্ষু রস ও চিনি হইতে এক প্রকার মদ চোয়ান হইত; তাহা "আরক" বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। আরঙ্গীব এই "আরক" বিক্রয়-প্রথা একবারে রাজ্য মধ্য হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য কাজিদিগের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করেন। মদের দোকান উঠাইয়া দেওয়া.মদ্যপদিগের আড্ডা ধ্বংস করা,খুচরা মদ্য-বিক্রেতা-দের দণ্ড বিধান করা, এই সমস্ত কার্য্য লইয়া কাজি সাহেবদের অনেক সময় অতিবাহিত হইত। "সহর কোতয়ালই" পুলিস বিভাগের প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। কাজি সাহেব, কেবল কাজ বাড়িয়া পড়ার জন্য তাহার সহায়তা করিতেন। কোতয়াল, সহরের, নগরের ও গ্রামের সর্ব্বত্রই গুপ্ত ও প্রকাশ্য পুলিস পাহারা দ্বারা শান্তি-রক্ষা করিতেন। প্রতি রজনীতে যে সমস্ত দুষ্কর্ম হইত বা চুরী ডাকাইতি ঘটিত,তাহার এত্তেলা তৎপরদিনই তিনি বাদসাহ-সন্নিধানে পাঠাইয়া দিতেন।

কোতয়ালের আর একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি যে কেবল ফৌজদারি বিভাগের ও পুলিস বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, এরূপ নহে। লোকের সাংসারিক ঘটনাবলির উপরও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। কে কোথায় নিজ সংসারে মারপিট করিল, কে কোথায় কাহাকে বিষ খাওয়াইল, কে কোথায় ভ্রূণ-হত্যা করিল, কে কোথায় জাল ফেরারী করিল, কে কোথায় কার সঙ্গে বিবাদ করিল, এ সমস্তও পুলিসের তদারকের সীমার মধ্যে ছিল। বাদসাহের দৃঢ় আদেশ, নিশা দ্বিপ্রহরের পর কেহ কোন খানে জনতা করিলে অপরাধী বলিয়া ধৃত হইবে। এরূপ আদেশ প্রচার, অবশ্য কঠোর নীতির অনুসারী, কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি,সে সময় আইনের এত দৃঢ়তা সত্ত্বেও গৃহে গৃহে বিদ্রোহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত।

মোগলরাজত্বের একটী সুনিয়ম এই, যাহা আমরা আজকাল এই উদার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেও দেখিতে পাই না। সকল শ্রেণীর প্রজাই ইচ্ছা হইলে

কাজি বা কোতোয়ালের নিকট অভিযোগ না আনিয়া খাস দরবারে অভিযোগ করিতে পারিত। বাদসাহ শিবিরেই থাকুন, শিকারেই থাকুন, সহরে থাকুন বা রাজধানীতেই থাকুন, সকল স্থানেই দরবার-ক্ষেত্রে প্রজাগণ দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পাইত।

পূর্ব্বে কোতোয়াল সাহেবের যে গোয়েন্দা বিভাগের কথা বলিয়াছি,তাহার কার্য্য প্রণালী বড় অদ্ভুত ধরণের। কোতোয়াল সামান্য শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া কতকগুলি ভৃত্য রাখিতেন। তখন মজুর ও চাকর প্রতিদিন প্রাতে প্রকাশ্য রাজপথে ফিরি করিয়া কাজে লাগিত। অন্যান্য মজুরের সহিত মিশিয়া কোতোয়ালের নিযুক্ত গুপ্ত প্রতিনিধিরা চাকরের বেশে লোকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, কখন বা মিষ্টান্ন-বিক্রেতা, ফল-বিক্রেতা বা চিকিৎসক রূপে লোকের সদর অন্দরে ঢুকিয়া ঘরের কথা বাহির করিয়া লইয়া যাইত।

আরঙ্গীব অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। * কোথায় কে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে, কোথায় কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু, তাঁহার গোঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া কোন প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, এই সকল সামান্য বিষয় লইয়াই তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ ও অনুসন্ধান করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া, তিনি তাঁহার নিজ চক্ষুর প্রতিনিধি-স্বরূপ শত শত বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী দ্বারা সংবাদ আনাইতেন।

চোর ধরিবার বন্দোবস্ত মোগল রাজত্বে অতি উৎকৃষ্ট ছিল। শুনিয়াছি,

---

* আমরা ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। যখন গভীর রজনীতে সকলে, মহাসুষুপ্তিতে অভিভূত, আরঙ্গীব তখন ছদ্মবেশে আগরা ও দিল্লীর দুর্গের সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন। যাহাদের প্রহরী কার্য্যে কোনরূপ গাফিলি দেখা যাইত, তাহারা পর দিন দণ্ডিত হইত।

বাদসাহের, নিজের মন্ত্রীদেরও উপর বিশ্বাস ছিল না। কারণ অনেক সময় তিনি মন্ত্রিবর্গের সহিত "দেওয়ান খানার" নিভৃতমহলে বসিয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি ও তৎপক্ষে সেনাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতেন, রাত্রির মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া সকলের অজ্ঞাতে নূতন ব্যবস্থা করিতেন।

সেরশার সময়ে পথিকেরা পান্থশালায় বা পথমধ্যে দ্রব্যাদি রাখিয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে নিদ্রা যাইতেন। আকবরের আমলও সুশাসনের আদর্শ সময়। জাহাঙ্গীরসাহও চোর ডাকাতের উপর বড় বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং কখন কখন সামান্য চুরির জন্য চোরের নাক কান কাটা যাইত, কখনও বা মৃত্তিকায় অর্দ্ধ প্রোথিত হইত। স্থান-বিশেষে চোরকে কুকুর-দষ্ট হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। চোরের সঙ্গে সঙ্গে আবার শান্তিরক্ষককেও বেগ পাইতে হইয়াছে। আরঙ্গীব নিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে কোন স্থানেই চুরী হউক না কেন, সহর-কোতোয়াল তাহার জন্য দায়ী। চুরীর জন্য প্রজার যে অর্থক্ষতি হইবে, তাহা তিনি নিজ বেতন হইতে পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য। এই নিয়ম প্রচলিত থাকায় কোতোয়াল, নিজের দায়ে ও চাকরি বাঁচাইবার আশায় চোর ধরিবার বন্দোবস্ত যথাসম্ভব করিয়া দিতেন। অপরাধী প্রায়ই পরিত্রাণ পাইত না।

মোগল রাজত্বের একটা সুব্যবস্থা এই,–বিচার স্থলে অর্থী বা প্রত্যর্থীকে অনর্থক বিলম্ব (Postponement) পোষ্টপোনমেণ্ট জন্য কষ্ট পাইতে হইত না। প্রত্যহ রাজদ্বারে বিচারালয়ে হাঁটাহাটি করিতে অর্থী প্রত্যর্থীর কি কষ্ট, তাহা আজকাল আমরা বেশ বুঝিতেছি। সদরে স্বয়ং বাদসাহ, সাক্ষীর জোবানবন্দী নিজকর্ণে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডাজ্ঞা দিতেন। মফঃস্বলে কোতোয়াল ও কাজিদিগের উপরও এইরূপ শীঘ্র বিচার করিবার আদেশ ছিল।

প্রাণদণ্ডের ক্ষমতা স্বয়ং সাহান সা বাদসাহ দিল্লীশ্বর ভিন্ন আর কাহারও ছিল না। সাক্ষীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা যে বাদসাহ সহসা প্রচার করিতেন, এরূপ নহে। তিন দিন তিন বার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিশেষ বিবেচনার সহিত তিনি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতেন। তিন দিনের দিন যে আজ্ঞা প্রচার হইত, তাহাই শেষ। কখন কখন বা প্রথম দিনে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া বাদসাহ দ্বিতীয় দিনে তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেন। এইরূপে ঘটনাক্রমে অনেক প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধী পরিত্রাণ পাইয়া যাইত।

বিচারকেরা ঘুষখোর হইলে, তাহার পরিণাম কিরূপ ভয়ানক হইতে পারে, ইহা মোগল-সম্রাট্‌গণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। সাক্ষীরা

মিথ্যা এজেহার দিলে, সুবিচার কত দূর পণ্ড হয়, তাহা বুঝিয়াই তাঁহারা মিথ্যাবাদী সাক্ষীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিচারকেরা অর্থকৃচ্ছ্রতা জন্য যাহাতে উৎকোচ-পরায়ণ না হয়, এজন্য আকবর সাহ পদমর্য্যাদা রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক হিসাবে অগ্রিম বেতন ও জাইগীর প্রদান করিতেন। ইহাতেও যাঁহার অর্থ-কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইত, তিনি রাজভাণ্ডার হইতে সামান্য সুদের হারে টাকা কর্জ্জ করিতে পাইতেন। পাছে বর্দ্ধিষ্ণু প্রজাদের নিকট ঋণ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা বিচার-বিষয়ে কোনরূপ পক্ষপাতিতা করেন, এই ভয়ে আকবর সাহ তাঁহাদের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই, সরকার হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এ ঋণের, এ অর্থহীনতার কোন কথা সাধারণে প্রকাশ হইত না, অথচ সে রাজকর্ম্মচারী অবাধে নিজের অর্থাভাব দূর করিয়া আনন্দ লাভ করিত। এই প্রকার কর্জ্জ দাদনের সুদের হার এই, প্রথম বৎসর বিনাসুদে টাকা দেওয়া হইত। দ্বিতীয় বৎসর কর্জ্জমুদ্রায় ষোড়শাংশ সুদ দিতে হইত। তৃতীয় বৎসরে অষ্টমাংশ, চতুর্থ বৎসরে এক চতুর্থাংশ দিতে হইত। দশম বৎসরের পর আর সুদ দিতে হইত না। এই প্রকার কর্জ্জ দাদনকে "মুসাদত" বলিত। *

আকবর-নামার অনুবাদক একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন, আকবর সাহ উৎকোচগ্রাহী রাজপুরুষদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এক সময়ে কাজি সাহেবেরা এইরূপ অবস্থাপন্ন প্রমাণিত হওয়ায় বাদসাহ তাহাদিগকে বর্‌তরফ করিয়া যথোচিত দণ্ড বিধান করেন। আকবর নামার অনুবাদক লিখিতেছেন,—

"Again His Majesty discovered that the Kazis were in the habit of taking bribes. He resolved with the view of obtaining God's favor to place no further reliance on these men (quagis) who wear a turban of respectability but are bad at heart, who wear long sleeve but fall short in sense."

* সুদ লওয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইলেও আকবর সাহ সুদের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে কোরাণাদি জানিতেন না, তাহার ইহাই এক বিশিষ্ট প্রমাণ।

ইহা হইতেই বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইবে, সেই অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় প্রকৃতিপুঞ্জ যেরূপ সুবিচারের আশা করিত ও প্রকৃত বিচার পাইত! আজ-কালকার দিনে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

জ্ঞানপিশাচ।

অসভ্যতা অজ্ঞানতার নামান্তর। সৃষ্টির প্রারম্ভে জগৎ অসভ্যতার লীলা-ভূমি। অসভ্যতার স্তরে স্তরে দারুণ আঁধার; সভ্যতার প্রতি সোপানে সুবিমল আলোকরশ্মি বিরাজমান। ক্রমশঃ এই অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া পূর্ণিমার রজতকিরণ ফুটিল। মানুষ, জ্ঞানানুশীলনে রত হইল। জ্ঞান অনন্ত, মানুষ সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্র জীবন—নির্দ্দিষ্ট তাহার সীমা। এ রেখাঙ্কিত প্রান্তস্থিত সীমা অতিক্রম করিবার সামর্থ্য মানুষের নাই, প্রশ্নও মীমাংসিত হয় না। সমস্যামাত্রই গুরুতর, ঘোর রহস্যজালে আবৃত। চিন্তায় তাহা আরও দুর্ব্বোধ, আরও জটিলতাময় হইয়া পড়ে। পুরুভুজ নামক কীট বিশেষের ন্যায়, রক্তবীজ-দেহনিঃসৃত রুধিরবিন্দুর ন্যায় এক একটী ক্ষুদ্র সূত্রের পরিণতি অনন্ত। অনন্তে সীমার লয়। অনন্তে মানুষ নিজত্ববিহীন কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত জীব। প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার বিস্মৃতিগর্ভে নিহিত, প্রতিভা লয়প্রাপ্ত। ইহারই একটী উল্লেখযোগ্য পরিণাম নাস্তিকতা। অভি-ব্যক্তি জগতের মূলগত, একথা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অপ্রযুজ্য; সুতরাং তাহা সাধারণ নিয়ম স্বরূপে পরিগণিত করা অকর্ত্তব্য। জ্ঞানানুশীলনই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পৃথিবী গোলাকার, বৃত্তস্বরূপ, অহর্নিশ নির্দ্ধারিত পথে ঘূর্ণ্যমান। ভূ-পরি-ক্রমণে যে স্থান হইতে যাত্রার আরম্ভ, নানাদেশ আবিষ্কারের পর পুনর্ব্বার সে স্থানেই উপস্থিতি! এখানে সমগ্র ভৌগোলিক তত্ত্ব আবিষ্কারই জ্ঞানের অভিব্যক্তি; কিন্তু এ অভিব্যক্তির সীমা এই পর্য্যন্ত। পৃথিবীর মানুষ, তদতিরিক্ত সামর্থ্য তাঁহাতে সম্ভবে না। যে প্রশ্ন লইয়া তাহার তর্ক, বিচারের পর যে সিদ্ধান্তে সে উপনীত, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে নানাবাগ্-বিতণ্ডার পর সেই প্রশ্নের সেই মীমাংসায় মানুষ আবার উপস্থিত হয়।

দর্শনজগতের নবীন ইতিহাসে দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চার্ব্বাকের যে মত প্রকটিত হইয়াছে, আজ উনবিংশ শতাব্দীর গভীর জ্ঞানালোকে পাশ্চাত্যদেশীয় মিল, বেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মতেই উপনীত! জার্ম্মান দার্শনিক মহামতি কাণ্ট, বহুচিন্তার পর সেই চিরপুরাতন ভারতীয় বেদান্তের মায়াবাদ প্রচারে ব্যস্ত! হার্টম্যান্, সোপেনহর্, রেনান্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্য মতের পরিপোষক, আর-হিগেল, স্পাইনোজা, ফিক্টে প্রভৃতি দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ সাংখ্যবাদী কেহ বা বেদান্তবাদী। এখানে প্রথম স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তেই মানব-বুদ্ধির চরম অভিব্যক্তি। এ অভিব্যক্তির সাহায্যকারী উপাদান পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত বহুকষ্টার্জ্জিত জ্ঞান। কেননা তাহার পুনরালোচনারূপ সুবিধা-সহযোগেই এ উচ্চতর জ্ঞান অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এই প্রথম স্থিরীকৃত চরম সিদ্ধান্তের পর অভিব্যক্তির নিয়মপ্রয়োগ ভ্রমাত্মক। ভ্রমাত্মক, কেননা ইহার পর দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় মানবের অনতিক্রমণীয় নির্দ্দিষ্ট রেখা অঙ্কিত। পৃথিবী, বৃত্তপথে চিরকাল ঘুরিতেছে। পৃথিবীর ন্যায় জ্ঞানও আবহমান-কাল স্বীয় বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান। সাক্ষী, অনন্তকালের অনন্ত লিপি, জগদিতি-হাসের অসংখ্য বিবরণী। সুতরাং জ্ঞান চিরপুরাতন অথচ নিত্যনূতন। এই জ্ঞানের জন্যই রাজা রাজপ্রাসাদ তুচ্ছজ্ঞান করেন, যুবক প্রণয়িনী-প্রেমে জলাঞ্জলি দেন, গৃহী মায়াবাদ বুঝিতে যান, জ্ঞানের এমনই অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! কিন্তু এ জ্ঞান কি?

জ্ঞান কি? পদার্থের বাস্তব প্রকৃতি ধারণার নাম জ্ঞান। বাস্তব, কেননা পদার্থের প্রকৃতি-ধারণা, স্থল-বিশেষে যুক্তিসঙ্গত হইলেও, অবাস্তব হইয়া থাকে; যুক্তিমাত্রই গ্রাহ্য নয়। জ্ঞান দুই প্রকার,—সামান্য ও প্রকৃত। এই প্রকৃত জ্ঞানের নাম প্রমাজ্ঞান বা প্রমাপ্রতীতি,—সাংখ্যকারের প্রমা-জ্ঞানের সহিত এই প্রবন্ধোক্ত প্রমাজ্ঞান কিছু বিভিন্ন-ভাবাপন্ন। প্রমাজ্ঞানে জ্ঞান ও ভক্তির বিচিত্র সমাবেশ! প্রমাজ্ঞানসিদ্ধের নিকট চিরপ্রসিদ্ধ—"ভক্তিতে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর।" আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত। মোহ, স্মারকতাশক্তি-হ্রাসের জনক। স্মৃতি শক্তির পর্য্যাপ্ত বা সম্পূর্ণ হানি হইতে বুদ্ধিনাশের উৎপত্তি। বুদ্ধিনাশই সকল অনর্থের মূলীভূত

কারণ। জ্ঞানাচলের গৌরবে গৌরব-লাভেচ্ছু মোহজালে জড়িত। ক্রমশঃ তাহার বুদ্ধি বিলুপ্ত হইতে থাকে। পরিণামে সে দর্পে স্ফীত, গর্ব্বে হিতাহিত-বিচার-শক্তি-বিহীন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে তথা-কথিত ভক্তের অবস্থাও জ্ঞানগর্ব্বিতের সহিত সমদশাপন্ন। ফলে দুইটী দলের সৃষ্টি—জ্ঞানী ও ভক্ত। ভক্তের বিজাতীয় ঘৃণা জ্ঞানীর উপর। জ্ঞানীরও আন্তরিক বিদ্বেষ, ভক্তের উপর। অথচ উভয়েই মূলগত ভ্রমসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা বাহুল্য, এই উদাসীনতার বিলোপসাধনেই প্রমাণ উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ জ্ঞান বা সম্পূর্ণ ভক্তি, পরস্পর-সাপেক্ষ। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান অসম্পূর্ণ। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তিও অসম্পূর্ণ। কেননা উভয়েরই চরম উদ্দেশ্য এক। অথচ জগতে এই দুই দলে কি ভয়ানক বিরোধই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে! মোট কথা—জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ-নিবারণ এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই প্রমাজ্ঞান। প্রমাজ্ঞানলাভ মানবের বাঞ্ছিত।

শীর্ষকোক্ত 'জ্ঞানপিশাচ' শব্দের অর্থ কি? নীচতার সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি পিশাচের অন্যতম আখ্যা। নীচতার প্রখর তেজের নিকট মহত্বের বিমল আলোক মলিন শ্রীহীন। মহাবাত্যার নিকট—প্রলয়ের ঘনঘটার নিকট—প্রকৃতির নীরব ভাব, বসন্তের মলয়ানিলসঞ্চালিত চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সংসার-কোলাহল-সংক্ষুব্ধ সুমধুর দৃশ্য অকিঞ্চিৎকর, মানসপটে অনুদিত। মহাবল পরাক্রান্ত জীবন মমতাবিহীন পরানিষ্ট-সাধন-তৎপর দুর্দ্দান্তের নিকট শীর্ণকায় গলিততুণ্ড গহন-বনচারী যোগীরও মহত্ব বিলুপ্ত। তাঁহার অমানুষিকত্ব, অলৌকিকত্ব, ম্রিয়মাণ—অন্তর্হিত! প্রকৃত কথা, পিশাচের পিশাচত্ব মহত্ব অপেক্ষা অধিকতর চমকপ্রদ। পিশাচ ভীষণতায় গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মহৎ শক্তিময়ে গাম্ভীর্য্যের ছবি। পিশাচ উত্তাল-তরঙ্গসংকুল মহাসাগর। মহাপ্রবাহবিহীন স্থির পারাবার। পিশাচ-নিবিড় কালিমাময়, দিগন্তব্যাপী, অন্তহীন, তুলনাবিহীন, গাঢ়, সর্ব্বগ্রাসী, ভীমান্ধকারময় সচ্চিদানন্দময়, জগৎপরিব্যাপ্ত সীমাহীন, তুলনাবিহীন, সঙ্গ, সর্ব্বপ্রভাকরী, মহান আলোকময়। পিশাচের কথা সময়বিশেষে আবশ্যকমত কখন রুষ্ট, কখন মিষ্ট; স্বর কখন মধুর, কখন ভয়াবহ। অন্তরে দারুণ স্বার্থশিখা। মহা বিনয়ী, পরীক্ষায় উগ্র, জগত রহস্যজ্ঞ, পরার্থ প্রা৽। পিশাচ অদ্ভুত

আবরণে বীভৎসতা ঢাকিয়া জগতে প্রাধান্য বিস্তার করে, অলৌকিক মমতার বিকাশ দেখাইয়া মানবকে প্রলোভিত করে, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করাইয়া তাহার গলে নীচতার মাল্য পরাইয়া শিষ্যত্বে আবদ্ধ করে। পরিণামচিন্তা ত্যাগ করিয়া মানবও আত্মবিস্মৃত হইয়া এ কুহকে চলিয়া পড়ে—অন্তর্নিহিত স্বার্থের এমনই মোহকরী শক্তি! জগদিতিহাসে স্থান-প্রাপ্ত পিশাচের শিষ্যত্ব গ্রহণের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত, বিলাতের জনৈক যুবতী। মহাকবি মিল্টনের স্বর্গবিচ্যুতি (প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ Paradise Lost) কাব্য পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন "সয়তানের প্রেমে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি।"

'জ্ঞানপিশাচ'—জ্ঞানী হইয়াও যে পৈশাচিক ভাবাপন্ন সেই জ্ঞান-পিশাচ। জ্ঞানপিশাচ, কবির কল্পনা নয়, ঔপন্যাসিকের ক্রীড়নক নয়। দার্শনিকের কষ্ট-কল্পিত তত্ত্ব নয় অথবা ব্যাধিতের স্বপ্নও নয়। জ্ঞানপিশাচ নিত্য-প্রত্যক্ষ মহা-সত্য। সত্যে ইহা অনুশাসিত, অনুপ্রাণিত, অন্তর্নিবিষ্ট। দেখিতে চাও, দর্পণ-প্রতিবিম্বিত নিজ ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তত দূর অগ্রসর হইতে সাহস না কুলায়, সূক্ষ্মভাবে জগৎপদ্ধতির পর্য্যালোচনা কর, মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণ কর, মানবচরিত্রের প্রতিকৃতি ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার স্তরোদ্ঘাটন কর। দেখিবে—সুন্দর কি কুৎসিত নৃশংস, মধুর কি ভীষণ বীভৎস! আরও সোপানপরম্পরা অধিরোহণ কর, চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হও। দেখিবে, বীরত্বে কমনীয়তা, গাম্ভীর্য্যে অবসাদ, দেবতায় নারকীয়তা, আদর্শে পশুত্ব। বিশ্লেষণে যাহাতে এরূপ পরস্পর-বিরোধী ভাবসামঞ্জস্য, সে যদি মানুষ, তবে পিশাচ কে?

জ্ঞানপিশাচের প্রতিকৃতি দেখিতে চাও, তবে একবার চার্ব্বাকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি পিশাচে ভক্তি না থাকে, যদি প্রলোভনের হস্ত এড়াইবার সামর্থ্য থাকে, তবে শোন, তিনি কি বলিতেছেন—"স্বর্গও নাই অপবর্গও নাই, পরলোকে আত্মাও থাকে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম প্রভৃতির ক্রিয়াও ফলদায়ক হয় না। অগ্নিহোত্র, ঋক্ সামাদি তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, গাত্রে ভস্মলেপন এ সমুদায় বিধাতা অবোধ কাপুরুষ ব্যক্তিদের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হনন করিলে,

সে পশু স্বর্গলাভ করে, তবে যজমান যজ্ঞে নিজ-পিতাকে কেন না বধ করেন? শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তিদের তৃপ্তিলাভ হয়, তবে কেহ বিদেশ যাত্রা করিলে, তাহার সঙ্গে পাথেয় দিবার ফল কি? যদি মর্ত্তলোকে দান করিলে, স্বর্গস্থিত ব্যক্তিদের তৃপ্তিলাভ হয়, তবে নিম্নতলে আহার সামগ্রী দিলে, গৃহের উপরিতলস্থ ব্যক্তিদের তৃপ্তিলাভ হইতে পারে। যত কাল জীবন থাকে, তত কাল সুখে থাকিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। দেহ ভস্মাবশেষ হইলে তাহার আর পুনরাগমন কোথায়? যদি জীবাত্মা শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোক গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুগণের স্নেহ-পরবশ হইয়া পুনরাগমন না করে কেন? মৃত ব্যক্তিদের যে প্রেত-ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় জীবনোপায়ার্থ কল্পনা করিয়াছে; আর কিছুই নয়। ভণ্ড, ধূর্ত্ত, রাক্ষস এই তিনে তিন বেদ রচনা করিয়াছে। জফরী, তুর্ফরী প্রভৃতি (অনর্থ) বেদবাক্য পণ্ডিতগণের বাক্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ, এই যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে এই যে কথা আছে, তাহা এবং অন্যান্য ঐরূপ গ্রাহ্য-বস্তু-সমূহ ভণ্ড লোক কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। মাংসভোজন পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাও ঐরূপ পিশাচ কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইয়াছে।" *

জ্ঞান পিচাশের দুইটী দল। এক শ্রেণী প্রকাশ্য নাস্তিক। অপর শ্রেণী অন্তরে নাস্তিক, বাহিরে আস্তিক। ইহারা বাগবিন্যাসে সুনিপুণ, নীতি বাক্যে কুশলী, শব্দ লালিত্য সাধনে চতুর, অথবা উপদেশচ্ছটায় মহা পণ্ডিত। আর সংসারে যেন মূক, কার্য্যে যেন অজ্ঞ অথচ স্বার্থে তৎপর। সরল ভাষায় কর্ম্ম ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী। ইহাদের মুখে "বসুধৈব কুটুম্বকং" কার্য্য-কালে 'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ'। এই কাপট্য অথবা কথায় ও কার্য্যে বিরোধী ভাব, মানবের অবনতির চরম সীমা। উত্তমে অধমত্ব, উচ্চে নীচত্ব, স্বর্গে নরকত্ব, মনুষ্যত্ব হীনতার পূর্ণ পরিচায়ক বিদ্যায় প্রতারণা, জ্ঞানে প্রবঞ্চনা—অবনতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জ্ঞানে যে, ছলনা করিতে

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ—চার্ব্বাক দর্শন। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত-কৃত অনুবাদ হইতে গৃহীত। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" দেখ।

পারে, সৃষ্টির সে অপকৃষ্ট জীব—ধূর্ত্ত, শঠ, ভণ্ড, কপটী। স্রষ্টার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যে সন্দিহান, বিশ্বনিয়ন্তা যাহার কাছে প্রমাণ-সাপেক্ষ, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডপতি যাহার কাছে প্রহেলিকা মাত্র, সেই তো পিশাচ। জ্ঞানী হইয়াও যে মূর্খ, বহুদর্শী হইয়াও যে বালক, মানব হইয়াও যে পশু অপেক্ষা অপকৃষ্ট, সেই তো জ্ঞানপিশাচ। হায়! কবে জগতে প্রমাজ্ঞান বিস্তৃত হইবে; কবে মানব; পদার্থের বাস্তব প্রকৃতি ধারণায় সমর্থ হইবে, কবে জগতে সয়তান-পূজার অবসান হইবে?

কিন্তু এই জ্ঞানে পৈশাচিক বৃত্তির প্রকৃত কারণ কি? জ্ঞান-পিশাচের উৎপত্তি কোথা হইতে? যুক্তি-প্রিয়তা হইতে নয় কি? মানুষ ভাবে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক এ সকল তো ধূর্ত্তের কথা। ধর্ম্মভেকধারীদের স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারের অমোঘ অস্ত্র, যাহাকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বেত্তারা অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করে, সেই অধর্ম্মের জয়েই তো জগৎ পরিপূর্ণ। কেবল বুদ্ধির দোষেই কোথাও কোথাও অধর্ম্মের পরাজয় দেখা যায় মাত্র। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ যুক্তি-প্রিয়তা আশু শুভ ফল-প্রদ—ধার্ম্মিক শত বৎসরে যে ধনোপার্জ্জনে অসমর্থ, জ্ঞানপিচাশ হয়তো এক মুহূর্ত্তেই তাহাতে সফলকাম—আর যাহা আশু শুভ ফলপ্রদ, সংসারী তাহাতেই শীঘ্র আকৃষ্ট হয়। ফলে, যুক্তিপ্রিয়তাই মানবের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়, সে সর্ব্বার্থ-সাধিকা যুক্তির মহোপাসক হইয়া পড়ে। যে কোন বিষয় তাহার ক্ষুদ্র (অবশ্য তাহার মতে নয়, কেন না সে ঘোর আত্মম্ভরী) বুদ্ধির অতীত, যাহাতে তাহার সীমাবদ্ধ যুক্তি পৌঁছায় না, তাহাই সে ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। সে দেখিল, তথা-কথিত ধর্ম্মে সুখ নাই। যাহা আছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। এই শূন্যের অথবা সামান্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আর আত্মহত্যা করা সমান কথা; সুতরাং তাহার মীমাংসা হইল—ধর্ম্মাচারণ অবিধেয়। আবার সে ভাবিল, জগতের আদি কারণের অস্তিত্ব—দুর্ব্বোধ সমস্যা, জটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন মীমাংসায় আবশ্যকই বা কি, স্রষ্টা থাকিলেই বা কি না থাকিলেই বা কি, না থাকাই বরং ভাল, সমালোচনে অমূল্য সময় অনর্থক ব্যয় করা মূর্খতার পরিচায়ক। কেন সাধ করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনি? কেন মূর্খগুলার মত অনুতাপাহুতি দিবার উদ্যোগ করি, কার্য্য

বিশেষে সংকোচ সৃষ্টির ব্যবস্থা করি, কেন অনন্তকে ছাঁটিয়া সীমার ক্ষুদ্র কারাগারে আবদ্ধ করি, কে কবে ঈশ্বর দেখিয়াছে? এইতো জগতে চিরকাল বহুসংখ্যক ব্যক্তি ভক্তি প্রীতি প্রভৃতির ভাণ করিয়া উন্মাদ হইয়াছে ও হইতেছে, কৈ ইহাদের কাহাকেও সুখী হইতে দেখি নাই; কখন তাহাদের বাঞ্ছিতকে দেখিতে শুনি নাই; বরং শুনিয়াছি ইহাদের সর্ব্বদাই আক্ষেপ, তিনি কোথায়! তবে কেনবা নাস্তিক হইয়া যথার্থ সুখ ভোগে অবহেলা করি! ইহাই হইল, এক শ্রেণীর জ্ঞানপিশাচের মর্ম্মকথা। আর এক শ্রেণী ঘোর আত্মম্ভরী। তাহারা সসীমতা বিস্মৃত, অনন্তের পানে প্রধাবিত, সামান্যে বৃহৎ রচনায় উদ্যত! তাহারা নিজত্বে অসীমতা আরোপ করে, সামান্যে মহত্বের আসন প্রদান করে, সীমাবদ্ধ বুদ্ধির গৌরবে আত্মহারা হইয়া পড়ে! তাহারা ভাবে, আমরা চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্, সৃষ্টিকারণের তথ্যানুসন্ধান, আমাদের কর্ত্তব্য। তাহারা বিজ্ঞানের দু' একটী অনাবশ্যক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর ভাবে, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয়তাবোধে আমরা সমর্থ, তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া মানবের চির পরিপোষিত কুসংস্কার দূরীকরণে আমরা সমর্থ, তবে এ স্রষ্টার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব মীমাংসায় পারগ না হইব কেন? এই বলিয়া তাহারা ডিম্বাহবে প্রবৃত্ত হইল। অবলম্বন কেবলমাত্র সেই যুক্তি। জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ না হইলে, যে ধর্ম্মজগতের সকলই অজ্ঞাত থাকে, তাহা একবারও ইহাদের মনে উদয় হইল না; কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহাতে প্রত্যয় করিল না, স্বীয় বুদ্ধি প্রাখর্য্য প্রদর্শনে ব্যাপৃত হইল। উচ্চাভিলাষে প্রমত্ত হইয়া আবশ্যক অনাবশ্যক, সার অসার, প্রাসাঙ্গিক অপ্রাসাঙ্গিক নানাযুক্তির অবতারণার পর তাহারা চরম জ্ঞান লাভ করিল —"অথ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"; ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, সুতরাং পরিশেষে তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ, অতএব অসম্ভব! তাহার পর এই মহাসত্যপ্রচারে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিল।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—"

সকলে এ মসীজীবীর গগনভেদী চীৎকারেও কর্ণপাত করিল না। যাহারা

অন্তস্তলস্পর্শী নয়, তাহারা সংগ্রামের ভেরী শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। অনেকেই যুক্তিব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইল। জ্ঞানপিশাচ নিজ ক্ষমতামাহাত্ম্য দেখিয়া বিকট হাসি হাসিল। সে হাসিতে পৃথিবী কম্পিত হইল, নরনারী কিছুক্ষণের জন্য যেন নির্ব্বাক্, স্পন্দহীন। কিন্তু পিশাচ নিজ আধিপত্য অধিকক্ষণ সমভাবে বজায় রাখিতে পারিল না। সয়তানের প্রলোভনে দুষ্কৃতকারী আদম ও ইভ্ শীঘ্রই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল, সয়তানের দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে তাহাদের আর বিশেষ নব জ্ঞানের আবশ্যক হয় নাই। এই অতি গর্ব্বিত দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার নানা শাখা প্রশাখা। তাহার উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 'সাধারণ' লইয়া একটা গোলযোগ আছে। এক দল ভাবে, কেন সাধারণ সমক্ষে নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হই, তাহাতে যশঃসৌরভ দিগন্ত প্রসারিত না হইয়া বরং যথেষ্ট পরিমাণে প্রহৃত হইবে, গুরুবাদ প্রচারে নানা অনিষ্ট হইবে, স্বার্থসাধনে বিবিধ বিঘ্ন জুটিবে। আর এক দল ভাবে, কেনই বা কপটতায় অত্যধিক প্রশ্রয় দিই, অনুসন্ধানে লোকে যেরূপ প্রকৃতি স্থির করে তাহাই করুক। তাহাতে ক্ষতি কি? অনন্ত যাহার শক্তি, অসাধারণ যাহার ক্ষমতা, অসামান্য যাহার বুদ্ধি, তাহাকেও যদি বুঝিয়া চলিতে হয়, হৃদয়ে আশঙ্কার স্থান দিতে হয়, তবে তাহার বিশেষত্ব থাকিল কোথায়? যাহা ঈপ্সিত, তাহা সাধিত করিতেই হইবে, কাপট্যের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ যুক্তিই জ্ঞানপিশাচের আশ্রয়, অবলম্বন। কিন্তু যুক্তিমাত্রই যে গ্রাহ্য নয়, যুক্তিতেও যে ত্রুটি (fallacy) থাকিতে পারে, যুক্তিও যে অসার হইতে পারে, তাহার অবলম্বন (premiss) মাত্রই যে অকাট্য নয়, এ কথা একবার সে ভাবিয়াও দেখে না। যে কোন রূপে একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেই সে যুক্তিতে ইহাদের ধ্রুব বিশ্বাস!

এ জগৎ জ্ঞানপিশাচের লীলাভূমি। কিন্তু কেন, জগতে জ্ঞানপিশাচের এত আধিক্য কেন? অন্তর্দৃষ্টিহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ নয় কি? বাহ্য লইয়া মানুষ আজীবন ব্যস্ত। অপূর্ণ অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়। তাহার জীবন—ঘাতপ্রতিঘাতে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ, হৃদয় শতধা ক্ষত, জর্জ্জরিত; তথাপি বাহ্যেই তাহার আনন্দ, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দিন-গণনায় তাহার আমোদ,

অন্তরে প্রবেশ করিতে সে চাহে না, অন্তর দেখিবার ইচ্ছা বা সুবিধা হইলেও সে ভয়ে মুখ ফিরাইয়া লয়। যেন উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় অন্তর তাহার পরিত্যাজ্য! এই অন্তরে প্রবেশলাভের অনিচ্ছারই অপরিহার্য্য পরিণাম বুদ্ধিশক্তির এবং অন্তর্দৃষ্টিশক্তির যথেষ্ট হ্রাস। এই অন্তর্দৃষ্টিহ্রাসই প্রমাজ্ঞান অথবা পদার্থের বাস্তব প্রকৃতিধারণার অন্তরায় এবং ইহাই নাস্তিকতার মূলীভূত কারণ।

অন্তর্দৃষ্টিহীন বলিয়াই মানুষ ভাবে, এ জগৎ কেবলই জড়ের রাজ্য। কিন্তু প্রকৃতই কি এ জগতে সকলই জড়? এ বিপুল বিশ্ব, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি প্রাণহীন, শুধুই কি জড়ময়? এই মহাপ্রকৃতি—এই সর্ব্বত্র বিসৃষ্ট ফল ফুল, তরু লতা, জ্যোৎস্না, তরঙ্গ, নদ নদী, অরণ্য, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, কি কেবলই জড়ের সমষ্টি? জড়পিণ্ড ব্যতীত ইহারা কি আর কিছুই নয়? বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণে, খণ্ডনের পর খণ্ডনে, গণনার পর গণনায় যন্ত্র-সাহায্যে বৈজ্ঞানিক যে সিদ্ধান্তে উপনীত, তাহাই কি তবে যথার্থ সত্য? সেই সিদ্ধান্তেই কি তবে মানব বুদ্ধির চরম পরিণতি? দর্পস্ফীত অহঙ্কারপ্রমত্ত বিদ্যাগর্ব্বিত জ্ঞানপিশাচ বৈজ্ঞানিক স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখ, ঐ এক একটী ক্ষুদ্রের মধ্যে অনন্তের বিকাশ বিরাজমান কি না, ঐ একটী সামান্যের মধ্যে অসীম সুষমাধারের অভিব্যক্তি জাজ্জ্বল্যমান কি না? বাঙ্গলার বাঙ্গালী কবি সাধু রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না।"

অন্যত্র—

"আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥"

মহাকবি গেটে ভিন্ন সুরে গাহিয়াছেন—

"In Being's floods, in Action's storm,
I walk and work, above, beneath,
Work and weave in endless motion!
Birth and Death,
An infinite ocean;
A seizing and giving,
The foil of the living;
'Tis thus at the voaring loom of time I ply,
And weave for God the Garment thou seest him by.
—Goethe's Faust-Part I, Sec I, *

জগতের প্রতি পদার্থের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে সামান্য ধূলিকণায় পর্য্যন্ত বিধাতার অনন্তত্ব অভিব্যক্ত। সে দিকে দৃষ্টি মানুষের নাই। কৃত্রিমতায় মানুষ অনন্তের পানে প্রধাবিত। চিরকাল পরিণামও বৈফল্য। অথচ অনন্তের অনন্তত্ব জ্ঞান সর্ব্বত্রবিদ্যমানতা তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না।

বস্তুতঃ এ জগৎ কি? না, তাঁহারই ব্যষ্টি বিকাশ মাত্র। আমরা সকলে তাঁহারই ছায়া, তাঁহারই প্রতিবিম্ব। এই বহির্ব্বসনের অন্তরালে সেই মহাশক্তি সেই মহান্ অনন্ত বিরাট পুরুষ বিরাজ করিতেছেন! এ সম্বন্ধে সাধক-কবি রামপ্রসাদ বলেন—

* * * ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে পদে গয়া গঙ্গা কাশী॥"

জানি না, আধুনিক বৈজ্ঞানিক এ কথায় স্তম্ভিত হইবেন কি না, হউন আর নাই হউন, কথাটা কিন্তু বড় খাঁটী। দেঁতো অর্থাৎ গজদন্ত বা বহির্দ্দন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। দেঁতো যেমন না হাসিলেও তাহার দন্ত স্বতঃ-প্রকাশিত, সেইরূপ ব্রহ্মনিরূপণে মানুষ সক্ষম হউক আর নাই হউক, তিনি কিন্তু স্বতঃ-

* As translated by Thomas Carlyle in his "Sasror Resartus"--Bk1, Chap VIII.

প্রকাশিত! চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই বা অন্তস্তলভেদিনী বুদ্ধিসম্পন্ন মানব-মাত্রেই এই স্বতঃ-প্রকাশিত ভাব দেখিতে পায়, জ্ঞানপিশাচ পায় না!

প্রকৃত কথা, সৌন্দর্য্য জ্ঞান জ্ঞানপিশাচের নাই। অথচ সৌন্দর্য্যজ্ঞানই প্রমাজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সোপান। এই সৌন্দর্য্যই প্রকৃতির নানা পরিচ্ছদে তাহার চক্ষের সমক্ষে অহর্নিশ বিরাজিত! সৌন্দর্য্য জ্ঞান হইতেই বিস্ময়ের উৎপত্তি। বিস্ময়-শিক্ষা প্রমাজ্ঞানের অন্যতম আখ্যা। বিস্ময় প্রকাশ করিতে যিনি শিখিয়াছেন, প্রকৃতির সর্ব্বত্র বিসৃষ্ট মোহন মালা সন্দর্শনে যাহার হৃদয় সর্ব্বদা বিস্ময়ে আপ্লুত, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। কেননা সর্ব্বত্রই তিনি বিধাতার বিদ্যমানতা অনুভব করেন। * তিনি এক একটি তথা-ঘটিত উপেক্ষিত সামান্য পদার্থও দেখেন—অনেকের আভাস, দেখিতে দেখিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পড়েন, আর অমনই বিস্ময় আসিয়া তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লয়— বিস্ময়ে ডুবিয়া তিনি অনন্তের সহিত অন্তরাত্মার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা এই বিস্ময় প্রকাশক উচ্চ ভাব। তাহা শুধু জড় মাত্রের পূজা নহে, অন্তর্নিহিত শক্তির পূজা। বিধাতার আরাধনাই ইহার লক্ষ্য।

বিস্ময়ের মহিমা ভারতবাসী চিরকালই অনুভব ও প্রচার করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতিমাত্র ইউরোপে মহাজ্ঞানী কারলাইল্ এই মত প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। † কারলাইলের এই মত দিন দিন ইউরোপে অপূর্ব্ব আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ সোঽহং এই বিস্ময় প্রতিপাদক অপূর্ব্ব মন্ত্র। সোঽহং অহঙ্কারের বাক্য নহে, বিনয়ের চরম দৃষ্টান্ত।

---

* 'বিস্ময়, সম্বন্ধে ১২৯৮ সালের (২য় বর্ষের)' সাহিত্য-কল্পদ্রুম, পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত মৎপ্রণীত "জ্ঞান, বিস্ময় ও সৌন্দর্য্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† Vide Carlyle's "Sartor Resartus and "On Heroes and Heroworship,"

"সোহং"—সেই আমি, অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং আমি এক, এ বিশ্বই বিশ্বস্থ সকলেই তাঁহাময়, শুধু আমিই যে সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাহা নহে। সোহং—অর্থ আপনার অস্তিত্ব লোপ। "সোহং বলিলে এমন বুঝায় না যে, আমিই ব্রহ্ম, সৃষ্টি কর্ত্তা ও পালনকর্ত্তার সমাবেশ, আমাতে সোহং বলিলে বুঝায় এই যে, আমি তাঁহারই অংশমাত্র। যেমন জগৎপরিব্যাপ্ত মেঘমালার পরিবর্ত্তিত অংশ জলধারা, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অনন্তের পরিবর্ত্তিত একাংশ মাত্র আমি। "সোহং" বিস্ময়ের উচ্চতম অবস্থায় সঞ্জাত ভাব; প্রমাজ্ঞানের স্বতঃ-উৎস, নীরব ভাষা, সোহং বৈজ্ঞানিকের সমালোচন-বহিভূত স্বর্গীয় পদার্থ!

এখন বোঝা গেল, যে দিন অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইবে, সৌন্দর্য্যজ্ঞানে বিস্ময়ে ও "সোহং" বাদে হৃদয় আপ্লুত হইবে সেই দিনই জ্ঞানপিশাচের পিশাচত্ব ঘুচিবে, প্রমাজ্ঞানার্জ্জনে বা পদার্থের বাস্তব প্রকৃতি ধারণায় সে সক্ষম হইবে, সেই দিনই বসুন্ধরা জ্ঞানের বিমল উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া কবি-কল্পিত অমরাবতীকেও পরাস্ত করিবে। হায়! বিধাতা কি এ ভাব জ্ঞানপিশাচের হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন না?

শ্রীকালিচরণ মিত্র।

রাধা।

সখী! পুনঃ কেন কালাচাঁদ
　　আসে যমুনায়?
সাধের বাঁশরী পুনঃ কেন সে বাজায়!
　নিত্য এ সাঁজের বেলা,
　কেন আসি' করে ছলা,
　পাগল বাঁশরী কেন,
　　রাধা নাম গায়!
　কেন সখী! দূরে শুনি,
　শ্যাম-নূপুরের ধ্বনি,
　পিক-বধূ ডাকে কেন,
　　বসন্ত-নিশায়!
সখী, পুনঃ কেন কালাচাঁদ,
　　আসে যমুনায়?

　মলয় পবন বয়,
　যমুনা উছলে' যায়,
　শেফালী, বকুল কত,
　　ফুটে ওঠে হায়!

পুনঃ এই বৃন্দাবনে,
কত কথা পড়ে মনে,
শ্যাম কি গো এল হেথা,
ভুলি' মথুরায় !

সখী ! পুনঃ কেন কালাচাঁদ
আসে যমুনায় ?

রাধা কি পড়িল মনে,
তাই ডাকে আন মনে,
বারণ না মানে বাঁশী,
মন-সুখে গায়।

মধুর বসন্ত রাতে,
সেই যমুনার পথে,
বকুলের মালা গাঁথা,
মনে পড়ে' যায়।

সখী ! পুনঃ কেন কালাচাঁদ
আসে যমুনায় ?

কবে যে শুনেছি গান,
পুরবী রাগিণী তান,
বাসন্তী পূর্ণিমা তিথি,
কবে গেছে হায় !

কবে যে গেঁথেছি মালা,
খেলেছি সে প্রেম-খেলা,
মনে পড়ে থেকে থেকে,
পুনঃ যে মিশায়।

সখী ! পুনঃ কেন কালাচাঁদ
আসে যমুনায় ?

বৃন্দাবন ত্যজিয়াছে,
মথুরায় মাতিয়াছে,
কুব্জা সুন্দরী রাণী,
কি কাজ রাধায় ?

পীত ধড়া দেছে ফেলে'
মো-সবারে গেছে ভুলে,
আর যেন শ্যাম রায়,
আসে না হেথায় ?

সখী ! পুনঃ কেন কালাচাঁদ
আসে যমুনায় ?

আবার ক্ষণেক তরে,
এসেছে কি ভুলাবারে,
বিরহের শত শিখা,
জ্বালিবারে তায়।

সহিতে এ জীর্ণ প্রাণ,
তাই কি ধ'রেছে তান,
যেতে বল তারে সখী !
ফিরি' মথুরায়।

সখী ! পুনঃ যেন কালাচাঁদ
আসে না হেথায় !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তবে কেন?

সে দিন তখনো ভাল
জলধর-পূর্ণাকাশে
বেল, যুঁই সারা রাতি
মরমে বেদনা পেয়ে

কুড়াইয়া পুষ্প-রাজি
নীরবে আমার গলে
নয়নে খেলিছে হাসি,
লুকাইতে সাধ তাই—

হাতে ধ'রে জিজ্ঞাসিনু—
মরমে পুষিয়া ব্যথা

সহসা তোমারে হেরি,
কেন বল! দেখা দিলে
তোমারে বাসিয়া ভাল,
ছিলাম তোমারি ধ্যানে,

হায়! আজ এ কি কথা,
হৃদাকাশে দীপ্ত-তারা
আশা দিয়া অভাগারে,
তবে কেন বল সখী!

ওঠে নি প্রভাত-রবি॥
ফুটে নি অস্ফুট ছবি।
চাহিয়া চন্দ্রমা তরে।
প্রভাতে পড়িছে ঝরে॥

নিভৃতে গাঁথিয়ে মালা।
পরাইলে কেন বালা!
চঞ্চলা বালিকা রাণী।
তোলো নি বদন-খানি?

আর কেন হেন খেলা!
বোঝো নি কি হৃদি-জ্বালা?

জাগিল বাসনা-রাজি।
প্রেমের প্রতিমা সাজি!
তোমারে হৃদয়ে রাখি।
তোমারে অন্তরে দেখি॥

এ কি ঘোর সর্ব্বনাশ।
মেঘেতে করিল গ্রাস।
বাঁধিলে প্রেমের ডোরে।
চরণে ঠেলিছ মোরে॥

শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত।

পূর্ণিমা।

—:০:—

সংসার রেখেছে ছেয়ে'
এ কি এ বসন দিয়ে,
বিভোর করেছে প্রাণ
কি মন্ত্র-বলে।

স্নিগ্ধ হ'ল দগ্ধ কায়
পরশ লাগিয়া গায়,
মালা গাঁথা মনে হয়
কত না ছলে॥

মধুর বসন্ত-বায়
যমুনা মধুরে গায়
ধীরে ধীরে বহে যায়
মন-হরষে।

কোকিল কাকলি গায়,
প্রাণ মন উথলায়,
মধুর যামিনী ভায়
মধু-পরশে॥

স্বর্ণ কান্তি উঠে ফুটে'
হাসি যেন পড়ে লুটে'
শোক দুঃখ যায় ডুবে
তটিনী-তলে

যমুনা হৃদয় খুলে'
তাই বুঝি কুতূহলে,
বারেক দেখায় পুন
রাখে অতলে॥

আঁচল ঢাকিতে হায়
তবু যেন খ'সে যায়
প্রাণের লুকান আশা
উঠে উথলি'।

সুদূর আকাশ থেকে'
শশী শুধু চেয়ে' দেখে
অনিমেষ ঘুম চখে
কিছু না বলি॥

আজিকে হেরেছি শশী!
তোর সেই মধু হাসি
তোর সেই গুপ্ত-প্রেম
পশে মরমে।

এত সুখ, এত শান্তি,
এত প্রেম, এত তৃপ্তি,
এ আনন্দ ভুলিব না
কভু জনমে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

হুগলী জেলার স্থানীয় মুখপত্র

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। মূল্য সহরে ১৲ টাকা; মফঃস্বলে সডাক ১।৹ আনা। বিগত আষাঢ় মাসে ইহা দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ইহা "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সমগ্র হুগলী জেলার মুখপত্র। এত দিন উক্ত জেলার মুখপত্রের অভাব ছিল; এই পত্র সে অভাব দূর করিয়াছে। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।

মাধবীতলা, চুঁচুড়া।

সখা ও সাথী।

বালকবালিকাদের জন্য, দেশমধ্যে একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছেন—"It is very well got up and would make a nice reading periodical for boys of high and middle schools.

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক বলেন—"It is suitable for perusal out of school hours by boys of high and middle schools."

অমৃতবাজার সম্পাদক বলেন —"It is very well got up. The undertaking deserves success".

মিরার সম্পাদক বলেন—"It contains excellent and well-written articles and moral stories. The get-up of the paper is excellent".

হিন্দু পেট্রিয়ট্ বলেন—"There is a considerable amount of readable matter that must prove interesting and instructive to young people. Pictorial illustrations form a special feature of the magazine."

ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক বলেন—"It is full of fun and instructions. It will be specially welcome to boys and girls and may be enjoyed by their elders".

বঙ্গবাসী সম্পাদক বলেন—"এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বালকবালিকাদের শিক্ষা-সাধন। ছোট ছোট চুট্‌কী পদ্য বেশ সুমিষ্ট। অনেক গল্প ও জীবন-চরিত শিক্ষাপ্রদ। ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।"

স্থানাভাবে অন্যান্য সম্পাদকদের মতামত দেওয়া গেল না। প্রতি সংখ্যায় পাঁচ ছ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র ও মধ্যে মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিবার উপযুক্ত লিথোগ্রাফ চিত্র দেওয়া হয়। মূল্য বৎসরে ডাকমাশুল সমেত এক টাকা মাত্র। ১৩০১ সনের বাঁধান সখা ও সাথীর মূল্য ১।০ ডাকমাশুল দুই আনা। ইহাতে ২৪০ পৃষ্ঠা এবং ৪ খানি উৎকৃষ্ট লিথো-গ্রাফ চিত্র ও ৮৫ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন (কার্য্যসম্পাদক)।

১৭ নং মধুসূদন গুপ্তের লেন,—বহুবাজার পোঃ, কলিকাতা

"অনুশীলনের" নিয়মাবলী।

১। "অনুশীলন" প্রতি মাসে, ডিমাই ৮ আট পেজী ৬ ছয় ফর্ম্মা ৪৮ আটচল্লিশ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হয়।

২। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, প্রত্নতত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পদ্য, জীবনচরিত, সমালোচন, নানাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অনুশীলন, "অনুশীলনে" স্থান পাইবে।

৩। "অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধ, বিনিময় এবং সমালোচনার্থ পুস্তক ও পত্রিকাদি, পাঠাইবার ঠিকানা ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরি"।

৪। টাকা, কড়ি ইত্যাদি ৪৯ নং কিয়ার লেনস্থ "মোহন প্রেসে" শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাকমাশুল ১।০ পাঁচ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৵০ আঠার আনা।

৬। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৭। বিজ্ঞাপন ছাপিবার নিয়ম—প্রতি পঙ্‌ক্তি প্রতি মাসে ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৪৯ নং কিয়ার লেন,
কলুটোলা,—কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকাবলী—

১।	অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত	৸০
২।	প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত	।৵০
৩।	ব্যাকরণ প্রবেশিকা	৵১০
৪।	হানিমানের জীবনী	।৵০
৫।	সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর	॥০
৬।	স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর	।০
৭।	ভূ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর	।০
৮।	বংশাবলি (যন্ত্রস্থ)	

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

১৩০২ সাল, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।] [২য় ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

অনুশীলন

ও

পুরোহিত

সম্পাদক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সূচী।

১৭।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৯ নং বিশ্বাস লেন, "মোহন প্রেস" হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

অনুশীলনের সমালোচনা।

(1) we have received the first five numbers of this Bengali monthly edited by Pandit Mahendranath Vidyanidhi. It was not long since that we had an occasion to say in noticing a book of his, that Pandit Vidyanidhi was well known to the literary world as a notable writer of Bengali prose. From the numbers before us, we can say that Pandit Vidyanidhi has well sustained his reputation. The new magazine contains many pieces and it promises to be a welcome accession to the ranks of the Vernacular literature of the day.

—The Amrita bazar Patrika. March 4,1895.

(2) Anushilan vol 1, nos 2 and 3. Out of the thirteen papers embodied in the double number of the above magazine before us, no less than six are devoted to the notice of Bengali Theatricals. Five of these, relate to current plays, and the sixth, rather the first and foremost, contains an account of amateur theatricals in Bengali which on point of painstaking research forms a valuable contribution on the subject. The magazine is under the supervision of pandit Mahendranath Vidyanidhi., who seems to have taken an active and important part in its conduct.

—*Indian Mirror, 23rd Feb., 1895.*

(৩) "অনুশীলন নূতন মাসিক পত্র ও সমালোচন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধারক। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন' বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অনেক নূতন লেখক নবানুরাগে, নূতন উৎসাহে, ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 'অনুশীলনে' অনেক বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয়, নিজে আমাদের দেশীয় রঙ্গভূমির এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালায় একটী নূতন জিনিষ হইবে। "অনুশীলনে" যেরূপ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে গ্রন্থাদির সমালোচনা হইয়া থাকে। সমালোচক এ জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

—জন্মভূমি, ১৩০১। ফাল্গুন।

(৪) "অনুশীলন—মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত। এই নবপত্রে বিষয়-সন্নিবেশের বৈচিত্র ও রচনার পরিপাট্য আছে। নবীন পত্র দীর্ঘজীবী হইলে আমরা সুখী হইব।"

—হিতবাদী, ১৩০১। ১১ই ফাল্গুন।

(৫) "আমরা এই পত্রিকার ১ম, ও ২য়, সংখ্যা পাইয়াছি। "বৌদ্ধমঠ" ও "সখের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত" এই দুইটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধ গুলিও বড় মন্দ হয় নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ১৩০১, ২৮শে মাঘ।

অনুশীলন

ও

পুরোহিত।

দ্বিতীয় ভাগ } ১৩০২ সাল, জ্যৈষ্ঠ { দ্বিতীয় সংখ্যা।

প্রাতঃকৃত্য।

—:*:—

"মাক্ষিকং পিপ্পলীসর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধং ॥"

মধু ।।০ অর্দ্ধ তোলা, গব্যঘৃত ।০ চারি আনা এবং পিপ্পলীচূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্তশূল নিবৃত্ত হয়। দন্তশূলের ইহা একটী প্রধান ঔষধ। যাঁহারা দন্তের যাতনায় অধীর হইয়া, দন্তোৎপাটনের জন্য ডাক্তার মহাশয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহারে অবশ্যই উপকৃত হইবেন।

"দন্তচালে তু গণ্ডূষো বকুলত্বক্কৃতোহিতঃ।"

যাঁহাদের দন্ত অকালে নড়ে, তাঁহারা বকুলের থেঁতো করা ছাল দুই তোলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রত্যহ গণ্ডূষ করিবেন। তাহাতে তাঁহাদের অদৃঢ় দন্ত দৃঢ় হইবে।

জিহ্বা-নির্লেখন যন্ত্র।

"সুবর্ণরূপ্যতাম্রাণি ত্রপুরীতিময়ানি চ।
জিহ্বানির্লেখনানি স্যুরতীক্ষ্ণানি মৃদুনি চ॥

জিহ্বামূলগতং যচ্চ মূলমুচ্ছ্বাসরোধি চ।
মুখবৈরস্য-দৌর্গন্ধ-শোফ-জাড্যহরং সুখং॥"

প্রত্যহ মুখ প্রক্ষালন কালে জিহ্বানির্লেখন যন্ত্র (জিভছোলা) দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। ঐ যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা সীসক নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক এবং উহা যেন কঠিন হয়। উহার প্রান্তদ্বয় অতীক্ষ্ণ (ধারাল নয়) হওয়া আবশ্যক। জিভছোলা দ্বারা জিভ আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিলে, জিহ্বার মূলস্থিত উচ্ছ্বাসরোধক মলা সকল দূরীভূত হয় এবং মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, স্ফীততা ও জড়তা নষ্ট হয়।

"পাটিতং মৃদু তৎকাষ্ঠং মৃদুপত্রময়স্তথা।"

কোন প্রকার নির্লেখন যন্ত্রের অভাবে পূর্ব্বকথিত মৃদু দন্তকাষ্ঠ ছিন্ন করিয়া, জিভছোলা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কৃত করিবে।

তদভাবে তর্জ্জনী ও মধ্যমা নামক অঙ্গুলীদ্বয় জিহ্বার উপরিভাগে পুনঃ-পুন সঞ্চালন করিলেও জিহ্বা ও জিহ্বার মূলগত মলা বিদূরিত হইবে।

"মুখপ্রক্ষালনং শীতপয়সা রক্তপিত্তজিৎ।
মুখস্যপিড়কা শোষ নীলিকাব্যঙ্গনাশনঃ॥"

উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে দন্ত ধাবনাদির পর শীতল জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করা বিধেয়। তাহাতে মুখব্রণ, মুখশোষ এবং মেচেতা প্রভৃতি রোগ জন্মে না এবং ঐ সকল রোগ থাকিলেও তাহার শান্তি হইয়া যায়। রক্তপিত্তরোগের উপশম হইয়া থাকে। এই রোগে মুখ ও নাসিকা দ্বারা রক্তস্রাব হইতে থাকিলে পুনঃপুন শীতল জল দ্বারা মুখ ধৌত করা কর্ত্তব্য এবং চক্ষুতে জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত।

"গণ্ডুষমপি কুর্ব্বীত শীতেন পয়সা মুহুঃ।
কফতৃষ্ণামলহরং মুখান্তঃশুদ্ধিকারকং॥"

বারংবার শীতল জলদ্বারা কুলি করিলে, কফ এবং মুখাভ্যন্তরস্থ মলা দূরীভূত হওয়ায় মুখ পরিশুদ্ধ হয় এবং পিপাসার শান্তি হয়।

"সুখোষ্ণোদকগণ্ডূষঃ কফারুচিমলাপহঃ।
দন্তজাড্যহরশ্চাপি মুখলাঘবকারকং॥"

কফদোষ, অরুচি এবং দন্তে জড়তা থাকিলে, ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা কুলি করিলে তৎসমস্ত নিবারিত হয় এবং মুখের লঘুতা জন্মে।

"কুর্য্যাদ্বাপি কটূষ্ণেণ পয়সাস্য বিশোধনং।
কফবাতহরং স্নিগ্ধং মুখশোষবিনাশনম্॥"

মুখ, শ্লেষ্মা দ্বারা অত্যন্ত লিপ্ত হইলে শুঁঠ, পিপুল এবং মরীচচূর্ণ উষ্ণ জলে মিলিত করিয়া কুলি করিলে মুখ বিশুদ্ধ হয় এবং শ্লেষ্মা বায়ুর শান্তি ও মুখশোষ নিবৃত্ত হয়।

"ন খাদেদ্‌গল-তাল্বোষ্ঠ-জিহ্বাদন্তগদেষু চ।
মুখস্য পাকে শোথে চ শ্বাসকাসবমীষু চ॥
দুর্ব্বলোঽজীর্ণী ভুক্তশ্চ হিক্কা-মূর্চ্ছামদান্বিতঃ।
শিরোরুজার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ॥
অর্দ্দিতী কর্ণশূলী চ নেত্ররোগী নবজ্বরী।
বর্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠন্তু হৃদাময়যুতোঽপি বা॥

তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং দন্তে রোগ জন্মিলে, দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। মুখপাক, শোথ, শ্বাস, কাস এবং বমী রোগেও উহা অব্যবহার্য্য। দুর্ব্বল,অজীর্ণ, রোগগ্রস্ত,ভুক্ত এবং হিক্কা, মূর্চ্ছা, মদরোগগ্রস্ত,শিরোরোগবিশিষ্ট পিপাসিত, শ্রান্ত,জলপানে ক্লান্ত,অর্দ্দিত (এক প্রকারের বাত ব্যাধি)-রোগযুক্ত কর্ণশূলবিশিষ্ট, নেত্ররোগী, নবজ্বরী এবং হৃদ্রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।

কটুল নস্য।

কটু-তৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি, মধ্যাহ্নে পিত্তে, সায়ং সমীরণে॥
সুগন্ধবদনাঃস্নিগ্ধনিঃস্বনা বিমলেন্দ্রিয়াঃ।
নির্বলী পলিতব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ॥"

প্রত্যহ সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ অভ্যাস করিবে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে প্রাতঃকালে, পিত্তে মধ্যাহ্নকালে এবং বায়ু বৃদ্ধি হইলে সন্ধ্যাকালে, নস্য গ্রহণ করা বিধেয়। সতত নস্যগ্রহণে মুখমণ্ডল, শব্দ-রূপ-রসাদি-

বাহী স্নায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। তাহাতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ চক্ষুর দর্শন শক্তি, কর্ণের শ্রবণ শক্তি, জিহ্বার স্বাদ-গ্রহ শক্তি এবং নাসিকার আঘ্রাণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক, স্নেহযুক্ত হওয়ায় কেশের অকালপক্কতা এবং চর্ম্মের লোলত্ব উপস্থিত হয় না। মুখে সুঘ্রাণ জন্মে এবং শ্লেষ্মা ক্ষয় হওয়ায় শব্দবাহিনী শিরা সকল স্নিগ্ধ থাকায় স্বর বিশুদ্ধি জন্মে।

মুখপ্রক্ষালনান্তে গাত্রমার্জ্জনী (গামছা বা তোয়ালে) দ্বারা গাত্র-মার্জ্জন ও রাত্রি কালের ব্যবহৃত বস্ত্র পরিত্যাগ ও ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দর্পণে মুখদর্শন এবং কেশবিন্যাস করিয়া প্রাতর্ভ্রমণ করা বিধেয়। কোন ভদ্র-সমাজে বা ভদ্র লোকের নিকট গমন করিতে হইলেও দর্পণে মুখ দর্শন এবং কেশ বিন্যাস করা উচিত। কারণ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দেখিলে মনে প্রীতি জন্মে। প্রীতিতেই দেহের স্ফূর্ত্তি।

আদর্শ অবলোকন্।

"আদর্শলোকনং প্রোক্তং মাঙ্গল্যং কান্তিকারকং।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পাপালক্ষীবিনাশনং॥"

দর্পণে মুখদর্শন করিলে মনে প্রীতি জন্মে, সুতরাং উহা মঙ্গলজনক, কান্তি বৃদ্ধিকর, পুষ্টিজনক, বলকারী, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং অশোভানাশক।

দর্পণে মুখ দর্শনে মনে একটী অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তাহাতে কুভাবের কোন প্রকার পূতিগন্ধ অনুভূত হয় না। এই পবিত্র ভাবের সঞ্চার হেতু মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অনুভব হয়, তাহাতে উল্লিখিত গুণসকলের লাভ হয়।

কেশ-প্রসাধন।

"কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যাতু সাধনং।
কেশপ্রসাধনং কেশ্যংরজোজন্তুমলাপহং॥

কেশপ্রসাধনী (চিরুণী) দ্বারা কেশ বিন্যাস করিবে। তাহাতে চুল সংবর্দ্ধিত হয় এবং উকুন, ধূলি ও মলা দূরীভূত হওয়ায় মস্তক পরিষ্কৃত থাকে।

আজকাল কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইলে, নানাপ্রকার কেশ-বিন্যাস-ছটা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। কেহ কপালের মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, মস্তকের অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সীমন্ত কাটিয়া চলিয়াছেন, কেহ বা একটী মস্তকে দু চারিটী সীমন্তবর্ত্ম অঙ্কিত করিয়া রেলবর্ত্মকে তিরস্কার-চ্ছলে মস্তকের শোভা সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন, কাহারও কেশ তরঙ্গায়িত ভাবে সজ্জিত, কাহারও বা কেশ সম্মুখে দীর্ঘ, ক্রমে খর্ব্ব—খর্ব্বতর হইয়া পশ্চাতে একেবারে খর্ব্বতম ভাব ধারণ করিয়া মস্তকের পুরোভাগ ও পশ্চাদ্ভাগের পার্থক্য প্রদান জন্য যেন জনগণকে আহ্বান করিতেছে। এইরূপ নানাভাবে সজ্জিত মস্তক দৃষ্টিপথে পতিত হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেশ-বিন্যাস, কেশের ও মস্তকের পরিচ্ছন্নতা ও অশোভা-নাশের জন্য, ভদ্র-সমাজের হাস্যোদ্দীপনের জন্য নহে। তদ্রূপ কেশবিন্যাসে মনের চিত্র, কেশে প্রকটিত হয়। উহা অবিনয়, ঔদ্ধত্য এবং নির্লজ্জতার পরিচায়কমাত্র

প্রাতর্ভ্রমণ।

"যস্তচংক্রমণং নাতিদেহপীড়াকরং ভবেৎ।
তদায়ুর্ব্বলমেধাগ্নি-প্রদমিন্দ্রিয়বোধনং॥"

প্রাতর্ভ্রমণে আয়ু, বল, মেধা এবং উদরাগ্নি প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং প্রাভাতিক পবিত্র সমীরণ সেবনে ইন্দ্রিয় সকল প্রফুল্ল হয়। যেরূপ ভ্রমণে শরীরের অত্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহা কর্ত্তব্য নহে। ইতি প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত।

শ্রীমনোমোহন সেনগুপ্ত কবিরাজ।

নব্যবঙ্গ।

—•◌•—

(সমালোচনার প্রতিবাদ *)

সমভাবে আলোচনা করাকে যদি সমালোচনা বলে, অন্ধতা বা একদেশ-দর্শিতা-বর্জ্জিত হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে পুস্তকের দোষগুণ বিচার করার নাম যদি সমালোচনা হয়, তবে গত বৎসরের শ্রাবণের নব্যভারতে প্রকাশিত "নব্যবঙ্গ" পুস্তকের সমালোচনা কোন মতেই সে নামে অভিহিত হইতে পারে না। সমালোচনা করিতে গিয়া বাবু চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় বিস্মৃত হইয়াছেন যে, সমালোচনা বড়ই গুরুতর, বড়ই পবিত্র, বড়ই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। নিজের বহুকাল-পোষিত জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্থল ইহা নহে ; এবং মনের জ্বালা নিবাইতে গিয়া হীনতাপূর্ণ, কুরুচিপূর্ণ ভাষায় এক খানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া তাহার গৌরব হানি করা অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য। গ্রন্থেরই সহিত সমালোচকের সম্বন্ধ। সমালোচনা কালে গ্রন্থকারের সহিত কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নহে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার কিছু থাকে, ঘরে গিয়া তাহা করিলেই চলিবে। সাধারণের সহিত তো ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিছুই নাই। স্মরণ রাখা উচিত, সমালোচক ও বিচার-পতি তুল্য আসনে আসীন। বিচারপতির বিচার ফল যেমন কেবল বাদী প্রতিবাদী লইয়া নহে, সাধারণও তাহার অংশভাগী ; পুস্তক সমালোচনাও কেবল গ্রন্থকারকে লইয়া নহে, সাধারণ পাঠকের অনেক ক্ষতি বৃদ্ধি তৎপ্রতি নির্ভর করে।

---

* গত ১০ই ভাদ্র তারিখে এই প্রতিবাদটী "নব্যভারত" সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়। তার পর কত সংখ্যা নব্যভারত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিমাসেই সম্পাদককে পত্র লিখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "এ বারে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল না কেন? আগামী বারে কি মুদ্রিত হইবে?" কিন্তু সম্পাদক মহাশয় একখানি পত্রেরও উত্তর দেন নাই। অবশেষে পৌষ মাসে "প্রবন্ধটি মুদ্রিত না হইলে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করাতে তখন সম্পাদক বলিলেন, "আমার অসুস্থতাপ্রযুক্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই ; আপনার প্রস্তাবমত সেটি ফিরাইয়া দিলাম।" —প্রতিবাদক।

সমালোচকের প্রধান কার্য্য গ্রন্থকারের ভাব নির্ণয় করা। সে সময়ে নিজের মতামত, নিজের রুচি প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য ও নীতি কি, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে তিনি যে সকল চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্ত সেই ভাবের অনুযায়ী হইয়াছে কি না, গ্রন্থকারের চিত্রনৈপুণ্যের ত্রুটি আছে কি না, তাঁহার তুলিকাপ্রয়োগদোষে কোনও চিত্র অতিরঞ্জিত বা অল্পরঞ্জিত হইয়াছে কি না, সমালোচক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এই সমস্ত নিরাকরণ করিবেন।

নব্যবঙ্গের অত গুলি চরিত্রের মধ্যে বিমলার চরিত্রটিই চন্দ্রশেখর বাবুর ভাল লাগিয়াছে। ভবানীর চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। তিনি তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের কোনও কথা নাই। যে নগেন্দ্রনাথকে এক্ষণে ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, সমালোচক মহাশয় তাহারও নামগন্ধ করেন নাই। বঙ্গসমাজে এখনও অনেক রতিকান্ত আছেন; কিন্তু তিনি এ সকল চরিত্রের বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি বিমলা চরিত্রেরও কিছু উল্লেখ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার একটী গুপ্ত উদ্দেশ্য-সাধনার্থই তাহার উল্লেখ হইয়াছে। সে উদ্দেশ্য, বঙ্গসমাজের বাসর-প্রথার এবং সেই সঙ্গে বঙ্গবামাগণের কুৎসা করা। বাস্তবিক তাহার প্রকৃত সমালোচনাও কিছু করেন নাই। এই স্থলে সমালোচকের ন্যায় মূল কথা ত্যাগ করিয়া (পুস্তক সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়া) বঙ্গীয় বাসরপ্রথা-সম্বন্ধে আমরা তাঁহার কথা লইয়াই তাঁহার কথার উত্তর দিতেছি।

সমালোচক, হিন্দু-সমাজের কোনও সংবাদ রাখেন না বলিয়াই বোধ হইল। নহিলে তিনি বলিবেন কেন "প্রতিপোষকদের মত এই যে সব দিক্ বন্ধ করিয়া চাপ দিলে ফাটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য এক দিকে এই বাসর প্রথারূপ একটি ছিদ্র রাখিয়া চলিতেই হইবে।" বাসরপ্রথা প্রচলনের চমৎকার মূল কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন! এ অভিজ্ঞতা তিনি কোথা হইতে লাভ করিলেন? জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা আটঘাট খুলিয়া দিয়া অধিকতর বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিত্য অহোরাত্র "ফাটিয়া বাহির হইতেছে" ও "বিষম কাণ্ড ঘটিতেছে",—না যাঁহারা "একটু ছিদ্র" রাখিয়াছেন, তাঁহাদের ঘটিতেছে? ইহার জন্য তো

প্রতিপোষক চাহি না, তর্কও চাহি না, যুক্তিও চাহি না। ইহা যে চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ। কিন্তু হিন্দু-ললনারা কেবল একদিন বাসর ঘরে স্বাধীনতা ভোগ করেন না, নানা পর্ব্বোপলক্ষে পবিত্রতোয়া গঙ্গায় স্নান দ্বারা পাপরাশি বিধৌত করিবার স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের অসংখ্য তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা দেবদেবী দর্শনে, সাধু দর্শনে, দানধ্যানে দেহ মন পরিতৃপ্ত করিবার এবং অপার পুণ্য সঞ্চয়ের স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে। আর কলিকাতা লইয়া সমস্ত বঙ্গসমাজ বা হিন্দু সমাজের কথা নয়। কলিকাতার বাহিরে সমগ্র বঙ্গদেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু ললনা-কুল, প্রত্যহ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া, লজ্জা নম্রতায় পরিবৃতা ও সমাজ শাসনে পরিরক্ষিতা হইয়া পথে বাহির হন, পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যান, তথা হইতে অপরাহ্ণে কলসী কক্ষে জল আনয়ন করেন। প্রতিবাসী বা আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। আবহমান কাল এইরূপ করিয়াই সীতা সাবিত্রীর জাতীয়া রমণীকুল জগতের আদর্শ রমণী জাতি হইয়াছেন। সে সতীত্ব, সে পাতিব্রত্য, সে লজ্জা, সে নম্রতা আজিও ইয়ুরোপ, আমেরিকার কল্পনার অতীত, স্বপ্নের অগোচর। গভীর মানবচরিত্র-তত্ত্বজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, এক রাত্রির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্যালিকা প্রভৃতি অগণিত আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন, অপরিচিত বিশিষ্ট লজ্জাভয় মানসম্ভ্রমের স্থলে "কথা বার্ত্তার আলাপ পরিচয়ের আদর অভ্যর্থনার কায়মনোবাক্যে পরস্পরের ভিতর প্রবেশ" করিবার বিশেষ সুবিধা ও অবকাশ অধিক, না—কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর পত্নী, ভগিনী বা কন্যার সহিত অল্পে অল্পে দিনের পর দিন, একটু একটু করিয়া সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গে, সাহিত্যালাপের ওজর করিয়া আর (লজ্জার কথা) ধর্ম্মালোচনার ভাণ করিয়া "চুরি করিয়া অন্যায় সম্ভোগ" অধিক ঘটিয়া থাকে? বাসর ঘরে লজ্জাহীনতা আছে, কেহ অস্বীকার করিতেছে না; কিন্তু স্ক্রীনের আড়ালে, পুস্তকের আড়ালে, মশারির আড়ালে যে লজ্জাহীনতা, যে কলঙ্ক প্রকাশ হয়, বাসরঘরের "ভীষণ ভাব" তদপেক্ষা সহস্রগুণে ন্যূন নহে কি? তিনি যে বাসর ঘরে "দেখিতে দেখাইতে" এবং "কার্য্য শেষ করার কথা" বলিয়াছেন, তাহা কোনও ভদ্র হিন্দুগৃহের বাসরে সংঘটিত হইতে আমরা

দেখিও নাই, শুনিও নাই। তিনি যদি কোথাও দেখিয়া থাকেন, তবে সে গৃহে, কেবল বাসরে নহে,নিত্য ঐ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বিশ্বপরিচিত দুক্রিয়াসক্ত বর ভিন্ন ওরূপ কার্য্য কেহ করিতেও পারে না। লক্ষের মধ্যে একটা দৃষ্টান্তকে স্বদেশীয় প্রথা বলিয়া প্রচার করিলে নিতান্তই সত্যের অবমাননা করা হয়।

সমালোচক, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—৭১ পৃষ্ঠার বর্ণনা লইয়া গ্রন্থকারকে অভদ্রোচিত শ্লেষ করিয়াছেন। আজ কাল আমরা যতই শিক্ষিত হইতেছি, শিক্ষিত হইয়া এক দিকে যেমন ধোপা, নাপিত, ছুতোর, কামার, কুমোর,চাষা, ভদ্র, নীচ সকলকেই 'আপনি' 'বাবু' 'মহাশয়' বলিয়া ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের ঐকান্তিক পরিচয় দিতেছি, অন্য দিকে সেই রূপ কথায় কথায় প্রকাশ্য ভাবে সংবাদ পত্র ও মাসিকপত্রে, কাব্যে, কবিতায়, গদ্য গ্রন্থে—যাহা পড়িয়া সাধারণে শিক্ষা পাইবে, যাহা পড়িয়া আমাদের সন্তান-সন্ততি জ্ঞান লাভ করিবে,যে সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্ব স্ব চরিত্র গঠিত করিবে—সেই সকলে ব্যক্তিগত গ্লানি বা শ্লেষ করিয়া শিক্ষা ও ভদ্রতার সুন্দর পরিচয় দিতেছি! এইরূপ লেখা প্রচারের সূত্রপাত ১৪।১৫ বৎসর হইয়াছে। ১৪।১৫ বৎসর এই কুরীতি বঙ্গ-সাহিত্য কলঙ্কিত করিতেছে। এ বিজাতীয় ড্রেন আমাদের সাহিত্য প্রদেশের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট করিতেছে না,এ আমদানি অচিরে বন্ধ না করিলে সাহিত্যজীবীদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে, আয়ুর হ্রাস হইবে।

সমালোচক "নব্য বঙ্গ" পুস্তকে মধ্যে মধ্যে বর্ণনার কারিগরী ছাড়া অন্য কোনও গুণ দেখেন নাই। "নব্যবঙ্গ" যে বঙ্গ সমাজের একটী সঠিক চিত্র, তাহার তিনি কোনও উল্লেখ করেন নাই। সমাজ-চিত্র দিতে গিয়া লেখক, অপক্ষপাতে সকল সম্প্রদায়েরই দোষ গুণ চিত্র করিয়া বিশেষ গুণপণা ও ন্যায়দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কারকেরা হিন্দুসমাজের প্রকৃত দোষ কিছুই দেখাইতে পারেন নাই; অনুকরণের মোহে তাঁহারা পদে পদে বিড়ম্বিত হইতেছেন মাত্র। কিন্তু "নব্যবঙ্গ"-লেখক, সমাজের প্রকৃত দোষগুলি অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন; এজন্য তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

গ্রন্থে পুস্তকান্তরের সামান্য ছায়া পড়িলেও এবং দু' একটী চিত্র অতিরঞ্জিত

হইলেও ভবানী-চরিত্র নূতন, সুন্দর, আদর্শ ও মৌলিক। ভবানীর প্রেমে গভীরতা আছে, তন্ময়তা আছে, আত্মবিসর্জ্জন আছে. কিন্তু তাঁহার প্রেমে উৎকট রকম কিছুই নাই; সে প্রেমে প্রেম-অভিব্যক্তির জন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা নাই, সুদীর্ঘ প্রেমপত্র নাই; সে প্রেম, ভাষায় নয়—ভাবে ও কার্য্যে; তাই সাধারণ বাঙ্গালা নবেলের চরিত্র গুলির নিকট ইহা নূতন। সরল অকপট বলিয়া—এক খানি পরিপূর্ণ চিত্র বলিয়া—ভবানী-চরিত্র সুন্দর। ইংরাজি ছাঁচে ঢালা নবেল, নাটক, কাব্য পড়িয়া হিন্দু ললনাগণ বিকৃত-বুদ্ধি, বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পড়িতেছেন—যেন তাঁহারা কক্ষভ্রষ্ট হইতেছেন। ভবানীর মত আদর্শ চিত্র তাঁহাদিগকে হিন্দু ললনার মধুর মঙ্গলজনক আদর্শভাব শিখাইবে।

ভবানীর চিত্র মৌলিক; এই জন্য যে, শত শত উপন্যাসের রমণী-চরিত্রে স্বামিবিরহের যেরূপ হা হুতাশ আছে, অধৈর্য্য আছে, অদ্ভুত কাণ্ড আছে, আত্মহত্যা আছে, বিবাগিনী হওয়া আছে, হিন্দু নারীর পারিবারিক সহস্র কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দেওয়া আছে, আরও কত কি আছে, কিন্তু ভবানীর তাহা নাই। ভবানী নীরবে স্বামীর বিরহ সহিয়াছেন, কত বৎসর হিন্দু ললনোচিত, অপার সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন। নিরুদ্দেশ পতির চিন্তায় তাঁহার দেহপাত হইতেছিল, কিন্তু তাহাতেও তিনি সংসারের কর্ত্তব্য এক দিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই, বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই। প্রত্যেক হিন্দু নারীর বোঝা উচিত, তিনি সংসারের জন্য, সংসার তাঁহার জন্য নহে। এ দৃষ্টান্ত ভবানী পূর্ণভাবে দেখাইয়াছেন।

বঙ্গ সমাজে এখন হরিশ্চন্দ্র অপেক্ষা নরেন্দ্রনাথের সংখ্যা বড় কম নহে! ইংরাজি পড়িয়া আমরা এখন বেশী স্বাতন্ত্র্য শিখিয়াছি; সুতরাং ভ্রাতা কৃতী হউক বা অকৃতী হউক 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' চারিদিকেই হইতেছে। এই টানাটানির দিনে আমরা অপরিমিত ব্যয় করিয়া সংসারে অনিবার্য্য সম্পদে বিপদে, দুঃখে সুখে, রোগে শোকে, যে লোকবলের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন বশে শ্যালক বা নিঃসম্পর্কীয় লোকজন প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত—তথাপি অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পব্যয়সাধ্য, ব্যথার ব্যথী সহোদরকে চারিটী অন্ন বস্ত্র দিতে অক্ষম; এ ঘৃণিত দৃশ্য ক্রমে গা-সহা হইয়া পড়িতেছে,

কিন্তু কৃতী ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতার, ভগিনী বা মাতা, দুর্ব্বৃত্তা পত্নীর পরামর্শে যে গৃহ-বহিষ্কৃতা হইয়া পাচিকার কার্য্য বা অন্য কোন উঞ্ছ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এ দৃশ্য ভয়ানক, সুতরাং বিষম সর্ব্বনাশকর। তাই বলিতেছি, হরিশ্চন্দ্রের অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সমাজ অধঃপাতে যাইবে, সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হওয়াতে যে অনিষ্ট অশান্তি হইতেছে, তদপেক্ষা আরও হইবে।

এই প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় দিতে পারিলাম না। এই দুর্দ্দিনে শিবকৃষ্ণ ঘোষ ও তৎপত্নী প্রসন্নময়ীর মত পুরুষ ও নারীর বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, পুস্তক খানি যে সময়োপযোগী, এবং সকলেরই ইহা পড়া উচিত, তাহা বোধ হয় চন্দ্রশেখর বাবুও স্বীকার করিবেন। পুস্তক খানি সুখপাঠ্য ও অনেক শিক্ষাপ্রদ।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

একটী সত্য গল্প।

(১)

সন্ধ্যার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া কোন একটী বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কাজটী বড় সোজা রকমের নয়। অতীতের স্মৃতির সুখময় চিত্র-গুলি অনেক দিন পরে পুনরায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম—পূর্ব্ব স্মৃতির স্তরে স্তরে যে সুখ দুঃখ অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিহিত ছিল, তাহাই উপভোগ করিতেছিলাম। কাজটা হইতেছে এই—আমার স্ত্রী সুকুমারীর প্রবাস-পত্র-গুলি একে একে বাহির করিয়া—পাঁচ সাত বার করিয়া পাঠ করিতেছিলাম।

আমি থাকিতাম বিদেশে—প্রবাসে। সুকুমারী থাকিত দেশে—আমি প্রবাসী—সুকুমারী বিরহিণী। চাকরী তত বড় গোছের নহে, কাজেই তাহাকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে পারি নাই। এই সময়ের মধ্যে সুকুমারী প্রতি সপ্তাহে আমায় পত্র লিখিত। সে পত্র গুলির ছত্রে ছত্রে, কথায় কথায়

উচ্ছ্বাসে, মেঘদূতের ছায়া পড়িয়াছিল। অতীতের স্মৃতি, বড় সুখকর, অতীতের আলোচনা বড়ই মধুর, তাই আমি এই সুখ-দুঃখ বিজড়িত, ঘটনাময় পত্র গুলি লইয়া, স্মৃতির সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলাম।

আজ সবে দুই সপ্তাহ হইল দেশে আসিয়াছি। এই কয় দিন সুকুমারীকে অতৃপ্ত-নয়নে দেখিয়াছি, দিনরাত তাহার সেই প্রণয়-পূর্ণ-হৃদয়ের সুখময় কথা গুলি শুনিয়া শ্রবণ মন তৃপ্ত করিয়াছি। তবুও অতৃপ্তি—তবুও আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ নির্জ্জনে তাহার পত্র গুলি বাহির করিয়া মিলনের সহিত বিরহের সংগ্রাম কিরূপ মধুর, তাহাই দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে স্নেহময়-কণ্ঠে মা আসিয়া ডাকিলেন—"বাবা! একবার বাটীর ভিতর আয়। তোর সম্বন্ধী আসিয়াছে।"

সম্বন্ধী মহাশয়ের বিবেচনার বড় প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার ভগিনীর মত অন্তঃপুর-নিবদ্ধ নহেন। তবে কেন যে কষ্ট-স্বীকার করিয়া আমার সহিত বাহিরে আসিয়া দেখা না করিয়া আমার মাকে এই কষ্ট টুকু দিলেন, তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

বাড়ীর ভিতরে গিয়া মা বলিলেন—"বাবা! তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বড় পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। তাই, সুরেশ, বৌমাকে লইতে আসিয়াছে। সে ছেলে মানুষ; কাঁদাকাটি করিতেছে। সে বলে, আজই—এখনই বৌমাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আমিও স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। "আজই পাঠাইতে হইবে" কথাটা বড়ই খারাপ লাগিল। আজ আট মাসের পর সবে পনর দিন মাত্র বাড়ী আসিয়াছি! মনের ভিতর একটা মহাঝড় উঠিল। এক দিকে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পীড়া ও মাতৃ-আজ্ঞা, অপর দিকে নিজের অনিচ্ছা।

মাকে বলিলাম—"আপনি যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করুন। কিন্তু আজ এই অবেলায় কখনও পাঠান হইতে পারে না। আট ক্রোশ রাস্তা যাইতে হইবে। মধ্যে আবার নদীও আছে! পথে সন্ধ্যা হইবে। কাল বৈশাখীর সময়—বৈকালে, অন্ধকারে নদী পার হওয়া, ভাল কথা নয়।"

মা বলিলেন—বড় জেদ্ করিতেছে বাবা—ছেলে মানুষ কাঁদা কাটা করিতেছে—বলিতেছে—একটু উপশম হইলে আবার রাখিয়া যাইবে।

পার-ঘাটে লোকের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছে—আমি বলি এখনও বারবেলা পড়ে নাই। এই বেলা বাহির হওয়াই ভাল।

ইহার উপর আমি কথা কহিলাম না। মাতার জেদ্ দেখিয়া নিরস্ত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, সুকুমারী গেলে, দুই এক দিন পরে নিজে গিয়াই উপস্থিত হইব। মাকে বলিলাম—"তবে আর বিলম্ব করিবেন না"। যাত্রার আয়োজন হইয়া গেল। সুকুমারী পালকীতে উঠিল। তাহার সহিত যাইবার পূর্ব্বে এক বার দেখা হইল না। মনে বড়ই কষ্ট হইল। আট মাস বিদেশে ছিলাম, তখন না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম; এখন আর এক মুহূর্ত্ত চলে না।

সুকুমারী চলিয়া গেল—তাহার সেই অবগুণ্ঠনাবৃত সংকুচিতা নব-বাসন্তী লতার ন্যায় সুকুমার সৌন্দর্য্য একবার ঘরের মধ্য হইতে দেখিয়া লইলাম। তাহাকে দেখিতে আবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু সে চলিয়া গেল। বিদেশ হইতে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম—সঙ্গীতেই নিশা ভোর হইবে! কিন্তু বিরহের ক্রন্দন আবার সেই সঙ্গীত ডুবাইয়া দিল।

(২)

এক এক জনের জন্য যেন কোন কোন গৃহের সৌন্দর্য্য শত দিকে ফুটিয়া উঠে। আবার তাহাদের অভাবে, যেন শ্মশানের ছায়া আসিয়া পড়ে। সুকুমারী চলিয়া গিয়াছে—খালি সেই গিয়াছে—ঘর দ্বারের যা যেখানে ছিল, সবই তেমনই আছে—কিন্তু তাহাদের সৌন্দর্য্য টুকু তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। আমার হৃদয় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে—তাড়িতালোকে উচ্ছ্বসিত ছিল—এখন ঘোর তামস হ্রদের নিম্ন সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

ঘরে আলো জ্বালা রহিয়াছে—এক বার ভিতরে গেলাম। টেবিলের উপর দেখিলাম, একখানি পত্র রহিয়াছে। সুকুমারীর হাতের লেখা। লাফাইয়া উঠিয়া পত্রখানি ধরিলাম। হিন্দুর সমাজের ও অবরোধের কঠোর নিয়মে সুকুমারীর যাইবার সময় আমায় কিছু বলিয়া যাইতে পারে নাই—তাই এই পত্র খানি রাখিয়া গিয়াছে।

আমি পত্রখানি পড়িলাম—লেখা আছে—"সময় নাই—সুবিধা নাই, দেখা হইল না, কিন্তু ভুলিয়া থাকিও না, শীঘ্র যাইও"। সংক্ষেপে

সরল ভাবে যে কটী কথা লেখা ছিল, তাহাতেই তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া লইলাম।

এক দীর্ঘ বিরহ সহ্য হয়, কিন্তু মিলনেরই পর বিরহ বড় কষ্টকর হইয়া পড়ে। আজ দেড় বৎসরের পর সবে বাড়ী আসিয়াছি! অস্ফুট প্রভাত-কমল কলিকার ন্যায় যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে আজ শত ধারায় সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথায় এত দিনের পর দু' দিন তাহাকে লইয়া সুখী হইব—প্রাণের অতৃপ্ত আশা মিটাইব, ক্লিষ্ট হৃদয়ের সামান্য আশা গুলি একে একে মিটাইব—না তাহাতেই এক অসম্ভাবিত বিপদ্ উপস্থিত হইল। আর এক মাস বৈ অবকাশ নাই। অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রেমোন্মাদ, লইয়া আবার সেই প্রবাসে ফিরিতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম!

দিনগুলা বড় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। থরে থরে সুপাচ্য ব্যঞ্জনাদি-পূর্ণ, মল্লিকা-বিনিন্দিত অতি শুভ্র অন্নগুলি বড়ই তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। পড়িতে বসিলে মনোনিবেশ হয় না—বেড়াইতে গেলে ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা, করে— ঘরে থাকিলে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয়—বড়ই সংকটে পড়িলাম।

এক বার সুকুমারীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। সুকুমারী আজ পাঁচদিন চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালনা যাইতে তখন বেশী সময় লাগিত। কালনা হইতে আমার শ্বশুর-বাড়ী আট ক্রোশ। মনে মনে সংকল্প আটিলাম, এক বার সুকুকে দেখিয়া আসিব।

সুকুমারী পৌঁছিয়াই আমায় পত্র লিখিবে বলিয়াছিল। যে দুই দিন পত্র না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, সে যে এত দিন চুপ করিয়া আছে, ইহাতে বড় সন্দেহ হইল। সুকুমারী কি তবে পীড়িতা, তাহার মাতার কি তবে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? ভাবিয়া মন বড় চঞ্চল হইল। স্থির করিলাম, কাল প্রাতে নৌকা করিয়া রওনা হইব।

মাকে এই কথা বলিব ভাবিলাম। কিন্তু আমি বলিবার পূর্ব্বেই তিনি সেই দিন সন্ধ্যাবেলা আমায় বলিলেন—"বাবা! বৌমাকে বারবেলায় পাঠাইয়া মনটা বড় খারাপ হইয়াছে। তুমি একবার গিয়া দেখিয়া আইস।

মা বলিবার পূর্ব্বেই আমি মনঃ স্থির করিয়াছিলাম, আর দ্বিতীয় অনুরো

ধের অপেক্ষা করিলাম না। একেবারে গাড়ি ঠিক্ করিয়া আহারান্তে যাত্রা করিলাম। গাড়ি যেখানে থামিল, সে স্থানের নাম কুসুমপুর। কুসুমপুরের পাশ দিয়া ভাগিরথী প্রবাহিতা। ঘাটে একখানিও নৌকা নাই। নিকটে এক মুদীর দোকান ছিল—সেই খানে বিশ্রাম-লাভেচ্ছায় অগ্রসর হইলাম।

(৩)

আমাকে দেখিয়া মুদী ভক্তিভরে একটী প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল"—আপনারা" ?

অমি বলিলাম—"আমরা কায়স্থ"।

"কোথা হইতে আসা হইতেছে—"?

"কলিকাতা"।

"যাওয়া হইবে কতদূর ? আজ কি এ দোকানে থাকিবেন ?"

"না—আজই আমায় যাইতে হইবে। আমি—রামচন্দ্রনগরের রায় বাবুদের বাটীতে যাইব।"

মুদী—একটী মোড়া আনিয়া আমায় বসিতে দিল। তখন সূর্য্যদেব পাটে বসিতেছেন। পশ্চিম গগন আরক্তিম কিরণ ছটায় স্নান করিয়া—লাল ধূমল, কপিশ, হেমাভ মেঘ মালায় রঞ্জিত হইয়া সন্ধ্যার মঙ্গল আরতির জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পাখীরা কিচির মিচির করিয়া সুদূর সুন্দর আকাশ প্রান্তে সেই হরিদ্রাভ হেমকান্তি মেঘের নীচে দিয়া প্রফুল্লমনে নীড়ের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল ; সন্ধ্যার শীতল বায়ু কলনাদিনী ভাগীরথীর শীকর সম্পৃক্ত হইয়া বনের আশে পাশে দুই একটী কুন্দ কলিকাকে ফুটাইতেছিল। গ্রাম্য স্ত্রীলোকরা কলস-কক্ষে গামছা কাঁধে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে নামিতেছিল—তাহাদের স্থির সলজ্জ ভাব দেখিয়া বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন তরঙ্গরাজি—চঞ্চল, উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত গতিতে সেই সান্ধ্য ছায়া-চুম্বিত উপলমণ্ডিত বেলা-ভূমিতে দ্রুতবেগে প্রহত হইতেছিল। মুদী একটী হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া একটী নল লাগাইয়া আমার হাতে দিল—আমি ধূম পান করিতে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আজ কি নৌকা পাওয়া যাইবে ? যদি না যায়, তবে কাছে যদি কোন ঘাট মাজির বাড়ী থাকে, তাকে ডাকিয়া পাঠাও। আমি দ্বিগুণ দাম দিব।"

মুদী "পঞ্চারে!" বলিয়া দীর্ঘ হাঁক ছাড়িল। হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কানে ছোট সোণার মাকড়ি, মালকোঁচা কষিয়া কাপড়-পড়া এক দশ বৎসরের বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। মুদী তাহাকে বলিল—"যা দেখি, স্বরূপ ঘরে আছে কি না। যদি থাকে একেবারে তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আস্‌বি। দেখিস্ যেন দেরি না হয়।"

(৪)

আমি বিবাহের পর দুই বার রামচন্দ্রনগরে গিয়াছি। চিরকাল বিদেশেই কাটিয়াছে। এখানকার পথ ঘাট, লোকজন কাজেই তত পরিচিত হয় নাই। মুদী অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই বল্‌লেন—রায় বাবুদের বাড়ী যাবেন। তাঁদের বাটীতে সম্প্রতি একটা বড় দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। আহা! শত্রুরও যেন অমন না হয়।"

কথাটায় আমার উৎকণ্ঠা বাড়িল—মনের ভিতর যেন কিসের একটা আঘাত লাগিল—আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে বল দেখি!"

"আর মশাই! যা হবার তা হয়েছে। ভগবান্ যে কার কপালে কি লিখেছেন, তা কে বলতে পারে! আহা! রায় মহাশয়রা অত দাতা দয়ালু মানুষ—ইহাদের এই সর্ব্বনাশ———"

আমি হুকাঁটা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম—"কি হয়েছে খুলেই বল না। অমন করে' বল্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌ব কেন?"

মুদী বলিল—"মশায় আপনি কি সে খপর শোনেন নি? আহা—হা!—"

আমার বড় বিরক্তি ধরিল—আমি বলিলাম "যদি জানিতেই পারিব, তবে আর তোমায় জিজ্ঞাসা করিব কেন?"

মুদী একবার কাশিয়া লইল—একবার কলিকাটা হাতে লইয়া—একটা টান দিল—তার পর—বলিল—"মশাইগো! আজ পাঁচ দিনের কথা! রায় বাবুদের বাড়ীর একটী মেয়ে—বোধ হয় কলকেতা থেকেই আস্‌ছিলেন—রাত্রি তখন এগারটা হবে—আহা হা—"

আমার বিরক্তি তখন নির্দ্দিষ্ট সীমা উলঙ্ঘন করিয়াছে। আমি বলিলাম—"বাবু! যদি তোমায় বলিতে হয়, একেবারে বলিয়া ফেল। নচেৎ—

মুদী একটু অপ্রস্তুত হইল—একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"বাবু গো!

সে দিন রাত্রি বড় একটা ঝড় উঠেছিল। খুব বৃষ্টি আর তার সঙ্গে সোঁ সোঁ ঝড়। সেই ঝড়ে আমাদের ঈশ্বর মাঝি নৌকা নিয়ে শওয়ারি পার করে। হায়! হায়! ঈশ্বর ও শওয়ারির কোন সন্ধান নাই। কাল ঈশ্বরের স্ত্রী, স্বামীর শোকে, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইল, কিসে যেন হৃৎপিণ্ডটাকে চাপিয়া ধরিতেছে। সুকুমারী তো পাঁচদিন আগে অবেলায় যাত্রা করিয়াছিল। তাহারও ঠিক ঐ সময়ে পৌঁছিবার কথা! তবে কি আমারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে? হা ভগবান! সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেমন মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে কি একটা বিকট তেজ তাহাকে জীবনী-শক্তিহীন করিতে থাকে, আমার ঠিক সেই রূপ দশা ঘটিল।

আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঈশ্বর যে মরিয়াছে তার প্রমাণ কি? আর সে যে ঐ সময়ে নৌকায় শওয়ারি লইয়াছিল সে কথা কি কেউ জানে?"

"আজ্ঞে! ঈশ্বরের পরিবারের মুখে শুনিয়াছি। রায় বাবুদের চাকরের সহিত তাহার আলাপ ছিল। সেই আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়।

আমি নিরাশায় আশ্বাস পাইলাম। সুকুমারীকে লইতে কোন চাকর বাকর আসে নাই। রায়েদের বহু পরিবার। অনেক জ্ঞাতি গোত্র—আর কেহও হইতে পারে। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—"ক'জন শোয়ারির কথা সে চাকর বলিয়াছিল, সে কথা কিছু শুনিয়াছ?"

মুদী বলিল—"সে দিন পুলিসের সুমুখে মাগী জবানবন্দী দিয়াছে, তাই আমরা জানি। চাকর ছাড়া শোয়ারি দু' জন। ডবল ভাড়া পেয়ে ঈশ্বর সেই দুর্যোগে নৌকা ছাড়ে। তখন ঝড় উঠে নি। খালি মেঘ করেছিল।"

আমি। আচ্ছা পুলিসে কি নৌকা ডুবির কোন সন্ধান কর্ত্তে পাল্লে না?

"না বাবু! লাস কোথায় বে ভেসে গেছে, কোন খবরই নেই। ঈশ্বর একটা পাকা মাজি। তার হাতে যখন নৌকা খালহয়েছে তখন সহজ ব্যাপার নয়।"

আমি স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; অথচ অনর্থক সন্দেহে অদ্ভুত আশঙ্কায়, প্রাণের ভিতর হু হু করিতে লাগিল। এমন সময়ে, সেই "পঞ্চা" স্বরূপ মাঝিকে সঙ্গে করিয়া আনিল। স্বরূপ বলিল—"বাবু কি যাবেন? কত দূর যেতে হবে?"

মুদী বলিল—"রায় বাবুদের ঘাটে।"

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—"কোন কিছু সন্ধান পাওয়া যায় নাই ?"

কিসের সম্বন্ধে আমাদের কথা হইতেছে, স্বরূপ বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে দিনকার নৌকা ডুবির কথা হইতেছে বুঝি—আহা-হা—"

"আহা! হা!"তে আমার বড় বিরক্তি জন্মিয়াছিল। আমি স্বরূপকে বলিলাম—"বাপু! তুমি কিছু ঠিক খপর বলিতে পার?"

স্বরূপ বলিল—"বাবু! আজ একটা খপর পাইয়াছি। আমার বেহাইও মাঝিগিরি করে, সে আজ করিমপুরের বাঁকে একটা বাক্স কুড়াইয়া পাইয়াছে।"

আমি বলিলাম—"তোমায় এক মুদ্রা বক্‌শিশ্ দিব—বাক্স আমায় দেখাইতে পার?"

মাঝি বলিল—"কেন পারব না? আমার সঙ্গে আসুন।"

গ্রাম্য মাঠের পথ ধরিয়া প্রায় আধ পোয়া পথ অতিবাহিত করিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে পূর্ণ। আশা, নিরাশা, সন্দেহ, উৎকণ্ঠা, স্থির ও অনিশ্চিত যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আমার হৃদয়ে কোলাহল লাগাইয়াছে।

এক খানি পর্ণ কুটীরের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। স্বরূপের বেহাই একটী কর্দ্দমাক্ত বাক্স বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল। বাক্সের উপর আমার নিজ হাতের লেখা রহিয়াছে "সুকুমারী দাসী—১২৭৮ সাল।"

আমি সজোরে বাক্সটী উঠানের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। ধীরে ২ দাওয়ার খুটী আশ্রয় করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর উঠিবার শক্তি নাই—আমার ভিতর যেন বিদ্যুতাগ্নি জ্বলিতেছে। হৃদয়ের মধ্যে কে যেন আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত ধাতুদ্রব ঢালিয়া দিয়াছে। কণ্ঠের মধ্যে কে যেন জ্বলন্ত দীপ-শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন ক্রমশঃ লোপ হইয়া আসিতেছে। আর সেই সময়ের সুন্দর সান্ধ্যগগণ আমার পক্ষে, উল্কাপিণ্ডময় ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি বহুকষ্টে ষ্টেসনে ফিরিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত।

১৪। পাইকপাড়ায় "শর্ম্মিষ্ঠা"।

(১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ, ৩রা সেপ্টেম্বর। ১২৬৭ সাল, ১৯ শে ভাদ্র, শনিবার)

"শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে (১২৬৫ সালে) মুদ্রিত হয়। ঐ বৎসরে ১৩ই ডিসেম্বরে, উহার রিহারস্যাল আরম্ভ হইয়া, পর বৎসর (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ, ৩রা সেপ্টেম্বর, বাং ১২৬৬, ৩রা ভাদ্র) প্রথম অভিনয় হয়। ঐ অব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বরে (১২৬৬ সাল, ২রা আশ্বিন, শনিবার) দ্বিতীয় বার অভিনীত হইয়াছিল।* এতদ্ভিন্ন ন্যূনাধিক সাত আট বার "শর্ম্মিষ্ঠার" অভিনয় চলিয়াছিল। এই সকল অভিনয় যখন হইতেছিল তখনই "বিধবা বিবাহ নাটক" অভিনীত হয়। তাহার বিশেষ বিবরণ পর বারে প্রমাণাদির সহিত লিপিবদ্ধ হইবে।

"রত্নাবলীর" অভিনয়ের সময় হইতে "বেল্‌গেছিয়া থিয়েটারের" সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎপরে এই "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকাভিনয়ের কালেও, কলিকাতার যাবতীয় গণ্য মান্য ব্যক্তি নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, ইহার গৌরব বাড়াইয়াছিলেন। তৎকালীন উৎসাহ, আনন্দ ও মহোৎসবের সীমা ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন, মূল পুস্তকের অভিনয়ে তাঁহারা যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতেন। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞ, সেই সাহেবদিগের জন্য কি করা উচিত, প্রবর্ত্তকদিগের মনোমধ্যে এই প্রশ্ন সমুদিত হইলে, তাঁহারা ইহাই সাব্যস্থ করিলেন যে, তাঁহাদিগের জন্য ইংরেজীতে উহার ভাষান্তর করা হউক। তদনুসারে, স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঐ কার্য্যে

* শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীতে" ঘটনা ও তারিখ সম্বন্ধে বিস্তর ভ্রম ঘটিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত সাহায্য লওয়া গিয়াছে।

ব্রতী হয়েন! হালিডে, সার সিসিল বীডন, সার আসলি ইডেন, প্রভৃতি অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন সাহেবদিগের নিকটে মাইকেল এই সুন্দর অনুবাদের জন্য যশোভাজন হন। বাঙ্গালায় প্রথম অভিনয়ের পর, সাহেবদিগের আগ্রহে ও অনুরোধে. ইংরেজীতেও স্বতন্ত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেরূপ অভিনয়ও দুই তিন বার চলে। আর কেবল রাজবাটীস্থ স্ত্রী পরিজনগণের দর্শনার্থেও বিশেষরূপে এক স্বতন্ত্র অভিনয় হইয়াছিল। তাহাতে বাহিরের স্ত্রীলোকেরাও স্থান পান নাই। যাহা কেবল অভিনেতারাই বাহিরের লোক ছিলেন। "শর্ম্মিষ্ঠার" অভিনেতাদিগের বৃত্তান্ত বিবৃত করা অথবা থিয়েটারের সাজসজ্জা বর্ণনা করা নিরর্থক। কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তদানীন্তন জনগণের মধ্যে এই নাট্যাভিনয়, এক অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের,"সরস-কুসুম-দাম দীপাবলীতেজে প্রজ্বলিত-নাট্যশালা" দৃশ্য গুলি অতীব মনোহর। সেই কুসুম মানস শোভিত উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ সুরভি-সমন্বিত নাট্যশালা, দর্শকদিগের মানসে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। "শর্ম্মিষ্ঠার" প্রথম দৃশ্য—হিমালয় পর্ব্বত ও অমরাবতী যার পর নাই মনোমুগ্ধকর। দৃশ্যের পর দৃশ্যে, দর্শকদিগের মন বিভোর হইয়া যাইত। অভিনয়টী আদ্যন্ত যেমন একখানি মনোরম উপন্যাসের ন্যায় পরিসমাপ্ত হইত। তাৎকালিক কি ইংরেজী কি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র-সমূহ তাবৎ সংবাদপত্র গুলি সমবেত কণ্ঠে তারস্বরে ইহার মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। "বেলগেছিয়া নাট্যশালার" যশ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

আর অভিনয় পারিপাট্যের কথাই বা কি বলিব। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়"শর্ম্মিষ্ঠার"অংশ অভিনয় করিতেন। তাঁহার তান-লয়-শুদ্ধ সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে একটী সেতার থাকিত। যদিও তিনি এ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে জানিতেন না বা তাদৃশ শিক্ষালাভ করেন নাই কিন্তু দর্শকগণের পক্ষে তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। নেপথ্যে পরদার অন্তরালে অন্য এক জন গুণীলোক সেতার বাজাইতেন আর শর্ম্মিষ্ঠা-বেশী শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ভাবে সেতারের তারের উপর অঙ্গুলী চালনা করিতেন যে, দর্শকবৃন্দের মধ্যে

কেহই বুঝিতে পারিতেন না যে, তিনি সেতার-বাদনে অনভিজ্ঞ। কলকণ্ঠের মধুর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সেতারের মধুর ঝঙ্কার ও তারে তারে, সুরে সুরে মিলান সুশিক্ষার পরিচায়ক শর্ম্মিষ্ঠার সেই নাম মাত্র অঙ্গুলি চালনা দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন না যে, শর্ম্মিষ্ঠা-বেশী কিরূপ কৌশলে, কিরূপ চতুরতার সহিত, নিজ অজ্ঞতা গোপন করিয়া, দর্শকবৃন্দের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছেন। বাস্তবিক সেরূপ ভাবে সুরের পরদায় পরদায় অঙ্গুলী চালনা করা, বোধ হয় তাঁহাকে অনেক দিন অভ্যাস করিতে হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, অন্যান্য ভদ্র সন্তানের ন্যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তও এই অভিনয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয় দর্শন করিয়া তিনি কতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশেই প্রকাশিত হইয়াছে।

"As for my own feelings they are things to dream of, not to tell."

অর্থাৎ "আমার নিজের মনোভাব যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা যেন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, বর্ণনীয় নহে"।

"বেলগেছিয়া নাট্যশালা" কেবল দুইখানি মাত্র নাটকের অভিনয়ে যে চিরস্থায়িনী অক্ষয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা রঙ্গভূমির জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে এবং জ্বলন্ত অক্ষরে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

PAIKPARA,

24th March, 1859.

MY DEAR GOUR DAS,

* * * For the present I shall speak of Sarmista—the production of your friend Michael, M. S. Dutt Esq. You know all about it and that it is going to be acted on the boards of our Belgatchea Villa. I shall first of all give you the names of the Dramatis personae, and as I am going to send you the book through to-day's post, you will be able to know more from it than what one, placed at such a distance from the seat of action, can possibly know.

You will see from what I am going to show you, some new faces in our corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter, is our Heroine. He or she as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and, to crown all, he is daily shewing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed for histrionic representations. Now—

FOR THE DRAMATIS PERSONÆ.

King Yayati	...	...	Preonath Dutt
Madhabhya	...	Bidusak	Keshub Ch. Ganguly.
Montry	..	Minister	Nobin Ch. Mukerjee
Sukracharjya	..	Rishi	Denonath Gosh
Kopil	...	His disciple	Sarat Ch. Ghosh
Bakasur	...	General	Issur Chandra Sing
Daitya	...	An officer	Tara Chand Guho
1st citizin	...	Haris Ch. Mookerjee	The 1st Nobin's brother, Romanath's brother Durluv.
2nd do	...	Russick Lal Law	
3rd do	...	Brojo Dullal Dutt	

Courtiers ... Jotindro Mohan Tagore, Preonath Sett and Rajendra Lal Mitter.

Chopdars ... Dwarkanath Mullick and Mohesh Chandra Chundra.

Durwan ... Jadunath Ghosh (my brother-in-law)

Debjani ... Hem Chandra Mookerjee (our Shagrika.)

Sarmista ... Kristodhon Banerjee (a new comer)

Purnika ... Kali Das Sandel (formerly our dancing girl)

Danika ... Aghor Chandra Dhagria (do our Susangatha)

Noti ... Chuni Lal Bose (as before)
Maid-servant ... Kali prosanna Mookerjee.
Dancing girls ... (The same as before plus) Bunkim Chandra Mukerjee.

Here you have as complete a list of the characters as I could give you, and I belive none can give you better the names of the characters than the Manager of the Theatre. Now as to the other particulars, the rehearsals are going on twice a week, on Sundays and Thursdays respectivly. Almost every body is prepared, and we can get up the play at ten days' notice, but our Rajah's father is unfortunately dead and that will delay us. My brother moreover is now at Kandi. He is gone there a second time this year, but he is likely to return soon, and we expect to appear, before the public in all spirit. No less than eight scenes have to be newly painted, most of them are already finished, and beautiful and magnificient they are without doubt.

I have not spoken anything about the drama, and I shall not do it. No one knows what effect such a thing as the '*Sarmista*' *will have on the stage. It is still a matter of* doubt whether it will be as popular as Ratnabali—I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism. * * *

With my sincere and hearty good wishes to yourself.

I remain yours ever sincerly,
Issur Chandra Sing.

প্রণয়াস্পদ গৌরদাস,

* * * * * * এক্ষণে তোমার বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত-বিরচিত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের বিষয় বলিব। তুমি এ সম্বন্ধে সমস্তই জান যে ইহা আমাদের "বেলগাছিয়া" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে। প্রথমত আমি তোমাকে নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তি-গণের নাম বলিতেছি এবং ডাকযোগে তোমার নিকট এক খণ্ড পুস্তক

পাঠাইতেছি; যথার্থ ঘটনাস্থল হইতে এত দূরে থাকিয়া আমি যাহা বর্ণনা করিব তাহা অপেক্ষা পুস্তক পাঠে তুমি এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে পারিবে। আমি তোমাকে যাহা দেখাইতেছি তাহাতে তুমি জানিতে পারিবে যে আমাদের দলে গুটি কয়েক নূতন লোক আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাও এত সামান্য যে তুমি সকলকেই চেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের নায়িকা এই শেষোক্ত দলভুক্ত। পুরুষ বা স্ত্রী যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলিতে পার কিন্তু তাঁহাকে পাইয়া আমাদের দলের বিশেষ উপকার হইয়াছে। তাঁহার বামকণ্ঠের উপর এমন সুমধুর স্বর যে, এপর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টে সেরূপ স্বর শ্রবণ করা ঘটিয়া উঠিয়াছে কি না বলিতে পারি না এবং তাহার উপর আবার তিনি এরূপ আভিনয়িক শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন যে আমাদের সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র অভিনয়োপযোগী ক্ষমতা এখনও তাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় নাই। এখন—

(নাটকীয় পাত্র)		(পরিচয়)		(অভিনেতার নাম)
যযাতি	...	রাজা	...	শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত। (১)
মাধব্য	...	বিদূষক	...	শ্রীকেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	...	রাজমন্ত্রী	...	শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শুক্রাচার্য্য	...	ঋষি	...	শ্রীদীননাথ ঘোষ।
কপিল	...	ঐ শিষ্য	...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।
বকাসুর	...	সেনাপতি	...	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (২)।
দৈত্য	...	কর্ম্মচারী	...	শ্রীতারাচাঁদ গুহ (৩)।

পত্রে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন, অভিনয় কালে, যে যে অভিনেতার অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল,

(১) প্রিয় নাথ বাবুর মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, রাজা যযাতির অংশ অভিনয় করেন। তিনি "জজপণ্ডিত" ছিলেন।

(২) রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবু তারাচরণ গুহ এ অংশ অভিনয় করেন। (ধনী বাবু শিবু গুহের কনিষ্ঠ পুত্র)

(৩) বাবু তারাচরণ গুহ মহাশয়কে সেনাপতি বকাসুরের অংশ অভিনয় করিতে হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দৈত্যের অংশ বাবু নৃত্য লাল দে (ডাক্তার কানাই লাল দের পিতৃব্য) গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নগরবাসী (১ম) …শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নবীনের ভ্রাতা)
ঐ (২য়) …শ্রীরসিকলাল লাহা
ঐ (৩য়) …শ্রীব্রজদুর্লভ দত্ত (রমানাথের ভ্রাতা)
পারিষদবর্গ ……শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীপ্রিয়নাথ শেঠ ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র
চোপদার ……শ্রীদ্বারিকানাথ মল্লিক (৪), এবং শ্রীমহেশচন্দ্র চন্দ্র
দ্বারবান্ … …শ্রীযদুনাথ ঘোষ (আমার শ্যালক)
দেবযানী ……শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রত্নাবলীতে ইনি সাগরিকা)
শর্ম্মিষ্ঠা ……শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি নূতন আসিয়াছেন)
পূর্ণিকা … …শ্রীকালিদাস সান্যাল (ইনি পূর্ব্বে নৃত্য করিতেন)
দেবিকা … …শ্রীঅঘোরচন্দ্র দাঘরিয়া
নটী … …শ্রীচূণীলাল বসু (পূর্ব্বের ন্যায়)
পরিচারিকা … …শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
নর্ত্তকী … …পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এবং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫)

আমার যত দূর সাধ্য অভিনেতৃগণের তালিকা দিলাম। রঙ্গালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ ব্যতীত বোধ হয় অপর কেহই ইহা হইতে উৎকৃষ্ট তালিক দিতে পারিবেন না। এইবার অপরাপর বিষয় বলিতেছি। রবিবার এবং বুধবার সপ্তাহের মধ্যে এই দুই দিন ক্রমান্বয়ে আখড়াই হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেকেই প্রস্তুত রহিয়াছেন। দশ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দিলে আমরা অভিনয় সম্পন্ন করিয়া দিতে পারি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের রাজার পিতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদিগের কিছু বিলম্ব হইবে।

---

(৪) বাবু দ্বারিকানাথ মল্লিক মহাশয়ের পরিবর্ত্তে বাবু কৃষ্ণগোপাল ঘোষ (রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ভগিনীপতি) চোপদারের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫) বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অন্য আর এক জনের পরিবর্ত্তে, বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুই নর্ত্তকী সাজিয়াছিলেন।

☞ এতদ্ব্যতীত এই নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের তালিকায় নটের কথার উল্লেখ নাই। বাবু ব্রজদুর্লভ দত্ত নট সাজিয়াছিলেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চেড়ী হইয়াছিলেন।

অধিকন্তু আমার ভ্রাতা এক্ষণে কান্দীতে রহিয়াছেন। তিনি এই দ্বিতীয় বার কান্দী গিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, আমরা সাধারণের সমক্ষে অভিনয় করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি। অন্যূন আটটি দৃশ্যপট নূতন করিয়া রঙ্ করিতে হইবে; তন্মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি নিশ্চয়ই সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছে।

আমি নাটক-সম্বন্ধে কিছু বলি নাই এবং বলিবও না। "শর্ম্মিষ্ঠার" মত বস্তু, রঙ্গমঞ্চে কি ফল উৎপাদান করিবে, তাহা কেহ জানেন নাই। কিন্তু ইহা রত্নাবলীর ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে কিনা সে সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণ্যে সমালোচন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এতৎ-সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশরিক ব না। * * *

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ, ২৪শে মার্চ। (৬) তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। (৭)

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম সংস্করণে যে সমস্ত গান ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার স্থানে কতক গুলি নূতন গান বসইয়া দেওয়া হয়। এই গান গুলি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত। প্রথম সংস্করণে লিখিত ছিল,——

"শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে ইত্যগ্রে যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল, তাহা সুরের সহিত সুসঙ্গত না হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে এই কয়েকটি নূতন গান প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইল।"

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুইটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হায় এই কি সেই সুখ-ফুলবন
যে বনে সার্থক মম জীবন যৌবন?
এই সরোবর-কূলে, এই অশোকের মূলে,
প্রিয় প্রাণপতি-সহ সতত মিলন!

(৬) ১২৬৫ সাল, ১১ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

(৭) এই পত্রে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন, অভিনয়-কালে যে যে অভিনেতার অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রত্যেক নামের পার্শ্বে চিহ্ন দিয়া টীকায় সন্নিবেশিত করিলাম। এ বিষয়ে সম্মান-ভাজন শ্রীযুক্তবাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

সেই তরু-লতা-চয়,　　কিছু ভাবান্তর নয়,
মম ভাগ্য ভাবান্তর হলো কি কারণ?
নহে বহু দিন গত,　　সোহাগ করিল কত
সে সব স্বপন মত জ্ঞান হয় এখন;
বসি এই শিলাতলে মম মান রক্ষা-ছলে
সুচারু কর কমলে ধরিল চরণ;
এখন সাধনা করি'　　স্মরি দিবা-বিভাবরী,
আর কি সে চন্দ্র মোরে দিবে দরশন॥"*

———(প্রথম সংস্করণ, ৪র্থ অঙ্ক, ৬৬ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় বারে উহা এইরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। যথা,—

এই তো সে কুসুম কানন গো
পাইয়াছিলাম যথা কুসুম-পুরুষ-রতন॥
সেই পূর্ণ শশধরে,　　সেই রূপ শোভা করে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে,　　মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার মনে কোথা সেই জন।
প্রাণনাথে নাহি হেরি　　নয়নে বরষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন। ——(দ্বিতীয় সংস্করণ)

——০——

* ইহার সহিত কবিবর বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হতাশের আক্ষেপের" সাদৃশ্য দেখা যায়।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ।

উপক্রমণিকা।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমপারস্থ এক সমাজ স্থান। আমরা বহুদিন হইতে এই সমাজের পুরাবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিষয়টী গুরুতর—নিতান্তই শ্রমসাধ্য ও অর্থব্যয়সাপেক্ষ। সংস্কৃতে, ইংরেজিতে বা অন্য ভাষায় ইহার কোন ইতিবৃত্ত পুস্তক নাই—সুতরাং অনুবাদের ভরসা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। ভাষান্তর করিয়া সিদ্ধমনোরথ হওয়ার আশা কোথায়?

এমন কোন বঙ্গীয় পদ্য গ্রন্থ বা সাময়িক পত্রিকা পাওয়া যাইতেছে না, যাহার উপরে নির্ভর করিতে পারা যায়। বরং আমাদের প্রবন্ধের উত্তেজনায় একখানি প্রাচীন পদ্যময় পুস্তকের মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ভূপতিচরণ ও অতুলচন্দ্র গোস্বামি-দ্বয়, বহুপরে আমাদেরই উত্তেজনায় "অভিরামলীলামৃত" মুদ্রিত করিয়াছেন।

কোন ক্ষোদিত লিপি, তাম্রশাসন বা অপর প্রকার প্রামাণিক বৃত্তান্ত-জ্ঞাপক নিদর্শন পাইবার উপায় নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্ণেয় মতে বহু ক্লেশেও উপনীত হইতে পারি।

এই ইতিহাস—বহুকাল ব্যাপক, বহু বিস্তৃত। ইহার কোন কোন অংশ "নবযুগ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় "ভ্রমণবৃত্তান্ত" শীর্ষকে (১),

---

(১) উক্ত পত্রিকার যে যে সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই,—

(ক) নবযুগ,—১২[illegible] সাল, ২২শে ফাল্গুন।
(খ) " " ২৯শে "।
(গ) " " ১৩ই চৈত্র।
(ঘ) " ১২৯৮ সাল ৪ঠা বৈশাখ।
(ঙ) " " ১১ই "।
(চ) " " ২৫শে "।
(ছ) " " ১লা জ্যৈষ্ঠ।

"উগ্রক্ষত্রিয়" নামক মাসিক পত্রে "পল্লীসমাজ" নামে প্রস্তাবে (২), মৎসম্পাদিত মাসিক পত্র "পুরোহিতে" "সামাজিক ইতিহাস" শিরোনামে (৩) প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎসমস্তই অসম্পূর্ণ ও অধারাবাহিক। এই কারণে প্রথম হইতে সূচনা করিয়া "অনুশীলনে" উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা গেল।

বঙ্গে নবদ্বীপ সমাজের যাদৃশ প্রাধান্য, থানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রাধান্যও প্রায় তদ্রূপ। উহার প্রভুত্ব, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদূন। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, গৌরবে—যে দিক্ দিয়াই তুলনা করা যাউক না, এই সমাজ, নবদ্বীপের ভ্রাতৃস্থানীয় হইবে। তবে প্রভেদ এই যে, ইহা নবদ্বীপের বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদর নয়;—সমবয়স্ক বা অগ্রজ বৈমাত্রের ভ্রাতাও নয়—কিন্তু কনিষ্ঠ সোদর ভ্রাতা। উভয় ভ্রাতার উপমা করিয়া থানাকুল—কৃষ্ণনগর-সমাজের বিমল যশোগৌরব সর্ব্বসাধারণের বিদিত করার নিমিত্ত আমাদের এই সন্দর্ভের অবতারণা। নবদ্বীপ ও থানাকুলের তুলনা করিবার পূর্ব্বে স্মৃতি-

---

"নবযুগ" নামে তিনটী বস্তু ছিল। একখানি পুস্তক, একখানি সাপ্তাহিক পত্র ও একখানি মাসিক পত্র। পুস্তক খানি ১২৯৩ সালে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত রাজনৈতিক নাট্যরাসক।

"নবযুগ" নামক মাসিক পত্র বাবু বিধুভূষণ মিত্রের সম্পাদকতায় পরিচালিত হইত। ইহা সাপ্তাহিক "নবযুগের" উত্তরকালবর্ত্তী। সুতরাং উহারা পরস্পর পৃথক্ পদার্থ. তাহা পাঠকের প্রীতি জন্মিল। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা বলা আবশ্যক। "নবযুগে" ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রচারের সময় হইতেই উক্ত পত্রিকার সুরুচির সূত্রপাত। তৎপূর্ব্বে উহা কলহপূর্ণ পত্রিকা ছিল।

(২) ইহার তালিকা এই,—

(জ) উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি, ১৩০০ সাল, আষাঢ়

(ঝ) " " " শ্রাবণ।

(৩) নিম্নে পুরোহিতের তালিকা প্রদত্ত হইল।

(ঞ) পুরোহিত, ১৩০০ সাল, চৈত্র।

(ট) " ১৩০১ সাল, বৈশাখ।

(ঠ) " " জ্যৈষ্ঠ।

(ড) " " আষাঢ়

শাস্ত্রের ক্রমোন্নিতির ইতিবৃত্ত আলোচিত হওয়া আবশ্যক বোধে অগ্রেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

(ক) বৈদিক কালের স্মৃতিশাস্ত্রই প্রাচীনতম স্মৃতিগ্রন্থ। "গৃহ্যসূত্র"-গুলিকে বৈদিক সময়ের স্মৃতি-জাতীয় মনে করা যাইতে পারে।

(খ) তৎপরবর্ত্তী কালে যে বিংশতি খানি স্মৃতি গ্রন্থের সমাদর ছিল, তাহা এই—

"মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরা,
যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী।
পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গৌতমৌ,
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥"

অর্থাৎ স্মৃতি ২০ কুড়ি খানি। ২০ কুড়ি খানি স্মৃতিসংহিতার তালিকা এই,—

১। মনুসংহিতা
২। অত্রিসংহিতা
৩। বিষ্ণুসংহিতা
৪। হারীত সংহিতা
৫। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা
৬। উশনঃ সংহিতা
৭। অঙ্গিরঃ সংহিতা
৮। যম সংহিতা
৯। আপস্তম্ব সংহিতা
১০। সংবর্ত্ত সংহিতা
১১। কাত্যায়ন সংহিতা
১২। বৃহস্পতি সংহিতা
১৩। পরাশরসংহিতা
১৪। ব্যাসসংহিতা
১৫। শঙ্খ সংহিতা
১৬। লিখিত সংহিতা
১৭। দক্ষ সংহিতা
১৮। গৌতম সংহিতা
১৯। শাতাতপ সংহিতা
২০। বশিষ্ঠ সংহিতা

(গ) তৎপরে সংগ্রহ গ্রন্থের প্রাদুর্ভাব কাল। তৎকালের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের কথা পশ্চাৎ লিখিত হইল।

গ্রন্থের নাম।	সঙ্কলয়িতার নাম।	গ্রন্থের নাম।	সঙ্কলয়িতার নাম
১। প্রায়শ্চিত্তবিবেক	শূলপাণি	৫। দত্তকমীমাংসা	নন্দ পণ্ডিত
২। শ্রাদ্ধবিবেক	ঐ	৬। কালমাধব	মাধবাচার্য্য
৩। দায়ভাগ	জীমূতবাহন	৭। ব্যবহার মাধব	ঐ
৪। দত্তকচন্দ্রিকা	কুবের	৮। আচার মাধব	ঐ
		৯। নির্ণয়সিন্ধু	কমলাকর

এইবার নবদ্বীপ ও থানাকুল-কৃষ্ণনগরের তুলনা করিয়া দেখিবার অবসর হইয়াছে।

নবদ্বীপ।	থানাকুল-কৃষ্ণনগর।
(ক) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, তাঁহার পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের স্মৃতি শাস্ত্রের সাধারণতঃ সার সংগ্রহ করিয়া, কোথাও কোথাও বা স্বাধীন মত চালাইয়া স্মার্ত্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে জন্য নবদ্বীপ প্রসিদ্ধ। তদ্গ্রন্থের নাম "অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব"।	(ক) ঠাকুর নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় উক্ত "অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের' যেখানে অযৌক্তিকতা রহিয়াছে, তাহা খণ্ডিত করিয়া দিয়া স্বীয় স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে থানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ প্রখ্যাত হইয়াছে। তৎসঙ্কলিত গ্রন্থ "স্মৃতি সর্ব্বস্ব"বলিয়া অভিহিত।
(খ) নবদ্বীপ কেবল বৈষ্ণব-প্রধান স্থান নয়। এই স্থানেই কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাগীশ নামক তান্ত্রিকের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহার নিমিত্তও নবদ্বীপ অল্প বিখ্যাত নয়।	(খ) থানাকুল-কৃষ্ণনগর, শাক্ত-বৈষ্ণবের সাধারণ ভূমি। এখানে কিশোর আগমবাগীশ আবির্ভূত হন। থানাকুল সমাজ, তাঁহার নামেও প্রসিদ্ধ।
(গ) রঘুনাথ শিরোমণি, এই নবদ্বীপের অধিবাসী। তাঁহাকে কাণাভট্ট বলিয়াই লোকে জানে। তিনিই নব্য ন্যায়-শাস্ত্রের প্রচারে নবদ্বীপের গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন।	(গ) কণাদ তর্কবাগীশ, থানাকুল-কৃষ্ণনগর-নিবাসী ছিলেন। তিনি কণাদ ভটাচার্য্য আখ্যায় সমধিক পরিজ্ঞাত। তিনি দর্শনগ্রন্থের ভাষ্য, টীকা ও টীপ্পনি করিয়া থানাকুল-কৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।
(ঘ) শ্রীচৈতন্য দেব, নবদ্বীপাধিবাসী ছিলেন। তিনিই বঙ্গে বৈষ্ণবমত প্রচারের উদ্যোগী। তৎ-প্রচারিত বৈষ্ণব তন্ত্রে নবদ্বীপ, গৌরবান্বিত। নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়া বৈষ্ণবগণের দর্শনীয় স্থান।	(ঘ) অভিরাম গোপাল, থানাকুল-কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। তিনি চৈতন্য দেবের প্রধান সহচর। তিনি দ্বাদশ গোপালের প্রথম গোপাল ও প্রধান গোপাল। বৈষ্ণবেরা তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া থানাকুল-কৃষ্ণনগরে আগমন করিয়া থাকেন।

অভিরাম গোস্বামী যে দ্বাদশ গোপালের একতম—কেবল একতম কেন তিনি যে গোপালগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ—পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইতেছে।

দ্বাদশ গোপালের দ্বাদশ শ্রীপাঠ।

সংখ্যা	দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণলীলাতে	কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাতে	শ্রীপাঠ	জেলা
১	শ্রীদাম	অভিরাম গোস্বামী	(খানাকুল) কৃষ্ণনগর	হুগলী
২	সুদাম	সুন্দরানন্দ ঠাকুর	হলদা মহেশপুর	নদীয়া
৩	বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	শীতল গ্রাম	বৰ্দ্ধমান
৪	সুবল	গৌরদাস পণ্ডিত	অম্বিকা কালনা	বৰ্দ্ধমান
৫	মহাবল	কমলাকর পিপ্‌লাই	মাহেশ	হুগলী
৬	সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত	সপ্তগ্রাম	হুগলী
৭	মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত	মসীপুর	....
৮	স্তোককৃষ্ণ	পুরুষোত্তম	সুখসাগর	নদীয়া
৯	অৰ্জ্জুন	পরমেশ্বর ঠাকুর	বিষখানা	বৰ্দ্ধমান
১০	লবঙ্গ	কানাই পণ্ডিত	লোধখানা	....
১১	মধুমঙ্গল	শ্রীধর পণ্ডিত	নবদ্বীপ	নদীয়া
১২	দাম	পুরুষোত্তম দত্ত	নাগদেশ	ঐ

এতৎ সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে এক খানি পত্র লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ন্যায় বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি বিরল। সুতরাং এতদ্বিষয়ে ইহার মত সর্ব্বথা গ্রাহ্য। এই পত্রের উত্তরে অন্যান্য বিষয় লিখিবার পর ইনি লিখিতেছেন,—

* * * * আমি শ্রীশ্রী দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর বংশের কুলাঙ্গার। ঠাকুর মহাশয় বিস্তর ভক্তিগ্রন্থ (যাহা কিছু) রাখিয়া গিয়াছেন আমি তাহার এক মাত্র মুটে। ভক্তি শাস্ত্রের যে কোন তর্ক উপস্থিত হউক না কেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ কর্তৃক মিমাংসা হইবার সম্ভব আছে। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশে দীপিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন, তাহা দেখা যায়,—

" শ্রীদামশ্চ সুদামশ্চ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
সুবাহুর্ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণঃ সুবাহুকঃ।
লবঙ্গশ্চ মহাবাহু গন্ধর্ব্ব্য বীরবাহুবেয়।

ঐ ১২ দ্বাদশ গোপাল, আর অপর দ্বাদশটী উপগোপাল যে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে জন্ম গ্রহণ করেন, শ্রীশ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বিস্তারিত প্রকাশ আছে। কিন্তু কোন কোন গোস্বামি-মতে ভিন্ন ভিন্ন নাম করা হইয়াছে * * * * *"

ভৃত্যাধিক

শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি।" (৪)

হারাধন বাবু স্বীয় পত্রে দ্বাদশ উপগোপালের উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে গোপাল এবং উপগোপাল দেখুন,—

(৪) বাবু হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বিগত বর্ষের (১৩০১ সালের) ৮ই আশ্বিনের পত্র।

দ্বাদশ গোপালের পরস্পর-বিরুদ্ধ তালিকা এই,—

সংখ্যা।	শ্রীকৃষ্ণ লীলায়	গৌরাঙ্গ লীলায়	শ্রীপাঠ।
১।	শ্রীদাম	অভিরাম গোস্বামী	কৃষ্ণনগর (খানাকুল)
২।	সুদাম	সুন্দরানন্দ ঠাকুর	মহেশপুর (নদীয়া জেলা)
৩।	সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত	সপ্তগ্রাম (হুগলি জেলা)
	ঐ	উদ্ধারণ ঠাকুর	ঐ "
	কোকিল	কমলাকর পিপ্‌লাই	আক্‌না মাহেশ
৪।	মহাবল	ঐ	মাহেশ (হুগলি জেলা)
৫।	ঐ	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	খাবড়া পাবড়া (বর্দ্ধমান জেলা) (৫)
৬।	বসুদাম	এ	শীতল গ্রাম
	ঐ	মাহেশ পণ্ডিত	পালপাড়া
	মহাবাহু	ঐ	মসীপুর
৭।	লবঙ্গ	কানাই পণ্ডিত	লোধখানা
৮।	কিঙ্কিণী দাস	পরমেশ্বর ঠাকুর	তড়া-আটপুর (হুগলি জেলা)
	অর্জ্জুন	ঐ	বিষখানা (কাটোয়ার নিকট)
	ঐ	কালিয়া কৃষ্ণ	বড়গাই
	স্তোক কৃষ্ণ	পুরুষোত্তম	সুখসাগর
৯।	ঐ	ঐ	বোধখানা
১০।	দাম	ঐ দত্ত	নাগর দেশ (মালদহ)
	ধনিষ্ঠা সখী	রাঘব পণ্ডিত	পানিহাটি
১১।	মধুমঙ্গল	শ্রীধর পণ্ডিত	নবদ্বীপ
	ঐ	মুকুন্দ দত্ত	আকাইহাটী
১২।	সুবল	গৌরদাস পণ্ডিত	অম্বিকা
	ঐ	গৌরীদাস পণ্ডিত	ঐ

(৫) মতান্তরে হাঁচড়া পাঁচড়া।

শ্রীপাঠে ও গোপালে যতই অনৈক্য থাকুক, অভিরাম গোস্বামীর নামে কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। আর, খানাকুল-কৃষ্ণনগরও যে তাঁহার লীলাভূমি ছিল, তদ্বিষয়েও কিছুমাত্র দ্বিধা থাকিতেছে না।

—০—

পুস্তক সমালোচনা।

"Mournful Lay" (মোরন্‌ফুল্‌ লে—বা শোক-গাথা) এক খানি ১৮ পৃষ্ঠার পুস্তক। ইহা ইংরাজী-পদ্যময়। ইহাতে ছয়টী ভিন্ন-শীর্ষক কবিতা আছে। পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত নাই। লেখক আরও দুই এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা আমাদের বিমাতা। সপত্নী-পুত্রের বিমাতা, যত দূর প্রিয় হওয়া সম্ভব, রচয়িতার তাহাই হইয়াছে। দুঃখিনী জননীর সেবা না করিয়া পুত্র, বিমাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

যতই কেন তিনি উৎকৃষ্ট ইংরাজী লিখুন না, উক্ত ভাষায় যতই পারদর্শী হউন না—তিনি ইংরাজী কবিগণের মধ্যে কখন স্থান পাইবেন না। স্থান পাইবার উপযুক্ত হইলেও কোন ইংরাজ তাঁহাকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। জেতা ইংরেজ, বিজিত বিদেশীয় বাঙ্গালীকে কেন আদর করিবে? আমরা ইচ্ছা করি, গ্রন্থকার জাতি-ভাষার উপাসনা করেন। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতিও এক সময়ে ইংরাজীতে রচনা করিবার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা তাহাতে উপযুক্তও হইয়াছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন হইতে জাতিভাষার উন্নতি-কল্পে বদ্ধপরিকর হন। আশা করি, এই নবীন কবিরও তদ্রূপ মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইবে।

ইংরাজী বৈদেশিক ভাষা। তথাপি আমাদের কবি দুই এক স্থলে মনোভাব বেশ প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতীয়ের পক্ষে বিজাতীয় ভাষায় বর্ণন করা দুরূহ—কিন্তু কবি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি বুড়ো ঠাকুর দাদার কেমন মনোহর বর্ণনা করিয়াছেন,—

"The thoughtful aged man with cares worn-out
While brooding sits upon his wooden plat,
And leans his back on one against the wall
With hands upon the head and one leg kept
To rest on another, himself half sat
And half laid-down—has fallen far asleep.
As oft, still females would around him come
And call aloud to bring him to himself
When he with shaking of his head, from depth
Of sleep aroused, would shily let them know
A flat denial, that he slept at all,
And would thus make their sides with laughter split."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

বৃদ্ধ নানারূপ সাংসারিক ভাবনা-চিন্তায় জর্জ্জরীভূত হইয়া দেয়াল-সংলগ্ন পিড়েতে ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন। বুড়ো হাত দুটী দিয়া মাথা ধরিয়া আছেন এবং এক পায়ের উপর আর এক পা রাখিয়াছেন। এইরূপ অর্দ্ধোপবিষ্ট অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিতে না থাকিতেই বৃদ্ধের নেত্র নিদ্রাভরে নিমীলিত হইল। তখন বাটীর নাতনী সম্পর্কীয়েরা তাঁহার কাছে আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধ কিছু অপ্রতিভ হইয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলেন, আরে আমি ঘুমাই নাই—কেবল চক্ষু বুজিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া বালিকারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।"

বস্তুতঃ ঠাকুর দাদারা প্রায় এই ভাবেরই বটেন। স্থানাভাব-বশতঃ অনেক কথা বলা হইল না। কবি, শ্মশান বর্ণনা বেশ করিয়াছেন। বিষয়টী পুরাতন হইলেও, ইংরাজীতে বেশ সুন্দর হইয়াছে,—

For man what cliss is left,

Alas what man is happy in this world ?

ভাবার্থ এইরূপ—মনুষ্য-জীবনে মঙ্গল কোথায়? কোন্ মনুষ্যই বা জগতে সুখী? এই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বে কবি, বিরক্ত হইয়া "শান্তিনগরী" খুঁজিতেছেন।

অভিনয়-সমালোচনা।

এমারেল্ড থিয়েটার।

বসন্তরায় ও আবুহোসেন।

অনুশীলন ও পুরোহিতের অধিকাংশ পাঠকগণের ইচ্ছা, আমরা যেমন রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইতেছি, অভিনীত পুস্তক সমুদয়ও আমরা ক্রমে ক্রমে সমালোচিত করিতে থাকি। কেননা, তাহা হইলে ইহা সাহত্যে স্থায়ী হইবে। অবসর মত তৎকার্য্যের অনুশীলন হইবে।

এমারেল্ডে "রাজা বসন্ত রায়" ও "আবু হোসেন" বহু বার অভিনীত হইয়াছে। এখানে "রাজা বসন্ত রায়ের" অভিনয় বরাবর উত্তমই হইয়া থাকে। বসন্ত রায়, উদয় সিংহ, সুরমা, বিভা ইত্যাদি প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অংশ সুচারুরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। বসন্ত রায়ের অভিনয় সর্ব্বোত্তম। তাঁহার অভিনয়-কৌশল যেমন মনোহর, তাঁহার তেমনই পরিপাটী সুর-শক্তি। বসন্ত রায় সাজিয়াছিলেন বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ *। বহু পূর্ব্বের অভিনেতা বাবু রাধামাধব করের † অভিনয় যাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা তেমন ভাল লাগে না। একটী ঘটনাতেই তাহা ব্যক্ত হইবে। ঘটনা এই,—একবার প্রসিদ্ধ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পূর্ণচন্দ্র বাবুর কৃত "বসন্ত রায়ের" অভিনয় দেখিয়া স্বীয় সঙ্গী বন্ধুকে বলেন, "ও রঘু! এ যে জাল প্রতাপচাঁদ। আমি আসল প্রতাপ চাঁদকে দেখিতে আসিয়াছিলাম"। এই বলিয়া গাত্রোত্থান করেন।

আমরা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা রাধামাধব বাবুর বসন্তরায়ের অভিনয়-দর্শনে বঞ্চিত। সুতরাং আমরা ইহাঁর কৃত অভিনয় দেখিয়াই সুখ পাইয়াছি।

প্রতাপের বেশে বাবু মতিলাল সুর, দর্শকের সমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকেই পূর্ব্বে ঐ অংশ সমাধা করিতে দেখিয়াছেন, বর্ত্তমান

---

* থিয়েটার-মহলে তিনি পুনি ঘোষ বলিয়া পরিচিত।

† রাধামাধব বাবু মাধুকর বলিয়া খ্যাত।

কোন অভিনয়ে মতিলাল বাবু তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ তুল্য তৃপ্ত করিতে পারেন নাই। অভিনয়-মত্ততা তেমন ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা দেহের কোন অসুস্থতা ছিল বলিয়াই বা হউক, তাঁহার কার্য্য অনুত্তম হইয়াছিল। তাঁহারই পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে এই উপমা করা গেল। উত্তম দেখিয়াছি, তাই অত্যুত্তম দেখিতে চাই—অন্ততঃ উত্তম তো প্রত্যাশা করিতে পারি।

"আবু হোসেনে" আবুর অংশ, স্বয়ং বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। মুস্তফি, স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়, প্রায় প্রতি রজনীতে দিতেছেন। "রোশেনারা" প্রভৃতির কর্ত্তৃক নিজ নিজ করণীয় কার্য্য অবলীলাক্রমে যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা যে দিন অভিনয় দেখি, সে দিনের কথা বলিয়াও বলিতে পারি, কোন কোন বিষয়ে "মিনার্ভা অপেক্ষা এমারেল্ডে" ভাল হইতেছে। যদিও "মিনার্ভার" শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুস্তফির নকল করিয়া থাকেন, কিন্তু আসলে ও নকলে কত প্রভেদ! তবে তিনি উত্তম নকল-নবিশ, এ কথা অনায়াসে স্বীকার্য্য। কিন্তু সম্প্রতি, মিনার্ভায় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গরসের উত্তম অভিনেতা জুটিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ক্ষমতা আছে।

"নন্দবিদায়"।

"অভিনয় ও পুস্তকের সমালোচনা"

"নন্দবিদায়" পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য। ইহা প্রধানতঃ করুণ ও বীররস-প্লুত হওয়াই কর্ত্তব্য। জগদাত্মা, কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়াংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারভূত—অধার্ম্মিকবৃন্দের শাসনের জন্য বসুদেব, দেবকী, রোহিণীকে, যথাক্রমে পিতৃত্বে ও মাতৃত্বে স্বীকার করেন। বসুদেব ও তাঁহার পত্নীদ্বয়—ইহাঁরা সকলেই পবিত্র-স্বভাব, এবং ভগবানের স্নেহ-পাত্র। সেই জন্যই গোলকপতি, ইহাঁদিগকে জনক-জননীরূপে স্বীকার করেন। বসুদেব-শ্যালক কংস, দৈবসূত্রে অবগত হন যে, তদীয় ভগ্নী দেবকীর গর্ভজাত

সন্তান দ্বারাই তাঁহার রাজ্য হানি ও প্রাণনাশ সংঘটিত হইবে। পাপকর্ম্মা, মমতাবিহীন হইয়া তাই বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। তাহার পিতা উগ্রসেনও তাহার কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করা অপরাধে কারান্ধকারে রক্ষিত হইয়াছিলেন। দুরাচার এইরূপে ধার্ম্মিক সমূহের উৎপীড়ন ও পাপের প্রশ্রয় দিয়া রাজ্য করিতে লাগিল।

ও দিকে কারাবাস-কালে, দেবকীর ক্রমান্বয়ে সাতটী কন্যা হইল। কিন্তু কংস এই কয়টী কন্যাকেই সূতিকাগার হইতে কাড়িয়া লইয়া হত্যা করিত। তাহার ভয়, পাছে এ কন্যারাও তাহার প্রাণনাশ-কারণ হয়। যথাকালে দেবকী পুনরায় গর্ভিণী হইলেন। কিন্তু মাতৃহৃদয়, পূর্ব্ব-প্রসূত সন্তানদের ভাগ্য ভাবিয়া একবারে আকুল হইয়া পড়িল। তাঁহার সদ্যোজাত শশধর-প্রতিম সন্তানগণ মুহূর্ত্তমাত্র জননীর গর্ভধারণ-ক্লেশ-সফলতা সম্পাদন করিয়াই দুষ্ট কংসের কবলে পতিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিবে। তিনি নানামতে পতি বসুদেবকে অনুরোধ করিলেন যে, "এবারকার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে লইয়া আপনি মথুরা হইতে পলাইয়া যান"। বসুদেব, প্রেয়সীর ব্যথায় অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলেও এরূপ আচরণের অসম্ভবতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, অসংখ্য প্রহরী সর্ব্বদাই দ্বারে সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; মক্ষিকা নির্গমনেরও উপায় নাই। আমি কি করিয়া কারামুক্ত হইতে পারি?

কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছা কে রোধ করিতে পারে? বসুদেব, দৈববাণী দ্বারা অবগত হইলেন, "পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেই তাহাকে লইয়া তিনি ব্রজপুরের গোপ নন্দ ঘোষের আলয়ে রাখিয়া আসিবেন ও সেই সময়ে নন্দ-পত্নী যশোমতীর যে কন্যা জন্মিবে, তাহাকেই আত্মজ-পরিবর্ত্তে মথুরায় আনয়ন করিবেন।" কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাত্মা বাসুদেব প্রসূত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দকন্যাকে মথুরায় লইয়া আসিলেন।

দুরাত্মা কংস দেবকীর পুনরায় এক কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়াই, তাহার বধার্থে সূতিকাগার হইতে বালিকাকে আনয়নের আজ্ঞা প্রদান করিল। যথাসময়ে নবজাতা, অপূর্ব্বজ্যোতিঃ এক কন্যা কংস-সমীপে নীত হইল। পাপমতি, দুই হস্তে কন্যার পদদ্বয় ধারণ করিয়া যেমন প্রস্তরোপরি আঘাত

করিবে, অমনই হস্তস্খলিত লইয়া কুমারী শূন্যমার্গে বিভাময়ী মহামায়া মূর্ত্তি ধারণ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ—বন্দ্য।

ষ্টার থিয়েটার।

অন্নদামঙ্গল ও একাকার।

"ষ্টার" দৃশ্যপটে ও নট-নৈপুণ্যে বিখ্যাত হইতেছে। অন্নদামঙ্গল-সম্বন্ধে বলিবার প্রায় কিছুই নাই। যে অন্নদামঙ্গলের গীতে রায়গুণাকর কবি ভারত চন্দ্র কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাহা শ্রবণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুলকিত হইতেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য।

'অন্নদামঙ্গল' বহু বার অভিনীত হইয়াছে। ইহাতে "মদনভস্ম" দৃশ্যটী বেশ চমৎকার হইয়াছিল। সঙ্গীতও আগাগোড়া নুতন ধরণের ও মনোহর। 'বিবাহ-বিভ্রাট' 'বাবু' প্রভৃতি প্রহসন প্রণেতা ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বাবু অমৃতলাল বসুজ মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত "একাকার" প্রহসন খানি সময়োপযোগী ও উপাদেয় হইয়াছে। এই নূতন প্রহসন লেখক অমৃতবাবুর তত্বাবধানে সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক "একাকারের" ইহার বিশিষ্ট অংশগুলি অভিনীত হইয়াছিল। গন্ধর্ব্বলোকের দৃশ্যপট অত্যন্ত চমৎকার।

অন্ততঃ দৃশ্যপটগুলি দেখিবার জন্যও একাকার দেখিতে পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি! দৃশ্যপট দেখিয়াও যে তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই। এতদর্থে কোম্পানিকে বহু অর্থব্যয় ও বহু-পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। দর্শকগণের চিত্তবিনোদনার্থে তাঁহারা সুতরাং কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিনয় করিতে অমৃত বাবু চেষ্টা ও আয়াস করিয়া থাকেন। একবার চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিতে যাইয়া যেন পাঠক, দৃশ্যপট দেখিয়া আসেন, এই অনুরোধ। চন্দ্রশেখর অভিনয়ে দুই এক খানি দৃশ্যপট দেখিলে পুলকিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ধান-ভানিতে শিবের গীত গাহিতে বসি নাই। এ প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর

সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে চন্দ্রশেখর, প্রবন্ধাকারে এই পত্রিকায় সমালোচিত হইয়াছে। আমি তাহার প্রায় প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির অনুমোদন করি। সুতরাং অধিক কিছু বলিবার নাই। ✓একাকারের প্রথমে প্রস্তাবনা—গন্ধর্ব্বলোকের দৃশ্য। প্রথম অঙ্কে চাকরীর লাঞ্ছনা, মধুবাবুর আপীষের কেরাণীগণের দুর্দ্দশা দেখিলেই সম্যক্‌ উপলব্ধি হয়। ভদ্রসন্তানগণ, মধুসূদন সাধুখাঁর ন্যায় প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকের অধীনে থাকিয়া যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হন—আজিকালি চাকরীর বাজারে প্রত্যহ যেরূপ হইতেছে, তাহাই বিশিষ্ট প্রমাণ। ইহা প্রত্যেক অঙ্কে সম্যক্‌ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কালা ফিরিঙ্গির সহিত বাঙ্গালীর যেরূপ ভাবে এক যাত্রায় পৃথক্‌ ফল হয়, তাহাও প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, এরূপে অভিনয় দেখিয়া যে বাঙ্গালীর চৈতন্য হইবে, গ্রন্থকর্ত্তার যদি এরূপ মনে থাকে, তবে তাহা ভুল। চিরপদানত চাকুরে বাঙ্গালী প্রত্যহ আপীষে বসিয়া হয় তো এরূপ অনেক অভিনয় দেখিতেছেন। গ্রন্থকার কি সেই অসাড় প্রাণে চৈতন্য জন্মাইতে পারিবেন? তবে আমাদের সমাজ-কলঙ্ক অকীর্ত্তিগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকা আবশ্যক। আমরা রামায়ণ-মহাভারতে প্রাচীন আর্য্যদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া যাই। আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণ আমাদেরও কীর্ত্তি পড়িয়া সভ্যতাভিমানী আমাদের সভ্যতার পরিচয় পাইয়া অধিকতর বিমোহিত হইবে।

কানফুঁড়ী মিস্ত্রী ও তাহার কেরাণী গদাধর দত্তের অভিনয় দেখিলে অনেক উমেদারের আক্কেল হইবে। তাহার পর, আঙটীর উপর হীরার ন্যায় উমেদার কেরাণীগণ ও ভটাচার্য্য মহাশয়—অন্য পক্ষে তাহার বিপরীত কানফুঁড়ি মিস্ত্রীর কারিকরগণ—মুচী ও মুচিনীগণ। ইহারা কিরূপ স্বাধীন ভাবে চাকরী করে! মধুসূদন সাধুখাঁর মত অনেক বড় পাকড়ীওয়ালা যেখানে বাবুজানের মত সাহেবের খানসামাকে (সাহেব তো মাথার মণি) মাথা নোয়াইয়া তুষ্ট করেন, সেই স্থলে মুচীগণ কাণফুঁড়ী মিস্ত্রীর ন্যায় মনিবকে ত্রিভুবন দেখায়। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যাদবচন্দ্র পাল ও রাধানাথ কর্ম্মকারের অবতারণা। রাধানাথের অভিনয় সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইলেও অনেক শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। অভিনয় কিছু সুদীর্ঘ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তত দূষ্য নহে।

যেহেতু সংক্ষেপে বলিতে গেলে হয়তো মর্ম্মস্পর্শী ও বোধগম্য হয় না ; বরং কাজের কথা বলিতে গেলে আরও কিছু সুদীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল। তবে কি না সুদীর্ঘ বক্তৃতাগুলি এলবার্ট হলে টৌন হলেই ভাল লাগে। সেখানে লোকে বক্তৃতা শুনিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। রঙ্গভূমিতে লোকে রঙ্গ দেখিতে যায়। সেখানে বসিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে গেলে কান ঝালাপালা হইয়া যায়। মধুসূদনের ভৃত্য সোনার অভিনীত অংশটুকু মন্দ নহে—বেশ প্রীতিপ্রদ। সোনাকে ন্যাকা হাবা সাজাইয়া রঙ্গচ্ছলে অনেক গুহ্য কথা বাহির হইয়াছে। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে পুলিসকোর্ট। পুলিষকোর্টে মধুসূদনরূপী হুজুরবর্গকে সাজাইয়া অনাহারী মাজিষ্টরের বিচার ক্ষমতা বেশ প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিকই যদি বিচারাসনে বসিয়া মধুসূদনরূপী বিচারকগণ যেরূপ বিচার বিনা বেতনে বিতরণ করেন, তাহাতে প্লীহা চমকাইয়া যায়। ভেলেই এই, আসলে না জানি আরও কত গলদ !

মধুসূদন নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। সাক্ষিগোপালরূপী আরও দুই জন হুজুর বসিয়া ত্রিমূর্ত্তি মিলিত হইয়া বিচার করিতেছেন। ইন্‌টার্‌প্রিটার (দ্বিভাষী) মহাশয়, আইনানুসারে কাজ করিতেছেন। কালী-ঘাটের পাঁটা-বলির ন্যায়—বিচার হইয়া যাইতেছে।

বেগারী হাকিমী করিতে যাইয়া ভদ্রসন্তানের মধুসূদন সাধুখাঁর পার্শ্বে বসিয়া বিচারাসন গরম করাও এক প্রকার লাঞ্ছনা-দায়ক অপমানজনক। মধুসূদনের আসামীরূপী শ্বশুরের প্রমুখাৎ মধুসূদনের জাতি জানিয়া নবাব সাহেব প্রভৃতি হাকিমগণেরও দৌড়।

মধুর স্ত্রী কাঙ্গালমণির কলুগিন্নী ও নীলাম্বরী ধোপা গিন্নীর মত সুমহৎ-প্রাতঃস্মরণীয় সদ্বংশে জন্ম। যাহাদের স্বামী শিক্ষিত, মোটা মাইনের চাকরে, তাঁহাদের যেরূপ আমীরীয়ানা চাল্ হইয়া থাকে, সেইরূপই হইয়াছে।

অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীগণের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও বেশ সুন্দর হইয়াছিল। স্থূল কথা, যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচন করিয়া অভিনয় হইয়াছে। কাঙ্গালমণির স্বামীর মুখের নিকট হাত মুখনাড়া গৃহস্থের বৌ-ঝির পক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও, প্রহসনে আবশ্যক। প্রহসনে 'কু' দেখানই আবশ্যক। দুঃশীলা মুখরা স্ত্রীলোকের নিন্দনীয় আচরণ, প্রহসনে

দেখানই আবশ্যক। সীতা-সাবিত্রীকে প্রহসনে দেখান আবশ্যক নয়। পরিশেষে বক্তব্য, একাকার হইয়া কিরূপ দুর্গতি হইতেছে, প্রহসনে দেখাইয়া ত্রুটি সংশোধন না হইলেও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের (বংশানুক্রমে) দুর্গতির অবগতির জন্য একটা চিত্র অঙ্কিত থাকাও অনাবশ্যক নহে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গ্যালারীর দর্শকগণের মধ্যে অনেক ভদ্রসন্তান প্রকাশ্যে বসিয়া অভিনেত্রীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেরূপ আকারেঙ্গিত ও কুৎসিত বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত লজ্জাকর, সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংসার।

(১)

বাঞ্ছিত লভিতে আসি,' লাঞ্ছিত হইতে হ'ল
ললাটে এতই ছিল শেষ।
না জেনে' সাপিনী'পরে অর্পিলাম হৃদি মোর
হেরিয়া মোহিনী-মধু-বেশ॥

(২)

কি গ্রহে পড়িয়া হায়! আগ্রহে আসিনু ছুটে
অগ্নি-কুণ্ডে পতঙ্গের মত।
চক্ষে জ্বলে দাবানল, বক্ষে বহি' হলাহল,
জ্ঞান গর্ব্ব বিদ্যাবুদ্ধি হত॥

(৩)

মুগ্ধ হ'য়ে রূপে তার, দগ্ধ হই অনিবার,
রুদ্ধ-প্রাণ উদ্বেল আকুল।
ছুটিতেছে প্রাণপণে ভয় বাধা নাহি মানে
সিন্ধু চায় গ্রাসিতে দু' কূল॥

(৪)

ক্ষুদ্র-আত্ম-সুখ-আশে, শত স্বর্গ পড়ে খ'সে,
শত পৃথ্বী লুটিছে চরণে।
লভিতে সে প্রেম-হাসি,ধরিতে সে রূপ-রাশি,
বরিতেছি অনন্ত মরণে॥

(৫)

কঙ্কাল হয়েছে সার, জঞ্জাল কেন রে আর,
কেন আর কেন এ পিপাসা ?
কেন শান্তি-হীন বুকে, কেন ভ্রান্তিময়-দুঃখে,
কেন এ প্রাণান্ত ভালবাসা॥

(৬)

কি শক্রতা-মহাচক্রে, হে মিত্র! হইলে পর
অন্ধকার করিলে আকাশ।
উন্মত্ত ঝটিকা-সম, ভ্রমিব কি চিরদিন,
গাহিয়া আপন সর্ব্বনাশ॥

(৭)

মর্ম্মাহত বুদ্ধি বল. কর্ম্মগত অশ্রুজল,
জলাঞ্জলি দিয়াছি বিফলে——
নাহিক সান্ত্বনা-লেশ, হয়েছে সাধের শেষ,
হান বজ্র, হান—এ বিফলে॥

(৮)

বিমুগ্ধ হইয়া প্রাণ, দগ্ধ হ'ল অবিরাম,
কবে স্নিগ্ধ হ'বে দয়াময়!
শুধুই কি জানিলাম, শুধুই কি বুঝিলাম,
এ-পথ, তোমার পথ নয় ?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

বংশাবলী।

ভারদ্বাজ গোত্র।

গত বারে আমরা যে দুইটী সঙ্কেত করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এখানে দুই এক কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে।

যেখানে দুই নামের মধ্যে লম্ব রেখা আছে তথায় পিতা-পুত্র সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। আর যথায়, উক্ত প্রকার স্থানে বিন্দু বিন্দু রহিয়াছে, তথায় তদ্বংশীয় বুঝিতে হইবে। ঐ বিন্দু বিন্দুর মধ্যে কত পুরুষের ব্যবধান, তাহার নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই।

তিথিমেধা হইতে আরম্ভ করিয়া ১, ২, ৩ ইত্যাদি রূপে যে অঙ্কপাত করিয়াছি, তাহাতে কে, কাহার কত পুরুষ অধস্তন, আর কেই কাহার কত পুরুষ ঊর্দ্ধতন, সুব্যক্ত ভাবে বোধগম্য হইবার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। কায়স্থগণের "পর্য্যায়" গণনা ঐ নিয়মে হইয়া থাকে।

মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য যে ভারদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। একটী শ্লোকে তাঁহার বংশ- পরিচয়ের সঙ্গে অপরাপর অনেক বৃত্তান্তই নিবদ্ধ রহিয়াছে,—

"শ্রীমতী জননী যস্য, সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা,
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ।
বোধায়নং যস্য সূত্রং, শাখা যস্য চ যাজুষী,
ভারদ্বাজং কুলং যস্য, সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥"

শ্রীমতী, মাধবাচার্য্যের মাতা। তাঁহার পিতার নাম মায়ণ। মায়ণ পবিত্রাত্মা পুরুষ ছিলেন। মাধবের ভ্রাতার নাম সায়ণ। মাধবাচার্য্যের অপর যে এক আখ্যা ছিল, ঐ শ্লোকেই তাহারও সংবাদ পাওয়া গেল। ভোগনাথ তাঁহার নামান্তর। মনের সহিত বুদ্ধির নিকট সম্বন্ধ। মন ও বুদ্ধি যেমন সোদর

ভ্রাতৃসদৃশ *, তাঁহাদের ভ্রাতৃ-যুগলেরও তাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁহারা দুইজনে সোদর ভ্রাতা। কে অগ্রজ, কেই বা অনুজ—তাহাতেও কেহ কেহ সন্দিগ্ধ। আমরা তাহাতে কোন সংশয় করি না। যেখানে যেখানে তাঁহাদের উভয় নামের প্রসঙ্গ, তথায়ই অগ্রে সায়ণের উল্লেখ, পশ্চাৎ মাধবের বা ভোগনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত কবিতাতে পাঠক এই কথার এক প্রমাণ পাইলেন। দ্বিতীয় প্রমাণ বেদভাষ্য। বেদভাষ্যে আছে—"সায়ণমাধবীয়ে"। এখানে দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকা সত্ত্বেও দুই জনের অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে হয় না।

বৌধায়নের গ্রন্থানুসারে ইহাঁদের বংশীয় ক্রিয়া-কলাপ নিষ্পাদিত হইত। ইনি যজুর্ব্বেদীয় দ্বিজ। মাধব, এত বড় সুধী ছিলেন যে, তাঁহার উপাধি "আচার্য্য" হইয়াছিল। যাঁহারা উক্ত উপাধিতে বিমণ্ডিত হইতেন, তাঁহারা মহামহোপাধ্যায়-শ্রেণীর বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক।

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

—মনুসংহিতা।

যিনি উপনয়ন সংস্কার করাইয়া শিষ্যকে কল্প ও রহস্যের সহিত বেদ অধ্যাপন করান, তাঁহাকে 'আচার্য্য' কহে।

কেবল "আচার্য্য" উপনামেই যে মাধবের গৌরবের মাত্রার চরম সীমা হইয়াছিল, তাহা নয়। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ছিলেন। "সর্ব্বজ্ঞ" বিশেষণেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। কেবল উক্ত বিশেষণেরই কথা বলি কেন? তাঁহার বিরচিত গ্রন্থের তালিকায় নেত্রপাত করিলেও, ঐ কথা সাব্যস্থ হয়। গ্রন্থগুলির সংখ্যা বিংশতি,—

* হিন্দুশাস্ত্রমতে চিত্ত ও মতি—সহোদর তুল্য অভেদ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহারা দুই ভিন্ন পদার্থ।

১। অধিকরণমালা
২। অধিকরণ মালার টীকা
৩। জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর
৪। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ
৫। অনুভূতিপ্রকাশ
৬। ব্রহ্মগীতা
৭। প্রবাধিকী
৮। পঞ্চদশী
৯। জীবন্মুক্তি-বিবেক
১০। মাধবীয় ধাতুবৃত্তি
১১। নিদানমাধব
১২। কালমাধব (জ্যোতিষ্)
১৩। কালমাধব (স্মৃতি)
১৪। পরাশরমাধব
১৫। আচারমাধব
১৬। ব্যবহারমাধব
১৭। শতপ্রশ্নকল্প-লতিকা
১৮। বিদ্যারণ্যকালজ্ঞান
১৯। শঙ্করদিগ্বিজয়
২০। বেদার্থপ্রকাশ

বিজ্ঞানেশ্বর।

ইনি পদ্মনাভ ভট্টের পুত্র। পদ্মনাভ ভট্ট, ভরদ্বাজ গোত্রে উৎপন্ন হন তৎপুত্রও সুতরাং ভরদ্বাজ গোত্রীয়। কল্যাণনগরে তাঁহার অধিবাস ছিল। পদ্মনাভ, নব্যস্মৃতির প্রতিষ্ঠাতা। আর্য্যাবর্ত্তে—বঙ্গদেশে--রঘুনন্দন যেমন নব্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠাতা, পদ্মনাভও, দাক্ষিণাত্যের তদ্রূপ কার্য্যের স্থাপয়িতা—উভয়েই সমধর্ম্মা। এই বিজ্ঞানেশ্বর, বিশ্বরূপের ছাত্র। বিশ্বরূপ-কৃত যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির এক টীকা আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। কেন না, বিজ্ঞানেশ্বরও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির অপর টীকাকার। তিনি যে সে টীকাকর্ত্তা নহেন,—এক জন প্রসিদ্ধ অথচ প্রধান টীকাকারক। সেই টীকার বিশ্বপরিচিত নাম—"মিতাক্ষরা"। মূল পুস্তক (অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি) অপেক্ষা উহার নাম, খ্যাতি ও সমাদর সমধিক গুরুতর। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

গান।

সুরট মল্লার—একতালা।

তারা! তুই মা ভরসা ভবে।
হাঁসি, কাঁদি, খেলি, সদা যাই ভুলি,
সকলি যে গো মা তোমারি প্রভাবে॥
মায়াজালে পড়ি কিছুই না দেখি,
অসময়ে অন্ধ হ'ল দুটি আঁখি,
তবু তোরে মাগো ভুলেও না ডাকি,
কি হবে গো শ্যামা ভবে!

লয়ে পঞ্চজনে সদা থাকি মত্ত,
ভুলেও না কভু ভাবি আত্মতত্ত্ব,
এ ছার সংসারে কিবে আছে সত্ত্ব,
খুঁজেও না পাই ভেবে॥

জ্ঞানহীন হয়ে র'য়েছি মা ঘর,
শূন্য বায়ুভরে, কাঁপে থর থর;
চারি দিকে ধু ধু করিছে প্রান্তর,
আমি যে একেলা ভবে॥

হারায়েছি এবে ছিল যত বল,
নাহি যে ভরসা পথের সম্বল,
দীনজনে তুমি সদয়া কেবল,
কোলে তুলে নে গো এবে॥

একে একে সব গিয়াছে মা ছেড়ে,
সুধু আমি মা গো হেথা আছি পড়ে,
ডেকে নে গো শ্যামা দীনে ত্বরা ক'রে,
পূরাও বাসনা শিবে॥

মাতৃহারা হ'য়ে রব কত কাল,
নিমেষ না যেতে আসিবে যে কাল,
ভাবিতে না দিবে ইহ-পরকাল,
তখনই যেতে যে হবে॥

জাগো গো মা শ্যামা দীনে করি দয়া,
ভুলাইও না আর ওগো মহামায়া,
ডাকে দেবরাজ, উঠ হর-জায়া,
তার গো অধম জীবে॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

চীনদেশের প্রাচীর।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন সময়েও মনুষ্য-সমাজে শিল্প-বিদ্যার, বিশেষতঃ স্থপতিবিদ্যার, প্রকৃষ্ট প্রচার ছিল। নরগণ, আবাস জন্য, দেশরক্ষার্থ ও দেবতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত, তৎকালেও গৃহ, প্রাচীর, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। সভ্যতার জন্মভূমি পূর্ব্বদিকস্থ মহাদেশ-সমূহে সেই কারণেই আমরা এখনও নানাবিধ বিস্ময়োদ্দীপক অট্টালিকাদি দেখিতে পাই। মিসরের পিরামীড, চীনের প্রাচীর, গ্রীসের মন্দির-সমূহ, উন্নত স্থপতি-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আধুনিক শিল্পোন্নতির সহিত উহাদের কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পুরাকালের নির্ম্মিত বস্তুর প্রকাণ্ডত্ব,উহার মহত্ত্ব ও সুন্দরত্বের পরিচায়ক বলিয়া নির্ণীত হইত। যাহা নির্ম্মাণ করিতে যত অধিক পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা তত অধিক মনোহর বলিয়া প্রতীত হইত। ইদানীং কিন্তু সে মতের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। এখন পারিপাট্য, সৌষ্ঠব, শৃঙ্খলা প্রভৃতি, উন্নত শিল্পের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পৃথিবীস্থ 'সাতটী অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তির' (Seven wonders of the world) মধ্যে, চীনের প্রাচীর সর্ব্ব-প্রধান না হইলেও, প্রধান কয়টীর মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য (১)। প্রাচীন শিল্পকারগণের অধ্যবসায় ও নিপুণতার ইহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল, উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাপি এই অপরিমিত সময়সাগরের নানারূপ ভীষণ উপদ্রবেও উহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা, বজ্র, প্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি কত কত মহতী নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু উহার উল্লেখযোগ্য বিশেষ ক্ষতি বা অনিষ্ট হয় নাই (২)। কখনও বা অত্যুন্নত গিরি-শিখর হইতে অতি নিম্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া, কখনও বা দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া, কখনও বা বেগবতী স্রোতস্বতী সকল উত্তীর্ণ হইয়া, উহা সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে অবিরলভাবে চলিয়া গিয়াছে। কোন

(১) কোন কোন মতে ইহা, আশ্চর্য্য-কীর্ত্তি-সপ্তকের অন্তর্গত নয়।

(২) ইহার আধুনিক অবস্থা, প্রবন্ধের শেষাংশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বিঘ্ন বাধা ইহার গতি রোধ করিতে পারে নাই। এই মহাকীর্ত্তির কথা মনে উদয় হইলে, কাহার না শরীর রোমাঞ্চিত হয়? অধ্যবসায়ে যে অসাধ্য-সাধন হইতে পারে, ইহা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

খৃষ্ট-জন্মের ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে,চীনের তাৎকালিক রাজা (Che Hwanti) চীহোয়ান্টীর শাসন কালে এই মহাপ্রাচীর গঠিত হইতে আরম্ভ হয় (৩)। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতেই বা কত বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ (৩)। কেহ কেহ বলেন, ইহা পাঁচ বৎসরে সমাধা হইয়াছিল।

তত্রস্থ অধিবাসিগণ ইহাকে "The Great city wall" 'প্রধান নগর প্রাচীর' আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

এইরূপে এই সুবৃহৎ রাজ্যের পশ্চিমোত্তরাংশ প্রাচীর বেষ্টিত করিবার ইচ্ছা কাহার অন্তরে প্রথম উদিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা অতীব দুষ্কর। কেহ বলেন, সম্রাট্ (Che Hwanti) চীহোয়ানটী, ইহার কল্পনা ও প্রস্তাব করেন।

কেহ কেহ আবার তাঁহার সুদক্ষ সেনাপতি "Mung-teen' মুংটীনকে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যিনিই এই প্রাচীর নির্ম্মাণের প্রস্তাব করুন না কেন, ইহা যে সেনাপতির তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই বিশাল প্রাচীর সেনসী (Sense) (৪) হইতে পীত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আর এক জন লিখিয়াছেন, ইহা (Pa-chip-le) উপসাগর হইতে সেনিঙ (Sening) (৪) পর্য্যন্ত প্রসারিত।

---

(৩) বাবু শশিচন্দ্র দত্তের "Ruins of the old world" নামক পুস্তকে (১৭৫ পৃ) লিখিত আছে, প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য খৃষ্ট-জন্মের ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। কিন্তু বিখ্যাত বীটনের মতে উহার গঠনকার্য্য খৃষ্ট-জন্মের ২২০ বৎসর পূর্ব্বে সমাধা হইয়াছিল। এই উভয় লইয়া গণনা করিলে, বলিতে হয়, উহার নির্ম্মাণে ২৬ বৎসর লাগিয়াছিল। ছাত্রবোধ নামক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে লিখিত আছে, ইহা ৫ বৎসরে নির্ম্মিত হয়। এই বর্ষের ২০ শে ফেব্রুয়ারির ষ্টেটসমান্ পত্রিকায় এই প্রাচীর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে ইহার নির্ম্মাণকাল বিষয়ে এই মাত্র লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(৪) সেনসী—চীনের পশ্চিম প্রদেশের একটী বিভাগ বা জেলা। Che-gan-fod চিগান ফোড ইহার প্রধান নগর। সেনিঙ, পিকিনের ১৫ ডিগ্রী পশ্চিমে।

ইহার অবস্থান অতি সুদৃশ্য। এক জন কবি লিখিয়াছেন—

"Winding like a huge snake turned into stone."

অর্থাৎ এক প্রকাণ্ড অজগর, যেন সাম্রাজ্য বেষ্টন করিতে যাইতেছিল, সহসা প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে।

ইহা, স্থলে স্থলে ৫০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়াও গিয়াছে। আবার অতি নিম্ন বালুকাময় উপত্যকাও অতিক্রম করিয়াছে। নদী বা কোন রূপ স্রোত, যেখানে আছে, তথায় প্রথমতঃ অতি দৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দিয়া প্রাচীর লইয়া যাওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছে।

এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রস্থ বিষয়ে সকলেই মোটামুটী বলিয়া গিয়াছেন যে,ইহার উপর দিয়া ছয় জন অশ্বারোহী অবলীলাক্রমে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া যাইতে পারে। পাঠকগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থে নিম্নে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতাদির এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া গেল।

দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা।	কাহার মত।
১২৫০ মাইল	মৃত্তিকা-সংলগ্ন স্থলে ২৫ ফিট, ক্রমে যত উচ্চ হইয়াছে, ততই উহা কমিয়া ২০।১৫ ফিট হইয়াছে।	সমতল ভূমিতে ৩০ ফিট, পর্ব্বত কিম্বা উচ্চ জমির উপর ২০।১৫ ফিট্।	Beeton's Dictionary of Universal information. p. 445
১৫০০ মাইল	১৮ ফিট (গড়ে)	৪৫ ফিট্	Parley's Universal History p. 794,
১৫০০ মাইল	উপরিভাগ ১৫ফিট্	৩০ ফিট্	Maundr's Treasury of History p, 794.
১৫০০ মাইল	২৫ ফিট	২০ হইতে ২৫ ফিট্	Chamber's Miscellany, Vol viii.
১৫০০ মাইল অপেক্ষা অধিক	বীটন্ সাহেবের মতের সহিত ইহার ঐক্য আছে	ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতানুসারে প্রাচীরের উচ্চতা ও তারতম্য হইয়াছে। গড়—২৫ফিট.।	Ruins cf the old world S. Dutt. p, 175.
১৫০০ মাইল	কোন বিশেষ উল্লেখ নাই	পৌনে ২৫ ফিট্	ছাত্রবোধ—৩০পৃষ্ঠা।
২০০০ মাইল	কোন উল্লেখ নাই	কোন উল্লেখ নাই।	Statesman 20th Feb,1895.

কি উপকরণে এই মহাপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল,তাহা সকলেই জানিতে উৎসুক হইবেন। এই প্রাচীরের ভিত্তি ও কোণাংশ সকল গ্রেনাইট (Granite) প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই গ্রেনাইট, প্রাচীর হইতে দুই ফিট বাহির হইয়া থাকে। এই ভিত্তির উপর ৫ ফিট লম্বা দুইটী দেওয়াল প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাচীরদ্বয় নীল রঙের ইটু ও চা-খড়ি মিশ্রিত চূণ দিয়া নির্ম্মিত। এই উভয় দেয়ালের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান মাটী ও রাবিস দিয়া পুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল (৫)। পরে পুনরায় ইট দিয়া মাথা মারিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী পাঠকগণের বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য কয়েক ছত্র ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(1) "The body of the wall is an elevation of earth, retained on each side by solid brickwork and terraced by a brick platform furnished with parapets. The bricks used in the construction are kiln-dried and well moulded and are cemented by a strong mortar of white calcined lime. (Chamber's miscellany.)

(2) "The body of it consists of an earthen mound retained on each side by walls of masonry and brick terraced by plat-form of square bricks. The foundation and corners are of granite, but the casing throughout is of blue brick, cemented with pure white mortar.

(The ruins of the old world, p. 175.)

(3) "It is constructed of earth or rubbish cased on each side by stone or brick work) brick work.

Beeton P, 454,

এই প্রাচীরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য, অন্যূন শত পদান্তে এক একটী করিয়া চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল স্তম্ভের সংখ্যা কেহ বলেন,প্রায় এক সহস্র। কেহ বলেন,তিন সহস্র। স্তম্ভ গুলির ভিত্তি ৪০ বর্গ

(৫) কিন্তু ছাত্রবোধে লিখিত হইয়াছে, উহার সমুদয় অংশই ইষ্টকনির্ম্মিত।

ফিট,এবং ইহাদের উচ্চতা, স্থলবিশেষে ৩৮ হইতে ৪৮ ফিট পর্য্যন্ত দেখা যায়।

এই স্তম্ভের ভিতর সোপান থাকিত ও উহাদের গাত্রে ছোট বড় গর্ত্ত থাকিত। যুদ্ধকালে এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া তীর নিক্ষিপ্ত হইত। প্রাচীরটী যে সকল স্থলেই একরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নহে। পশ্চিম ভাগের সর্ব্বশেষ সীমায় কেবল ১৫ ফিট উচ্চ ও রাশীকৃত মাটী ও প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। অনেক ইতিহাসবেত্তারা এই স্থলটীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প। স্থানে স্থানে দুই তিন বার প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয়,এই সকল স্থান আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল। চীন-সংলগ্ন মঙ্গোলিয়া প্রদেশে যাইবার জন্য ইহার গাত্রে বড় বড় তোরণ বা কটক আছে। এই সকল তোরণের রক্ষার্থ অতি দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গপরিবেষ্টিত এই তোরণ-সমূহ দেখিতে অতীব সুন্দর ও হৃদয়ানন্দদায়ক।

এই অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রভৃতির তালিকা আমরা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু ইহা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাহা নিম্ন-লিখিত গণনা হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

"There are sufficient materials in it to build all the dwelling houses in England and Scotland, allowing two thousand feet of masonry to each ; or were the materials pulled down and a new wall made of them to be twelve feet high and four feet thick, that wall would be ample enough to encircle the globe at the equator."

(Maundre's Treasury of History.)

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

এই প্রাচীরে যত মালমসলা লাগিয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সমস্ত বাটী প্রস্তুত হইতে পারে ; কিম্বা যদি এই প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া ১২ ফিট উচ্চ ও ৪ ফিট চওড়া একটী নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে এই নূতন প্রাচীর বিষুব রেখাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিতে পারে। কি অদ্ভুত ব্যাপার!

প্রাচীর কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল,তাহা এখনও বলা হয় নাই। তৎকালে চীনদেশ,বর্ব্বর হুণ (৬) ও তাতার জাতি দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত। ইহারা রাত্রিযোগে গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে উহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। এই উভয় জাতিই উত্তর ও পশ্চিম বিভাগ, হইতে আসিত।

এই সময়ে আধুনিক "Shin" সীন বংশের প্রবর্ত্তক চীহোনটী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চীন রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতির অধীন থাকায় সর্ব্বদাই উহাদের মধ্যে বিবাদ বর্ত্তমান থাকিত। উক্ত মহারাজ সর্ব্বপ্রথম এই অন্তঃ শত্রু ও বিশৃঙ্খলা দলনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং এই কার্য্যে শীঘ্র সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে বহিঃ শত্রুর উচ্ছেদ-সাধন তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাদের আক্রমণের আকস্মিকতা,তাঁহাকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল। তিনি যুদ্ধেচ্ছায় যেথানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন,হয়তো সেখানে আর কোন উপদ্রব হইল না ;কিন্তু রাজ্যের অন্যাংশ একবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সম্মুখ যুদ্ধে পাই-লেই তিনি তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন বটে,কিন্তু কিছুতেই তাহা-দের আক্রমণ হইতে নিজ বিস্তৃত রাজ্যকে তিনি নিরাপদ করিতে পারেন নাই।পরিশেষে সাম্রাজ্যকে এইরূপে এই সুবৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিবার অভিলাষ তাঁহার অন্তরে উদিত হইল (৭)। ইহাই অসভ্যজাতির উৎপীড়ন নিবারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।

---

(৬) হুণ জাতির কথা সংস্কৃত পুস্তকাদিতেও দেখা যায়। বোধ হয় হন্ (Hun) ও হুণ জাতিতে কোন প্রভেদ নাই। এই হুণ জাতি ভারতবর্ষের উত্তরে বাস করিত। সুতরাং ইহা-রাই যে চীনদেশ আক্রমণ করিত, সে বিষয়ে অতি অল্প সন্দেহ হইতে পারে। রঘুবংশে ইহা-দের উল্লেখ আছে।

"তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কপোলপাটলাদেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্॥ ৪র্থ সর্গ ৬৮।
জটাধর লিখিয়াছেন .. শ্বপাকশ্চ, তুরুষ্কশ্চ হূণো যবন ইপি।"

(৭) তাঁহার এই ইচ্ছা স্বতঃপ্রবৃত্ত, বা অন্য পরামর্শজনিত, সে বিষয়ের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যে উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল,তাহা কতদূর সুসাধিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। এক ইতিহাসবিৎ বলিয়াছেন:—

But the end which it was intended to secure viz the protection of China from foreign invaders, was never fully attained.

ইহার মর্ম্ম এই:—যে অভিপ্রায়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল—বৈদেশিক আক্রমণ হইতে চীনদেশের রক্ষা—তাহা কখনও সুসম্পন্ন হয় নাই।

অন্য এক জন বলিয়াছেন :—

"But for fourteen centuries previously, it was an all important protection"

অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা এক অতি উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্ত এই প্রাচীর, বিদেশীয়গণের উপদ্রব হইতে চীন সাম্রাজ্যকে রক্ষা, করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যখন হইতে জঙ্গীস খাঁ ও তাঁহার সেনাদল উহা অতিক্রম করিয়া চীন গমন করে, তখন হইতে কেহ আর উহাকে রক্ষণশক্তিশীল বলিয়া বিবেচনা করিত না (৮)। এই প্রাচীর-নির্ম্মাণের অব্যবহিত পরেও এমন কি,চী-হোন্‌টীর পুত্র আরনৃশী লায়েন্ প্যাঙ্‌ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইবার পর হইতেই পুনরায় সেই সমুদয় উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় হইতে জঙ্গীস খাঁর অভ্যাগমনকাল পর্য্যন্ত চীন, বিদেশীয় আক্রমণে বিত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

জঙ্গীস খাঁর চীন দেশে আসিবার কারণ পাঠ করিলেই জানা যায়, তৎকালেও চীন দেশ, তাতার ও হুণ (Hun) জাতি কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইতেছিল। এই উৎপীড়ন হইতে আপনাকে ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্যই তাৎকালিক চীনরাজ নিঙ্‌কিসুয়াঙ, জঙ্গীস খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজ্য-লোলুপ জঙ্গীসও তাঁহার প্রার্থনানুসারে চীনের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তথায় উপস্থিত হন। ক্রমে ইনিই চীনের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন ও রক্ষকবেশে যাইয়া ভক্ষকরূপ ধারণ করেন। যদিও ইনি নিজে চীন-সাম্রাজ্যের রাজা

(৮) জঙ্গীস খাঁ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীন প্রবেশ করে।

হইতে পারেন নাই, কিন্তু সেই সময় হইতেই চীনে মঙ্গোলীয় রাজত্বের সূত্রপাত হয়। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে জঙ্গীসের পুত্র বীরপ্রবর কুব্‌লে খাঁ, (Kublai Khan) চীন-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সুতরাং দেখা গেল, যে উদ্দেশে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আদৌ সফল হয় নাই।

সকল কার্য্যই, দেশকালপাত্র-সাপেক্ষ। এই মহাপ্রাচীর যে, যথেচ্ছাচারী রাজার শাসন-কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। রাজার পক্ষে, মাল-মসলা ও পরিশ্রমের মূল্য দিয়া এরূপ প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করান সম্ভব, এইরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা-মাত্র। কিন্তু চীনে তখন রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রচলিত। রাজা আজ্ঞা করিলেন, রাজ্যের পাঁচ আনা অংশ লোক, ইহার নির্ম্মাণে সাহায্য করুক, নতুবা তাহাদের নিস্তার নাই। সুতরাং অগত্যা তাহাদিগকে সম্মত হইতে হইল। তাহারা রাজকোষ হইতে খোরাকী বা পারিশ্রমিক কিছুই পাইত না। কালে ভদ্রে এক আধ দিন রাজব্যয়ে ভোজন ব্যাপার সমাধা হইত। যদিও চীনেরা রাজার যথার্থ দাস ছিল না, তথাপি সময়ে সময়ে উহাদিগকে ক্রীতদাস অপেক্ষাও অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। ইহার নির্ম্মাণ কালে যে কত শত জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু ইহা দ্বারা যে, শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রবাদ আছে—চীন-রাজগণের রাজ্য-কালে এই প্রাচীর এক লক্ষ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত হইত। আর এক জন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, ইহা দশ লক্ষ সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইত।

এই প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা চীনে কি কি মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব (৯)। ইহা যে কেবল দুই এক দিনের জন্য বিদেশীয় আক্রমণ হইতে চীন দেশকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা নহে।

এই প্রাচীর প্রস্তুত হইলে, অনেক অসভ্য জাতি আসিয়া ইহার সান্নিধ্যে

(৯) পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ, জীবন-ধারণের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহে কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিল। এইরূপে অনেক অব্যবহৃত স্থানে শস্যাদি উৎপাদিত হইয়া, রাজ্যের বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

অধিবাস করিয়াছিল। তাহারা এই প্রাচীরের আশ্রয়ে আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিত ও প্রাচীর-রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করিত। প্রাচীরস্থ প্রত্যেক দুর্গের নিকটেই এক একটী করিয়া গ্রাম হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক তোরণের নিকট এক এক দল প্রহরী রহিয়া গেল। এইরূপে সেনসী হইতে পীত-সাগর পর্য্যন্ত এক দল সৈন্য রহিয়া গেল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং রাজগণের অভাবনীয়রূপে সীমান্ত প্রদেশ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ীভূত হইল।

প্রাচীর দ্বারা চীন ও তাতার এই উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইবার কথা শোনা গিয়া থাকে। ইহাই বোধ হয়, তাহার একমাত্র উদাহরণ।

এই প্রাচীরের যত আধুনিক বর্ণনা আছে,তন্মধ্যে মহামতি গর্ডনের বৃত্তান্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে সত্যের অপলাপ করা হয় নাই।

ষ্টেটস্‌ম্যান্‌ পত্রিকায় ইহার বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"But its continuity has long since been broken. It has long and numerous gaps. Perhaps millions of tons have been torn from it for diverse purposes and probably not much of the original work is left today. Yet in the days of its glory, even to scratch it with a pin was a crime visited with the punishment of death. Even in its desolation it has the majesty of hugeness. The pyramids of Egypt cannot be named with it. It remains the greatest fortification ever constructed."—Statesman, 20th Feb, 1895.

'প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এখন বহুল বৃহৎ ছিদ্র ও গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রয়োজন সাধনার্থ ইহা হইতে শত শত মণ প্রস্তরাদি খসাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং আদি প্রাচীরের বোধ হয় অল্পই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু ইহার গৌরব-সময়ে ইহাতে আলপীনের দাগ কাটিলে তাহা অপরাধ বলিয়া, গণ্য হইত। উক্ত অপরাধীকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত! ভগ্ন দশায় ইহার বিশালত্বই, ইহার মহত্ব। মিসরের পীরামিডের ইহার সহিত তুলনা করা যায় না। জগতের ইতিহাসে যত গুলি দুর্গ-নির্ম্মাণের উল্লেখ আছে, ইহাই তাহাদের শীর্ষ-স্থানীয়।'

মানব-মহত্বের শিল্প-নৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের এই উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ আবহমান কাল জগতে বিদ্যমান রহুক।

শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

[রাজকীয় বঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে "দানলীলার" অভিনয়।

সেই পুরাতন কুঞ্জকানন, সেই প্রাচীন নিধুবন, সেই বহু পরিচিত কদম্ব-পাদপ—কতই দেখিয়াছি, কত বারই স্মরণ করিয়াছি। শ্যাম! তোমারই সেই বাঁশরী তো বরাবরই শুনিতেছি! সে সকলকে কত বার পুরাতন বলিয়াও তো উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু আজ কেন সে সকলকে আবার নবীন বোধ হয়? সন্নিবেশ-নূতনত্বে মরি মরি বিন্যাস-মাহাত্ম্যের কি বা মাধুরী! বলিহারি অভিনেতা-অভিনেত্রী। আর বলিহারি চিত্রকর! তোমার বালাই লইয়া মরি! তোমার ভারি কারিকুরি। সকলেই দেখিতেছি, তোমার চূড়ান্ত বাহাদুরি। উৎকৃষ্ট দৃশ্যপট, মনোহর সাজসজ্জা, অগণ্য অভিনয়-নৈপুণ্য, অভিনব প্রণালীর প্রাণানন্দপ্রদ সঙ্গীত, দৃশ্যপট-যোজনার সুব্যবস্থা—একে একে চিত্ত হরণ করে। এক কথায় বলিতে গেলে, রঙ্গভূমি-সংক্রান্ত প্রায় তাবৎ সুশৃঙ্খলা—বড়ই পরিপাটী।

চিত্তবিমোহন, নবীন অথচ সুশোভন পরিচ্ছদ-পরিহিত অভিনেতৃগণের নব নব হাব-ভাব-ময় গীতিনাট্যাভিনয়, বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে অধিক দেখি নাই। অধিক দেখার কথা কি? আদৌ দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না।

সুধন্যা—সেই ব্রজগোপী মূর্ত্তিমতী বৃন্দাদূতী। ধন্যা—সেই গায়িকাগ্রগণ্যা কলকণ্ঠী গোপিকা রাধিকা। ধন্য ধন্য—সেই সুদর্শন প্রফুল্লানন নন্দ-নন্দন।

ধন্য—সেই শ্রীমান্ শশীন্দ্রনাথ। যাঁহার একান্ত উদ্যোগে দৃশ্যপটের এরূপ অপরূপ নব-ব্যবস্থা। আর ধন্য—সেই নাট্যশালাধ্যক্ষগণ। সর্ব্বশেষে পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি, সেই প্রণেতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ ও শুভাশীর্ব্বাদ।

আর ধন্য—ভবানীপুরনিবাসী গীতাধ্যাপক শ্রীমান্ যজ্ঞেশ্বর রায়। নিম্নলিখিত গীতটী যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সুরের কারিকুরির প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য সুর গুলিও বিশেষ প্রশংসনীয়।

আর সে পাঁচ ছয় প্রকার রাগিণী মিশ্রিত জঙ্গলা প্রায়ই নাই। এক একটী সঙ্গীত, যেন প্রকৃত-মূর্ত্তিধারিণী।

(ঝিঁঝিট খাম্বাজ)

"চুপে চুপে চরণ ফেলে, দেখে শুনে আয় লো চলে,
ফিরে অরি পাছে পাছে।
আট ঘাট সব বেঁধে, আসি যাই রেতে রেতে,
তবু কি কিছু গোপন আছে।
ডাক্‌লে কালা বাঁশীর স্বরে, প্রাণ সরে না থাক্‌তে ঘরে,
প্রাণের মত পেলে পরে, কে না প্রাণ বেচে পরের কাছে॥"

মিনার্ভায় করমেতি বাই।

করমেতি ভক্তমাল হইতে গৃহীত। মৎপ্রণীত প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্তেও "ভক্তমাল" করমেতির আদর্শ। গ্রন্থকর্ত্তা, হাস্যরসের অবতারণার জন্য নানাবিধ নূতন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে এই সকলের অবতারণা। ইহাদের মধ্যে 'টুকরো' প্রথমে উল্লেখ যোগ্য। যিনি টুকরোর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি একজন ভাল অভিনেতা। তাঁহার গুণ ও ক্ষমতা আছে। দেমোকে কিঞ্চিৎ সবলকায় দেখিলে সুখী হইতাম। আগমবাগীশের মত স্থূলাকৃতি পুরুষের শিখা ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করা সূক্ষ্মকায় লোকের পক্ষেও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। অম্বিকার দাসীপনা স্বভাবের অনুরূপ হইয়াছিল। সে পেত্নী-মূর্ত্তিতেও নিরানন্দদায়িনী নয়; সুতরাং অভিনেত্রী ধন্যবাদের পাত্রী।

আলোক—পুরুষ-চরিত্রগণের সর্ব্বপ্রধান। আলোকই নাটকের প্রধান গ্রন্থি। শ্রীমান্ গিরিশচন্দ্র বাবুর পুত্র আলোক সাজিয়াছিলেন। ইঁহার অভিনয়-ক্ষমতার আমরা পরিচয় পূর্ব্বে অনেক বার পাইয়াছি ও দিয়াছি। এবারকার অভিনয়ও আশাপ্রদ ও সুন্দর।

করমেতি—অতি উত্তম হইয়াছিল। ইহার গানও অভিনয়-সৌকর্য্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। অনেকের মতে প্রথমাভিনয়ের করমেতি অপেক্ষা করমেতির বর্ত্তমান অভিনেত্রীর অভিনয় উত্তম।

এই বার শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কথা। শ্রীকৃষ্ণও পরিপাটী। রাধিকাও বেশ হইয়াছিল। গায়িকা-হিসাবে ধরিলে ইনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পরন্তু-

রাম ও কৃত্তিকা মন্দ হয় নাই। খানসামাবেশী আলোকও উত্তম হইয়াছিল। শেষকথা—বরকন্দাজ। ইহার আকৃতি ও সাজসজ্জা উভয় বিষয়েই কিঞ্চিৎ ত্রুটি ছিল। ফকিরগণ ও স্বপ্ননারীগণের অভিনয়ও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। দরবেশীদের "সূরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপাইয়া কাঁহা ছিপায়া তারা" ইত্যাদি গীত, আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছিল। আরও একটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গীত এই—"শ্যাম চেও না শ্যাম পাবে না, শ্যাম কি কারোর চাও" ইত্যাদি গান, ভাবাংশেও যেমন মধুর,সুর-সন্নিবেশাদিতেও তেমনই মনোহর।

গোলোকের ব্যাপার—রাধাকৃষ্ণের মিলন ও রাধা-কৃষ্ণের বিবাদের দৃশ্য, আমাদের অতিমাত্র সুন্দর ও মনোরম বোধ হইয়াছিল। এমন দৃশ্য-কৌশল অভূতপূর্ব্ব। আগমবাগীশের ঘোড়া হওয়ার ব্যাপারও মন্দ নহে; অভিনয়, দীর্ঘ-সময়-ব্যাপী হইয়াছে।

নবকুমার দর্শনে।

কোন্ জগতের বুকে ছিলে তুমি এত দিন ?
সেথা কি মিটে নি আশ
কিম্বা সুখ বার মাস,
না কহিতে মিলে সব, পেয়ে পেয়ে শ্রান্ত—ক্ষীণ ?
তাইরে এসেছ হেথা
সহিতে যাতনা ব্যথা
ধরিতে এ মানবের ভাঙ্গা বুকে—ভাঙ্গা আশা !
এসেছ যেথান হ'তে
ফিরে যাও সেই পথে

কাজ নাই দেখে' আর আমাদের (এ) জীর্ণ দশা !
এক দিন তোরই মত
এই জীবনের যত
ছিল পুষ্প—মধুময়—স্বর্গ যেন এ ধরণী !
আর আজি সে জীবন
মরু-ভূমি সু-ভীষণ,
সদা পুড়ি—শুষ্ক-কণ্ঠ-মুখে হাহাকার ধ্বনি !
কি ছিল, কি আছে এবে
কালে এত নাহি রবে,
মানবের এই ভাগ্য বড় নিদারুণ অরে !
দেখি শুনি এ সকল
কার সাধ হয় বল,
সেই দগ্ধ নিদারুণ সংসারে রাখিতে তোরে ?
কি শকতি মানবের !
সবি সবে, রবে ফের,
দেখিবেও কচি বুক ছিন্ন ভিন্ন নিরাশায় !
মানবের এই ভাগ্য বড় নিদারুণ হায় ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মুখদেখা।

বসন্ত পূর্ণিমা. হাসিছে রজনী
　　সে হাসি ধরিয়া অধরে,
আকর্ণ নয়নে মন-মথ—ধনু
　　বাঁধিয়াছ কে গো আদরে ?
চিকণ বসন আধ মাথে টানি,
　　ঈষৎ হেলিয়া পুলকে।
হার-ছলে পরি' মন্দারের মালা,
　　কে গো ফুলরাণী ভুলোকে ?
অথবা তুমি কি ক্ষীরোদ বালিকা
　　হেরিয়া ক্ষীরোদ-শয়নে,
আসিয়াছ হেথা ক্ষীরোদ ত্যজিয়া,
　　রাখিবারে তারে নয়নে ?
বুঝিতে যে নারি বল না সুন্দরী !
　　বড় সাধ মোর জানিতে,
কোথাকার তুমি, কিসে গড়া তনু
　　কি মাখা ও মুখ-খানিতে ?
পাশেতে বালিকা কনক-কলিকা
　　ব্যজনে চামর দুজনে,
তার মাঝে তুমি স্বরগ-নলিনী
　　শোভিছ মরি কি বরণে !
কাহার তরেতে এ ঘর উজলা,
　　কোন্ দেশ হ'তে এসেছ ?
হিরণ-উষায় কিরণ তুমি কি—
　　অলখেতে * তার খুঁ'সেছ ?
কেন বা ও মুখ, পলকে নেহারি
　　আপনা যাই গো ভুলিয়া ?

*অলক্ষ্যে।

কেন বা আশার সহস্র বদন
একেবারে যায় খুলিয়া ?
কি যে প্রাণে হয় বলিব কেমনে
প্রাণই জানে তা প্রাণেতে।
এ ক্ষীণ লেখনী লিখিতে নারে গো
সে ভাষা এ পোড়া গানেতে!
কোথাকার তুমি জানি না চিনি না
শুধু মুখ-খানি দেখিয়া।
হৃদয়ের ধন সুহৃদ্-রতন—
ও করে দিনু গো সঁপিয়া
রাখিও যতনে নয়নে নয়নে—
অনুরোধ মোর ভুল না।
সোহাগ-বসনে আছিল যে ঢাকা
সে বসন তুমি খুলো না।
ফুল ভালবাসে ফুল দেখে' হাসে
ফুলরাণী তুমি আদরে,
নিশি-দিনমানে দেখাইত তায়,
আধ-ফোটা ফুল অধরে।
আমি অভাজন কি আছে তেমন
"মুখ-দেখা" ব'লে দিব গো।
দিনু যা' আছিল দীনের সম্বল
সযতনে হৃদে রাখিও।

শ্রীসুদর্শন চট্টোপাধ্যায়।

"অনুশীলনের" নিয়মাবলী।

১। "অনুশীলন" প্রতি মাসে, ডিমাই ৮ আট পেজী ৬ ছয় ফর্ম্মা ৪৮ আটচল্লিশ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হয়।

২। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পদ্য, জীবনচরিত, সমালোচন, নানাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর প্রভৃতি সকল-বিষয়েরই অনুশীলন, "অনুশীলনে" স্থান পাইবে।

৩। "অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধ, বিনিময় এবং সমালোচনের পুস্তক ও পত্রিকাদি, পাঠাইবার ঠিকানা ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরি"।

৪। টাকা, কড়ি ইত্যাদি ৪৯নং কিয়ার লেনস্থ "মোহন প্রেসে" শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাক মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

৬। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৭। বিজ্ঞাপন ছাপিবার নিয়ম— প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৪৯ নং কিয়ার লেন,
কলুটোলা,—কলিকাতা। }

গোবিন্দপ্রসাদ দে
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকাবলী—

১।	অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত	৸০
২।	প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত	।৵০
৩।	ব্যাকরণ প্রবেশিকা (৩য় সংস্করণ)	৵১০
৪।	হানিমানের জীবনী	।৵০
৫।	সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর	॥০
৬।	স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর	।০
৭।	ভূ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর	।০
৮।	বংশাবলী (যন্ত্রস্থ)	

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

১৩০২ সাল, আষাঢ়, শ্রাবণ।] [২য় ভাগ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

অনুশীলন

ও

পুরোহিত

[illegible] এ নিমিত্ত ইহার নাম নিম্বার্ক।

এরূপ আখ্যান আছে যে, নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল। তিনি স্বয়ং সূর্য্যাবতার, পাষণ্ড-দমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল। একদা এক দণ্ডী, কেহ কেহ বলেন, এক জন জৈন উদাসীন, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে, উভয়ে বিচার আরম্ভ হয়। বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া, অতিথির শ্রান্তি-হরণার্থ কিছু খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিলেন; কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং ও রাত্রি কালে ভোজন করা বিধেয় নহে, এ প্রযুক্ত অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না। [illegible]

৭৭।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৯ নং কিরার লেন, "মোহন প্রেস" হইতে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

অনুশীলনের সমালোচনা।

(1) We have received the first five numbers of this Bengali monthly edited by Pandit Mahendranath Vidyanidhi. It was not long since that we had an occasion to say in noticing a book of his, that Pandit Vidyanidhi was well known to the literary world as a notable writer of Bengali prose. From the numbers before us, we can say that Pandit Vidyanidhi has well sustained his reputation. The new magazine contains many pieces and it promises to be a welcome accession to the ranks of the Vernacular literature of the day.

—The Amrita Bazar Patrika. March 4,1895.

৩। "অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধাদি, পাঠাইবার ঠিকানা ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরি"।

৪। টাকা, কড়ি ইত্যাদি ৪৯নং ফিয়ার লেনস্থ "মোহন প্রেসে" শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাক মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৶০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

(৩) "অনুশীলন মাসিক পত্র ও সমালোচন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধায়ক। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন' বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অনেক নূতন লেখক নবানুরাগে, নূতন উৎসাহে, ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 'অনুশীলনে' অনেক বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয়, নিজে আমাদের দেশীয় রঙ্গভূমির এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালায় একটী নূতন জিনিষ হইবে। "অনুশীলনে" বেশ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে গ্রন্থাদির সমালোচনা হইয়া থাকে। সমালোচক এ জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

—জন্মভূমি, ১৩০১। ফাল্গুন।

(1) Anushilan—Vol I—Nos 1 & 2 (together)—A literary journal conducted with ability. The numbers under notice contain some interesting articles, viz, one on the Buddhist monastery at Howrah and another on the history of amateur theatricals in Bengal.

Calcutta Gazette
8th September 1895.

আমাদের ভ্রমণ।

(শেষ প্রস্তাব)।

উখড়ার অস্থলটী, নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত। সুতরাং এখানে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম সনকাদি সম্প্রদায়। "নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক,এ নিমিত্ত ইহার নাম নিমাৎ। এরূপ আখ্যান আছে যে,নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল। তিনি স্বয়ং সূর্য্যাবতার, পাষণ্ড-দমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল। একদা এক দণ্ডী,কেহ কেহ বলেন,এক জন জৈন উদাসীন, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে, উভয়ে বিচার আরম্ভ হয়। বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া, অতিথির শ্রান্তি-হরণার্থ কিছু খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিলেন; কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং ও রাত্রি কালে ভোজন করা বিধেয় নহে, এ প্রযুক্ত অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না;ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতী-কারার্থে সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ অতিথির অন্নপাক ও ভোজন সম্পন্ন না হয়, তাবৎ তাঁহাকে নিকটস্থিত এক নিম্ববৃক্ষে অবস্থিতি করিতে কহিলেন; সূর্য্যদেব তাঁহার অনুমতি পালন করিলেন এবং ভাস্করাচার্য্য তদবধি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

"কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ-স্থানে গেল লইয়া সম্মতি॥" ভক্তমাল।

ইহাঁরা ললাটে দুইটী উর্দ্ধরেখা করেন এবং তাহার মধ্যস্থলে এক কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। ইহাঁদের গলার ও জপের মালা উভয়ই তুলসী কাঠের। রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপ ইহাঁদের উপাস্য দেবতা এবং শ্রীভাগবত ইহাঁদের প্রধান শাস্ত্র। ইহাঁরা বলেন, নিম্বাদিত্য-কৃত এক বেদ-ভাষ্য আছে। এক্ষণে ইহাঁদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; কিন্তু ইহাঁরা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে অনেক ছিল, আরঙ্গজেব বাদসাহের সময় মথুরায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। নিম্বাদিত্যের কেশবভট্ট ও হরিব্যাস নামক

দুই শিষ্য হইতে এ সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে—বিরক্ত ও গৃহস্থ।

যমুনা-তীরে মথুরা-সন্নিধানে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকে কহে, গৃহস্থ-শ্রেণী-ভুক্ত হরিব্যাসের সন্তানেরাই তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তথাকার মহন্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তিনি কহেন, ১৪০০ বৎসরের অধিক হইল, ধ্রুব ক্ষেত্রের গদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যুক্তি বোধ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানেই নিমাৎদিগের বাস আছে; বিশেষতঃ মথুরা ও তাহার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে এ সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক বিদ্যমান আছে এবং বাঙ্গালায়ও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীদের বায়ান্ন মড়ির(১) মত রামাৎ,নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদেরও বায়ান্নটী দুয়ারা আছে। এক এক তেজীয়ান্ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ নিজ ক্ষমতা প্রভাবে এক একটি দল সংস্থাপন করেন, তাহারই নাম দুয়ারা। যেমন বামন দুয়ারা,অগ্রদাস দুয়ারা, শ্রমনজী দুয়ারা, কুয়াজী দুয়ারা, টিলাজী দুয়ারা, দেব মুরারিজী দুয়ারা, দুন্দু রামজী দুয়ারা,রাম কবীরজী দুয়ারা নাভাম স্বামী দুয়ারা, পিপাজী দুয়ারা, খোজাজী দুয়ারা, রামপ্রসাদজী দুয়ারা, ইত্যাদি।"(২)

পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ী শ্রীনরহরি দেব নামক এক সাধক প্রথমতঃ বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ গুরুদেবের নিকট আদেশপ্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া বর্দ্ধমানে থাকিতেন। নিম্নলিখিত ৪ চারিটী স্থানে ৪ চারিটী অস্থল, তাঁহার খ্যাতনামা সর্ব্বগুণান্বিত শিষ্য-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিত। যথা—

ক। বর্দ্ধমান। গ। আড়ংঘাটা।
খ। উথড়াগ্রাম। ঘ। চেতুয়াগ্রাম।

মহাপুরুষগণ, সাধুসেবার ব্যয়-সংকুলনার্থ প্রত্যেক অস্থলেই ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন। সকল অস্থল ৪ চারি সম্প্র-

(১) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে ৭৯ পৃষ্ঠায় মড়ির বৃত্তান্ত দেখ।
(২) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩—১৪৬ পৃষ্ঠা।

দায়ী বৈষ্ণবদিগের ভজন ও বিশ্রামার্থ স্থাপিত হয়। এই অস্থলে ক্রমান্বয়ে যাঁহারা মহন্ত হন, তাঁহাদের নামের তালিকা এই,—

১ ম, দয়ারাম দাস (দেব মহান্ত)
২ য়, পূরণ দাস (পুরন্দর দাস) („)
৩ য়, মনসারাম দাস („)
৪ র্থ, রাধাকৃষ্ণ দাস („)
৫ ম, বালকরাম দাস („)
৬ ষ্ঠ, রামদাস জী („)
৭ ম, দৈবকীনন্দন দাস („)
৮ ম, হরদেব দাস। („)
৯ ম, শ্রীরামনারায়ণ দাস („)

দয়ারাম দাস, ঐ অস্থলের প্রথম মহান্ত। বৃন্দাবনচন্দ্র, ঐ অস্থলের দেবতা। দয়ারাম তাঁহার সেবক বা পূজক। পুরন্দর দাস, দয়ারামের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অপর নাম পূরণ দাস। ইহাঁদের দুই জনের সময়ে অস্থলের প্রাদুর্ভাব ছিল না। পুরন্দরের শিষ্যের নাম মনসারাম দাস। ইনি দীর্ঘজীবী। ইহাঁরই সময়েই অস্থলের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হয় (৩)। মনসারামের অনেকে শিষ্য ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ, বালকরাম, রামদাস ও দৈবকীনন্দন মনসারামের শিষ্য। তাঁহারাও ক্রমান্বয়ে পর পর মহান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে হরদেব দাসের মহান্তগিরি। বালকরাম তাঁহার গুরুদেব। তৎপরে যিনি মহান্ত হন, তাঁহার নাম রামনারায়ণ দাস। ইহাঁর গুরুর নাম দৈবকীনন্দন। ইহাঁর মত সরল লোক বিরল। এরূপ অমায়িক পুরুষ অতি অল্পই দেখা যায়। ইনিই বর্ত্তমান মহান্ত। (৪)

১। দয়ারাম দাস।—যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে, উথড়ার অস্থলের তিনি প্রথম মহান্ত। তিনি বর্দ্ধমানস্থিত প্রধান মঠের মহান্ত মহারাজের প্রধান শিষ্য। তাঁহার সময়ে অস্থলের ঘর ও সামান্য

(৩) রাণী বিষণকুমারী, বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুরের সেবার জন্য ধুনারাগ্রাম সম্প্রদান করেন। পশ্চাৎ ঐ গ্রাম ঐ দেবতার নামে—'বৃন্দাবনপুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(৪) এই গ্রামে প্রেমপুরী সন্ন্যাসীর স্থাপিত কালীদেবী আছেন। আরও দুইটা কালীঠাকুরাণী ঐ গ্রামে বিরাজিত। প্রেমপুরীর জীবন কালেই নাকি সমাধি হইয়াছিল।

ভূমি-সম্পত্তি (বিষয়)-মাত্র অস্থলের সম্বল ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যাইতেছে না।

২। পুরন্দর দাস—উক্ত দয়ারামের শিষ্য। তিনিই দ্বিতীয় মহান্ত। তাঁহার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। তাঁহারও উপাধি 'দাস'। পাঠক লক্ষ্য করিয়া যাইবেন, 'দাস' প্রায় সকলেরই নামের শেষে সংযোজিত আছে। উহাকে উপনাম বলিতে হয়, বলুন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাতে এই সম্প্রদায়ের বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে। তিনিও কত বৎসর গদি অধিকৃত করিয়াছিলেন,তাহা অতীত কাল-গর্ভে নিমগ্ন।

৩। মনসারাম দাস—উনিশ বৎসরে মহান্তের গদি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এত তরুণ বয়সে এই গুরুতর কার্য্য-প্রাপ্তি, বিশেষ যোগ্যতার কথা। এই সময়ে শ্রীমন্দির প্রস্তুত হয়। অস্থলের গৃহও তাঁহারই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।রাণী বিষণকুমারীর প্রযত্নে অস্থলের জমিদারী ঘটিয়াছিল। ৬০ বর্ষ তাঁহার অধিকার কাল। তাঁহার ঐ সময়ে স্থূল দেহাবসান হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মহান্ত পদে ৪২ বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ৪ চারি জন শিষ্য প্রধান। যথা,—

১। রামদাসজী মহান্ত (প্রধান শিষ্য)।
২। বালকরাম দাস (দেব) (মধ্যম শিষ্য)।
৩। রাধাকৃষ্ণ দাস (দেব) (তৃতীয় শিষ্য)।
৪। দৈবকীনন্দন দাস (দেব) (কনিষ্ঠ শিষ্য)।

এই জ্যেষ্ঠত্বাদি-ক্রমে শিষ্যেরা গদি পান নাই, নিম্নের বর্ণনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এরূপ হওয়ার কারণ অবগত নহি।

৪। রাধাকৃষ্ণ দাস—চতুর্থ মহান্ত। তিনিও তৎপরবর্ত্তী আর ৩ তিন জন মহান্ত মনসারামেরই শিষ্য। এতদ্দ্বারা গুরুরই মহিমা প্রঘোষিত হইতেছে। কথায় বলে, যেমন গুরু, তেমনই চেলা। ২০ বিশ বৎসর তাঁহার অধিকার চলিয়াছিল।

৫। বালকরাম দাস—পঞ্চম মহান্ত। হরদেব নামে তাঁহার যে শিষ্য ছিলেন, তিনি কালক্রমে মহান্ত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার যোগ্যতার বা প্রশংসার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বর্ষত্রয় মাত্র তাঁহার অধিকার ছিল।

৬। রামদাস—ষষ্ঠ মহান্ত। ৬ ছয় বর্ষমাত্র তিনি এই এই গৌরবাত্মক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহলোক লীলা-সংবরণ করেন।

৭। দৈবকীনন্দন দাস—সপ্তম মহান্ত। তিনি তৃতীয় মহান্ত মনসারামের শিষ্য, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ২০ বিংশতি বৎসর কাল একাদিক্রমে এই পদারূঢ় থাকিয়া নিজগুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়। তাঁহার রামনারায়ণ নামক শিষ্যই তদীয় পদে, তাঁহার অন্তে অধিষ্ঠিত না হউন, তাঁহার শরীরাপগমের অব্যবহিত পরেই না হউক, কিছু পরে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। দৈবকীনন্দন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া এই সংসার বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হন।

৮। হরদেব দাস—অষ্টম মহান্ত। তিনি পঞ্চম মহান্ত বালকরামের শিষ্য। মহান্তের গদিতে অল্প কাল অবস্থিত থাকিতেই তাঁহার ভবখেলা সাঙ্গ হয়। মোটে ৭ বৎসর এই শ্লাঘ্য কার্য্যের তিনি ভোগী হইয়াছিলেন।

৯। রামনারায়ণ দাস—নবম মহান্ত। ইনি এক্ষণে জীবিত আছেন। ইহাঁর পূর্ব্বে যত মঠধারী ছিলেন, তাঁহাদের সকলে না হউন, কেহ কেহ বিলাসিতার প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, ইঁহাতে কিছুমাত্র বাসন নাই। বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ, জিতেন্দ্রিয় ও সাধুসেবী। তন্নিবন্ধন অস্থলে প্রায় বার মাস ৫০।৬০ জন সাধু বৈষ্ণব নিয়তই অবস্থিতি করেন। চাতুর্ম্মাস্যের সময় অতিথি ও বৈষ্ণবের সংখ্যা শতকেরও অধিক হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যখন "জমায়ৎ" প্রভৃতির সমাগম হয়, তখন ২০০।৩০০ দুই তিন শত বৈষ্ণব, এখানে একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকেন। অস্থলের গুণে মধ্যে মধ্যে অনেক মহাত্মা ব্যক্তির এখানে পদার্পণ হয়। তাঁহাদের শুভাগমনে গ্রাম পবিত্র হয়, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের পদরজঃ-স্পর্শে ও শ্রীচরণ-দর্শনে কত পাপী তাপীর চিত্ত পূত হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা কে নিরূপণ করিবে! ১২৮৬ সালে বৈশাখ মাসে একাদশী তিথিতে এই পদ তিনি গ্রহণ করেন। সুতরাং চৌদ্দ বৎসর তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সন্ন্যাসীর আবার বিলাসিতা কি? তাঁহার ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার গুরুদেব দৈবকীনন্দনেরও আনন উজ্জল হইল। তাঁহার মত শান্তপ্রকৃতি তপস্বী বর্ত্তমান কালে সুবিরল

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যেখানে যত ভাল ভাল মহাত্ম বর্ত্তমান আছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। এরূপ আদর্শ মহাত্ম একান্ত বাঞ্ছনীয় এই সাধু আদর্শের সংখ্যা বিদ্যমান সময়ে যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, আমাদের সমাজের ততই কল্যাণ সংসাধিত হইতে থাকিবে। (৫)

প্রশ্নাবলী।

১। বালিকা বয়সে বিবাহ হিন্দু-সমাজের চিরাগত প্রথা কি না?

২। বৈদিক কালে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল কি না?

৩। পৌরাণিক বিষয় পাঠে জানা যায় যে ইন্দুমতি, দময়ন্তী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, উত্তরা প্রভৃতি মহিলাগণের যৌবনে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে প্রায়ই রাজকন্যাগণ পূর্ণ যৌবনাবস্থায় স্বয়ংবরা হইতেন। তবে কি সে সময়ে হিন্দু-কন্যাগণের বালিকা বয়সে বিবাহ হইত না?

৪। মুসলমান সম্রাটগণও আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ভোগ-সুখাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ছিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক পত্নী ও উপপত্নী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কাল যাপন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের নিয়োজিত অনুচরবর্গ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাদের জন্য সুন্দরী কন্যা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল জাতির মধ্য হইতেই, ছলে বলে কৌশলে এই সকল কন্যা সংগৃহীত হইত। এই সকল বিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না? অন্ততঃ যুক্তি-মীমাংসায় ইহা প্রমাণিত করা যায় কি না?

৫। কোরাণে সধবা নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ বলিয়া সধবা-গণকে তাঁহাদের গ্রাসে পতিত হইতে হইত না। কিন্তু অনেকে এ কথাও বলিয়াও থাকেন যে, মুসলমান সম্রাটগণ ও তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ—সধবা, বিধবা বা বালিকা বিবাহে কিছুই বিচার করিতেন না। রূপবতী

---

(৫) জমিদার বাবু পুলিনবিহারী হাওে মহাশয়ের শিক্ষিত, সুযোগ্য ম্যানেজার বাবু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, আমাদিগকে এই প্রবন্ধের কোন কোন ঘটনা দিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোক-দর্শনে তাঁহাদের লালসা এতই প্রবল হইত যে, বহুসংখ্যক রমণীকে তাঁহারা পত্নীভাবে গ্রহণ করিতেন। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের কি কোন প্রমাণ নাই?

৬। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মুসলমান সম্রাটবর্গের অনুচরবর্গ হিন্দু কন্যার সীমন্তে সধবার লক্ষণ-স্বরূপ সিন্দুর দেখিলেই কন্যা সংগ্রাহকগণ তাহাদিগের উপর আর কোন অত্যাচার করিতেন না; বা তাঁহাদিগের আয়ত্ত করিতে যত্নপর হইতেন না। এই কারণেই হিন্দুগণ আপনাদিগের জাতি কুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত বালিকা বয়সে কন্যাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতেম। এইরূপে হিন্দু-সমাজে বাল্য-বিবাহ-প্রথা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া এক্ষণে দেশাচারে পরিণত হইয়াছে। ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ আছে কি না?

৭। বাঙ্গালার হিন্দু-স্ত্রীলোকগণের এখন যে প্রকার পরিচ্ছদ, হিন্দু-রাজত্বের প্রারম্ভ কাল হইতেই এইরূপ পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল কি না? পূর্ব্বকালে তাঁহারাও এইরূপ এক খানি মাত্র বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিতেন কি না? অন্য কোনরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ছিল না কি?

——o——

আমি যে তোহারি।

আমি যে তোহারি!
তুঁহু-কমল সরস হৃদে
হাসত, নাচত, ভাসত ঐ;
করিছ খেল কতই রঙ্গে
মৃণালে কণ্টক আমি যে হই। ১।

আমি যে তোহারি!
বসন্তে তুঁহু প্রকৃতি রাণী
মলয়-মারুতে তোহারি খেলা;
বকুলের ছায় আমারি বাস
বসন্ত-সখা আমি সে কোয়েলা। ২।

আমি যে তোহারি !
শারদী আকাশে তুঁহু সে ঘন,
বিজলীর কোলে ভাসই যাও ;
পিয়াসী চাতক আমি যে সদা
বারি-আশে ধাই হই উধাও। ৩।

আমি যে তোহারি !
পূর্ণিমা রাতে চাঁদিমা তুঁহু
জগতে ছিটাও বিমল কণা ;
হাসত জগৎ তোহারি সাথে
হাসি দেখি তাহে তোরি সুষমা। ৪।

আমি যে তোহারি !
ভরা বাদরে তুঁহু সে বিজলী
ক্ষণেক চমকি মিশাই যাও;
বরিষায় আমি ঘনঘোর ঘটা
তুঁহু যে আমারি হৃদিমে রও। ৫।

তুঁহু হোয় কায়া, আমি তো ছায়া,
পুরুখ যো হাম, তুঁহু তো নারী ;
তোরি লাগি হাম ঢুঁরি সাথে সাথ,
মাগি সদা ভিখ মান তোহারি।
আমি যে তোহারি ! ৬।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মীর জাফর আলি।

বাঙ্গালা ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেরই নিকট উপরোক্ত মহাত্মা বিশেষ পরিচিত। আজি কালি এ দেশে বহুল পরিমাণে শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে। রাঢ়ে বঙ্গে কৃষাণ, মজুর, মধ্যবিত্ত, ধনী, নির্ধন সকলেই বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা গেজেটের ত্রৈমাসিক প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আকারে বাহির হইয়া থাকে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বঙ্গ দেশের প্রকৃত ইতিহাস বলিতে এক খানিও নাই। বাঙ্গালা এত বড় দেশ। খৃষ্টীয় অব্দারম্ভের পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে যে দেশের সমৃদ্ধির কথা বিদেশীয় ইতিহাসে পর্য্যাটকদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, সে দেশের ইতিহাস আজি নব্বুই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ.—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি আছে! দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভাব নাই, উৎসাহদাতা ধনবানের সংখ্যাও প্রচুর! ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত শত শত প্রকার সংস্থান-ভাণ্ডারে সাহায্যদানে তাঁহারা মুক্তহস্ত; কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের ও বঙ্গীয় সাহিত্যের একটী গুরুতর অভাব মিটাইবার জন্য কেহ এক বার চিন্তাও করেন নাই। ইংরেজ চতুর জাতি। শাসন ও শাসিত এতদুভয়ের মধ্যে যত দূর পরিচয় আবশ্যক, তাহা তাঁহারা উত্তম রূপ বুঝিয়াই থাকেন, এ জন্যই বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষায় বঙ্গের ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হইলেও, সুবিস্তৃত অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের জাতীয় ভাষায় তদ্রূপ এক খানি গ্রন্থও নাই। সুতরাং একটু বিস্তৃতরূপে মীর জাফর আলির পরিচয় দিবার জন্য আমাদিগকে এত অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইতেছে। মীর জাফর আলি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। মীর হোসেন আলি তাঁহার অগ্রজ। তাঁহারা মীর বংশীয়, সুতরাং অভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ। জাফর আলি, পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন ছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতে তাঁহার চরিত্র যার পর নাই দূষিত ছিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, তখন মীর হোসেন আলি, মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় সমরে বিপুল বীরত্ব

ও সুন্দর বল-কৌশল প্রদর্শন করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিলে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রধান সৈনাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। এ সময়ে মীর জাফর আলিও নবাব সরকারে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাল্যাবধিই নীচাশয় ও নীচক্রিয়াসক্ত ছিলেন এবং জঘন্য ইন্দ্রিয় সেবাই যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিতেন। সে কালের মুসলমান সম্রাট্, নবাব, আমীর, ওমরাহ প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়-সেবার দাস ছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায়, দীল্লির সম্রাট্ হইতে এক জন জায়গীরদার পর্য্যন্ত কেহ একটীমাত্র স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের ন্যায় স্ত্রীও তদ্রূপে পরিগণিত হইত। পাতসাহ ও নবাবদিগের অন্তঃপুর, সুন্দরী মহিলায় পরিপূর্ণ থাকিত। বহু পত্নী তো মুসলমান আঢ্যগণের নিন্দার বিষয়ীভূত ছিল না। একা হোসেন আলির দ্বাদশটী বিবাহিতা স্ত্রী এবং শতাধিক উপপত্নী ছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানা, তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যা। হোসেন আলি, যৌবনাবস্থায় মুসলমান ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে তাঁহার পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভে হোসেন আলির এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। এই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ মীর মদন।

হোসেন আলি, আপন কনিষ্ঠ জাফর আলিকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন; কিন্তু জাফর কামাসক্তি প্রযুক্ত তাঁহার সুন্দরী রমণীগণের প্রণয়াভিলাষী হইয়া গোপনে বিষ-প্রয়োগে অগ্রজের প্রাণ নষ্ট করেন। এ কথা বাহিরে প্রকাশ পাইল না; সুতরাং নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, হোসেন আলির গুণের পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহার অনুজ জাফর আলিকেই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন। মীর মদন তখন অল্পবয়স্ক। জাফর আলি, জ্যেষ্ঠের বিনাশ-সাধনের পরেই তাঁহার প্রধানা স্ত্রীগুলিকে আপন অন্তঃপুর-বাসিনীগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, কিন্তু হিন্দু-রমণীর সতী ধর্ম্ম, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। মীর মদনের জননী, জাফর আলির অভিপ্রায় উত্তম রূপ অবগত ছিলেন। তিনি জাফরের করাল কবল হইতে আপনার ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য পুত্র ও কন্যাটীকে লইয়া প্রস্থান পূর্ব্বক সয়দাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পরে পুত্র কন্যা রাখিয়া

রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই সময়ে মীর মদনের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ-মাত্র।

আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পরে সিরাজ উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অল্পবয়স্ক যুবক অভিভাবক-বিহীন হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলে, তাঁহার যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব হইয়া থাকে, সিরাজেরও তাহাই হইয়াছিল। জাফর আলি, আলিবর্দ্দি খাঁর সময় হইতে বঙ্গদেশের প্রধান সেনাপতির পদে বিরাজ করিতেছিলেন। নবাব স্বয়ং চঞ্চলমতি যুবক; সেনাপতি অহিফেনসেবী ব্যসনাসক্ত বিশ্বাসহন্তা ও অকর্ম্মণ্য পুরুষ, রাশীকৃত বেগম লইয়া ভোগ-সুখে উন্মত্ত। সুতরাং রাজ্যের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সিরাজের কুপ্রবৃত্তির প্রতিরোধ কিসে হইবে। রাজ্যের সমস্ত সৈন্য-বল যাহার আজ্ঞায় পরিচালিত, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ সচ্চরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ হইলে নবাবের শঙ্কার কারণ থাকিত। কিন্তু তৎপ্রতিকূলে তিনি নবাবের কুপ্রবৃত্তির পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহা দ্বারা রাজ্যের মঙ্গলের আশা করা বিড়ম্বনা-মাত্র। মীর মদনের চরিত্র পিতৃপ্রকৃতির উপাদানে গঠিত। তিনি সময়ে সময়ে আপন প্রভুকে সৎপথানুবর্ত্তী করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু প্রধান সেনাপতি জাফর আলি যখন সিরাজ অপেক্ষা কুক্রিয়াশীল ও সমানধর্ম্মী, তখন তিনি মীর মদনের ন্যায় যুবা পুরুষের কথা তিনি গ্রাহ্য করিবেন কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জাফর আলিকেই রাজ্যের যাবতীয় অমঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার দোষেই সিরাজের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি সুশৃঙ্খল হইতে পাইল না, যত অমঙ্গল ও অনিষ্ট সমস্তই তাঁহার চরিত্র-দোষে ঘটিল। তিনি বয়সে সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা প্রবীণ, বলেও কোন মতে কম ছিলেন না। রাজ্য-রক্ষক সেনা-গণ তাঁহারই আজ্ঞাধীন। তিনি সৎস্বভাবে থাকিয়া প্রভুর হিত-চিন্তা করিলে কি রাজলক্ষ্মী বিমুখী হইতেন?—না, ক্লাইবের মুষ্টিমেয় সৈনা, পলাসী ক্ষেত্রে বঙ্গাধিপের অসংখ্য সৈন্যকে ফুৎকার দ্বারা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান রাখিয়া বিজয়-নিশান প্রোথিত করিতে পারিত? বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের অধঃপতনের একমাত্র কারণ মীরজাফর আলি,—সিরাজ উদ্দৌলা নহেন।

এই ব্যসনাসক্ত কাপুরুষ জাফর আলি কুনীতির বশবর্ত্তী হইয়া নবীন নবাবের অসদাচরণের প্রতিবাদ বা তাঁহার চরিত্র-শোধনের জন্য এক দিন একটী বাক্য উচ্চারণ করিতেন না। সত্য বটে, সিরাজের সহিত তাঁহার প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ, কিন্তু সেনাপতির নৈতিক বল থাকিলে কখন তিনি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর তাহাতে তাঁহার বিরক্তি-ভাজন হইলেও তিনি কিছু করিতে পারিতেন না। রাজ্যের প্রধান কর্ম্ম-চারিগণ সকলেই হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। রাজা রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি রাজ্যের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সকলেই সিরাজের প্রতিকূল ছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ,স্বপদের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। সকলেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সিরাজ প্রতিকূলাচরণ করিলে সকলে সমবেত বলে তাঁহার পাশবাচরণ হইতে রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। কাপুরুষের ন্যায় গোপনে ইংরেজের পক্ষ পোষণ করা অপেক্ষা এরূপ দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লইতে পারিলেও মীর জাফরের পুরুষত্ব প্রতিপন্ন হইত। ধরিত্রী চিরদিনই বীরবরণ্যা ও বাহুবলের আশ্রিতা।

আলিবর্দ্দি খাঁর পুত্র ছিল না, তিন কন্যা ছিল। সেই তিনটী কন্যা আপন সহোদর হাজি মহম্মদের তিন পুত্র নিবাইস্ মহম্মদ, সৈয়দ আহম্মদ ও জৈন উদ্দীনকে অর্পণ করেন এবং নিবাইস্‌কে ঢাকার ও সৈয়দকে উড়ি-ষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দী-নের পুত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তিনটী জামতারই সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় দত্তক পুত্র অতিরিক্ত প্রশ্রয়-প্রাপ্তি-হেতু কলুষিতচরিত্র হইয়া থাকে। সিরাজও তাহাই হইয়াছিলেন। তিনি প্রশ্রয় পাইয়া এত অধিক অত্যাচারী হইয়া উঠেন যে, একদা মাতামহ আলিবর্দ্দিকেই সিংহাসন-চ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। নবাব তাহাতেও তাঁহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বরং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং সিরাজের অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়া বৈ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি

বিনা অপরাধে ঢাকার সহকারী শাসন-কর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর প্রাণ সংহার করেন। আলিবর্দ্দির জীবদ্দশাতেই তাহার সোদর হাজি আহম্মদ ও তাঁহার তিন পুত্রের পরলোক প্রাপ্তি হয়। সিরাজও পূর্ণিয়ার শাসন-কর্ত্তা সৈয়দ আহম্মদের পুত্র সকত জঙ্গ ভিন্ন আলিবর্দ্দির আর কোন নিকট আত্মীয় ছিলেন না। সকত জঙ্গ. সিরাজের ন্যায় আলিবর্দ্দির দৌহিত্র হইলেও সিরাজ তাঁহার দত্তকপুত্র; এই সকল কারণে তিনি যাহা করিতেন, আলিবর্দ্দি তাহার প্রতিবাদ করিতেন না। এই হেতু "আলালের ঘরের দুলাল" অপেক্ষাও আলিবর্দ্দির নিকট সিরাজের আদর ও যত্ন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে ইহাই বঙ্গে মুসলমান-রাজত্বের মূলোচ্ছেদের হেতুভূত হইয়া উঠে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইল। সিরাজ তাঁহার শূন্য সিংহাসনে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। নবাবী পাইয়া সিরাজ, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন, অত্যাচারের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি করিলেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। অজ্ঞান অল্পবয়স্ক যুবকেরা কর্ত্তৃত্বলাভ করিলে যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইল। রাজ্যের মধ্যে মীর জাফর আলি বয়সে প্রবীণ, এবং ক্ষমতায় প্রধান ছিলেন। তাঁহা দ্বারাই সিরাজের অত্যাচার-সঙ্কোচের সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি আপন পদের উপযুক্ত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সিরাজের অত্যাচারে বঙ্গভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। সিরাজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দম দুর্নীতি পোষণ করিবার অনেক লোক ছিল। সেই সকল অনুচরের পরামর্শে তিনি রাজসাহীর প্রাতঃ-স্মরণীয়া রাণী ভবানীর কন্যা রাজা রামকৃষ্ণের ভগ্নী তারা ঠাকুরাণীর সতী ধর্ম্ম নাশের সঙ্কল্পে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। রাণী ভবানী এবং রাজা রামকৃষ্ণের প্রতি দেশের সমস্ত লোকের সিরাজউদ্দৌলা, রাজা রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন জন্য প্রলুব্ধ হইলে তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাস কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব ইংরেজদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে

যেন মুর্শিদাবাদে আনাইয়া দেন। ইংরেজেরা আশ্রিত জনের প্রতি এরূপ ব্যবহারে অসম্মত হইলে এবং নবাবের বিনানুমতিতে কলিকাতা দুর্গের সংস্কার আরম্ভ করিলে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বহু-সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বীরভূমের আলি নাকি খাঁ ও আহম্মদ জুম্মা খাঁ, দেওয়ান মাণিকচাঁদ, রাজা মোহনলাল এবং মীর জাফর আলির অধিনায়কত্বে (১) ইংরেজদিগের কলিকাতাস্থিত দুর্গ আক্রমণ জন্য স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই বারেই ইংরেজদিগের পরাভব ও প্রসিদ্ধ অন্ধকূপ হত্যার অভিনয় হয়। তাহাতে জাফর আলির শৌর্য্য বীর্য্যের কোন পরিচয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, পাইবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। যেহেতু জাফর আলি এই সময় হইতেই আপন প্রভুর প্রতিকূলে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করিতেছিলেন।

এ সংবাদে কেহই সুখী হইল না। সকলেরই হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সিরাজকে শাসন করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা হইল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কেহই সৎসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে প্রকাশ্যে কোন ষড়যন্ত্র করিতেন না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সিরাজ কুনীতিপরায়ণ ঘোর অত্যাচারী হইলেও সমাজে তাঁহাকে ভয় করিতেন। দেশের ইহা অপেক্ষা দুঃসময় আর কি হইতে পারে! সেরাজের উচ্ছেদ সাধন জন্য দেশ-শুদ্ধ লোকে বদ্ধপরিকর হইলেও সে দিন তাঁহাদিগকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সেই দিনই বঙ্গদেশের অধঃপতন যে অতি নিকট, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। দেশের মধ্যে চরিত্রবান্ পুরুষ এখন কেহই ছিলেন না। যে পুত্তলবৎ সেনাপতি মীর জাফরকে হস্তগত করিয়া বা মীর মদন ও রাজা মোহন লালের মত ভুজবীর্য্যশালী উদারচেতা বীর পুরুষকে সহায়তা দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি করিতে সক্ষম। মীরমদন ও মোহনলাল, সিরাজকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(1) "Accordingly the Nawab collected a powerful host, the command of which he gave to Ali Naki Khan and Ahamed Jumma Khan of Beerbhum, along with Dewan Manik Chand, Bahur Mohan Lall and Jafar Ali Khan. Those marched against the English at Calcutta and encamped at Bagh-Bazar." Annals of Rural Bengal.

পুস্তক সমালোচনা।

১। দানলীলা—গীতিনাট্য—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিরচিত। কৃষ্ণলীলার দানব্যাপার লইয়া মধুর ছন্দে, মধুর ভাবে, সুন্দর সঙ্গীতের আয়াস-লব্ধ বর্ণ-বিন্যাসে ও উত্তম শব্দ-সংযোজনায়,অনুপ্রাসের ঘটায় গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। পুরাতন ঘটনার ছায়াপাতে ইহা সূচিত হইলেও নূতনত্বে, রসজ্ঞত্বে ইহা মনোজ্ঞ। নিধুবন, কদম্বপাদপ-মূলে গোপীগণ সঙ্গে বৃন্দার ছলে ও কৌশলে সেই পুরুষ-প্রকৃতির (শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার) সম্মিলন ;—কিন্তু তথাপি নূতন। বিন্যাস-নৈপুণ্যে ভাব-সমাবেশে যেন নবভাবে "দানলীলা" রচিত। গ্রন্থকারের কোমল-কঠিনে রস-সন্নিবেশে বিশেষ কারিকুরি ও অশেষ বাহাদুরী আছে। এ সবই গুণ। দোষের মধ্যে পুস্তকের ভাষাগত কতক ত্রুটি দেখিতেছি। আগামী সংস্করণে যেন সে গুলি শোধিত হয়। সঙ্গীত গুলি উত্তম। নিম্নে দুইটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাদূতীকে শ্রীরাধার মূর্ত্তির উদ্দেশে বলিতেছেন,—

(বেহাগ খাম্বাজ—যৎ)

১। "আধ বদন বসনে ঢাকা,
মরি কি মাধুরী-মাখা,
যমুনা-পুলিনে দেখা,
চখের দেখায় চুরি গেছে প্রাণ।
তড়িত-জড়িত তনু, ভ্রূ দুটী কামের ধনু,
তাহে বিষম সন্ধান, কুটিল কটাক্ষ-বাণ।
হেরে' সেই মুখ-চাঁদে,
পড়েছি প্রেমের ফাঁদে,
মিলায়ে তাহার সাথে,
দেহে দেহ প্রাণ-দান।"

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধা, বিপিনে মুরলীধ্বনি-শ্রবণে বৃন্দাকে কহিতেছেন,—

(সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান)

২। "বৃন্দা ! বিপিন-মাঝে,
মুরলী মধুর বাজে,
রাধা বলে' নানা ছলে।
তেয়াগিয়ে লোক-লাজে,
চল চল রসরাজে,
হেরিগে কদম্বতলে।

কুঞ্জে নাহি দেখা পেয়ে'
আছে পথ-পানে চেয়ে,
চল সখী ! চল ধেয়ে,
চিত-চোরা যাবে চলে।"

পুস্তকের লেখার একটুকু নমুনা দেখাইতেছি। সখীদের৷ পরস্পর কথোপকথন হইতেছে,—

"বৃন্দা।—কি লো এর মধ্যে যে সব আবার সেজে' বেরিয়েছিস্ ?
প্রথম সখী।—এ মধুর চাঁদ্‌নি দেখে, কি বিরহিণী, ঘরে থাকৃতে পারে ?

দ্বিতীয় সখী।—একে চাঁদ্‌নি,
তায় কালার বংশীধ্বনি,
ভ্রমরের গুন্‌গুনানি,
কোকিলের কল-কলানি—

বৃন্দা।—আমি তোদের বিরহ-শান্তির উপায় বলে' দিচ্ছি।
সকলে।—আঃ তা হ'লে বাঁচি—
বৃন্দা।—চুপ্ করে' বসে' থাক্‌গে যা।
প্রথম সখী।—তা পার্‌ব না, এ সব দেখ্‌তে শুন্‌তে না পেলে' গুম্‌রে গুম্‌রে মর্‌ব।
বৃন্দা।—তবে যমুনায় ঝাঁপ দিগে যা।
প্রথম সখী।—তাতে আরও তাপ বাড়্‌বে।
বৃন্দা।—তবে বিষ !
প্রথম সখী।—মৃত্যু হবে না।
বৃন্দা।—হার মান্‌লুম—পাকা বিরহিণী বটে।"

"পাকা বিরহিণী" বটে, এই উক্তিতে সমস্ত কথোপকথোনটী সরস করিয়া তুলিয়াছে।

২। গীতামৃত-সাগর, প্রথম ভাগ—ডাক্তার শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত।

যত দূর পাঠ করিলাম, তাহাতে দেখা গেল গ্রন্থকার, পুস্তক খানিকে নির্ভুল করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। গদ্যাংশের ভাষা সরল এবং পদ্যাংশ অপেক্ষা পড়িতে ভাল লাগে। পদ্যাংশে লালিত্য দেখিলাম না। ছন্দোবন্ধও ততটা ভাল নয়। গীতাবলীর মধ্যেও তেমন কৃতিত্ব কোথায়? বুঝিতেছি, ইহার দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইবে। দ্বিতীয় ভাগের পদ্যাংশে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৩। "চিকিৎসা" প্রথম ভাগ-শ্রীশশিভূষণ ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন পাঠে বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়াছেন, যে সমস্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসা বিধান—পুস্তক-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কতক গুলি আমাদের জানা আছে। পুস্তক-প্রণেতা যে সমস্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার পরীক্ষিত; সুতরাং বিশেষফলপ্রদ। নিশ্চয়ই তিনি সে সকলের প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন। ঔষধের যেখানে যেখানে ইংরাজিতে নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার বর্ণাশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের বক্তব্য এই যে, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি চিকিৎসা বিষয়ক যে কোন রূপ পুস্তক হউক, মুদ্রাঙ্কন কালে গ্রন্থকারের বর্ণাশুদ্ধির ও ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। পুস্তকের মূল্য আকারানুসারে কিছু কম করিলে ভাল হইত। তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোক, গৃহপঞ্জিকার মত এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে পারিত।

৪। তত্ত্বকুসুম—শ্রীশ্যামলাল মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।০ চারি আনা।

মজুমদার মহাশয়, তিন চারিটী কুসুম দিয়া চারি আনা দাম চান; কিন্তু গৃহস্থ, আজকালকার দিনে তিন চারিটী কুসুমে চারি আনা দিতে পারেও না, আর দিবারও উপযুক্ত বোধ করে না। যদি কেহ বলেন, ইহা তত্ত্বকুসুম! কিন্তু তত্ত্ব কুসুমে ততটা তত্ত্ব কথা পাইলাম না। যেরূপ পিপাসাকুল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, পাঠান্তে সে পিপাসা মিটিল না।

"শ্মশান-বৈরাগ্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ স্থানে স্থানে ভাল লাগিল বটে, কিন্তু এক

বিষয়ের অগণন উদাহারণে রসভঙ্গ হইয়াছে। ইহাতে কেবল পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এতটা কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া আর দুই একটী কুসুম দিলে ভাল হইত। পুস্তকের মধ্যে বর্ণাশুদ্ধিও আছে। কবিতার মিলও স্থানে স্থানে ভাল হয় নাই। তবে ছাপা ভাল। শ্রীকৃঃ।

৫। কবিরাজি শিক্ষা—দ্বিতীয় সংস্করণ, কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য—১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের আর্য্য-পিতৃপুরুষদিগের অনন্ত গৌরব কীর্ত্তি দেখাইয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহুলরূপে প্রচার হইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছে। যে সকল পুস্তক দ্বারা এই রূপ প্রচার কার্য্য হইয়াছে, "কবিরাজি শিক্ষা" তাহাদের মধ্যে এক খানি বিশেষ গণনীয়। অতি সরল ভাবে সাধারণের বোধগম্য হয়, এরূপ ভাবে অনেক গুলি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। চরক, সুশ্রুত বাভট,হারীত,ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত,শাঙ্গধর,রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসেন্দ্রে চিন্তামণি ও ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ও জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলা ভাবে—এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, উভয় সম্প্রদায়েরই ইহা কাজে আসিবে। অচিকিৎসক ও হাতুড়েরা যদি এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সামান্য সামান্য রোগ গুলির চিকিৎসা করেন,তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। গৃহস্থ-পরিবারে সামান্য রোগ গুলির চিকিৎসা,এই পুস্তকের সূত্রানুসারে করিলে সহসা ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার আবশ্যকতা নাই।

গ্রন্থকর্ত্তা নগেন্দ্রনাথ বাবু, বয়সে নবীন হইলেও সংগ্রহে প্রবীণতা দেখাইয়াছেন। অতি অল্পবয়সে শিক্ষা ও প্রতিভার গুণে তিনি চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ সুনাম সঞ্চয় করিতেছেন। অন্যান্য কবিরাজদিগের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা এই যে,তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত,গভর্ণমেণ্টের ডিপ্লোমাধারী ও ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী। এই মণি-কাঞ্চন-সম্মিলন এদেশে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। †

† আমরা এমন এক জনের নাম করিতে পারি, যিনি এক্‌ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ, ও ইংরেজিচিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ কবিরঞ্জন।

পুস্তকের শ্রেণী-বিভাগ ও বিষয়-বন্দোবস্ত বিশেষ সুশৃঙ্খলায় বিন্যস্ত। পুস্তক খানি চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রোগাদির পরীক্ষা ও লক্ষণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে পাচন ও বটিকাদি প্রস্তুত ও ভিন্ন ভিন্ন রোগে ঔষধ প্রয়োগ; চতুর্থ খণ্ডে বিষপান, জলমজ্জন, উদ্বন্ধন, সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞাতব্য ও সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির অবতারণা করা হইয়াছে।

পুস্তক খানির ছাপা ভাল। কাগজ ও ভাল। ৪৮০ পৃষ্টা বিশিষ্ট পুস্তকের মূল্যও দেড় টাকা মাত্র। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যদুনাথ বাবুর ধাত্রীবিদ্যা ও জ্বর-চিকিৎসার ন্যায় এই পুস্তক খানি বিরাজ করিলে প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা।

নগেন্দ্রনাথ বাবু এই পুস্তক খানি সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা, কবিরাজদিগেরই বিশেষ উপযোগী করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশের ও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করুন। আমাদের ইচ্ছা—সরল ভাষায় সরল ভাবে, এক খানি "গৃহচিকিৎসা" প্রণয়ন করিয়া তিনি দেশের আর একটী অভাব পূর্ণ করুন। শ্রীহঃ।

প্রাপ্ত মাসিক পত্রিকার উল্লেখ।

(মাসিক পত্রিকা গুলির প্রথম প্রচার কালের নির্দেশ)

১। **নব্যভারত**—১২৯০ সালের জৈষ্ঠ মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান। সকল সময়ে সকল প্রবন্ধ সুনির্ব্বাচিত না হইলেও, মোটের উপর ইহা উত্তম চলিয়া আসিতেছে। চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ, নব্যভারতে যত অধিক দেখিতে পাই, এত কিছুতে আর দেখিতেছি না। নব্যভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে বলা যায়, সাধনা ও সাহিত্য লঘু বিষয় লইয়া উন্মত্ত।

২। **অনুসন্ধান**।—১২৯৪সালের ৩০শে শ্রাবণে প্রথম প্রকাশিত হয়। নবম

বর্ষের, পঞ্চম সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এখানি অনেক দিনের পত্রিকা, এক ভাবেই চলিতেছে। ভাল ভাল প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ লেখকগণও অনেকে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। গত বর্ষে "অনুসন্ধান" সাপ্তাহিক হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বোধ হয়, কোন বিশেষ অসুবিধা হওয়াতে আবার "পাক্ষিক" হইয়াছে। আকার-প্রকার, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি অনুসন্ধানের সব ভাল; কিন্তু এক দোষ—যে উদ্দেশ্যে "অনুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যে উদ্দেশ্যে "অনুসন্ধান" প্রথম প্রচারিত হয়, এখন সে সকল উদ্দেশ্য ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান "অনুসন্ধান" অন্যান্য সকল মাসিক পত্রিকার ন্যায় এক খানি গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধমালা-পরিপূর্ণ পত্রিকা-মাত্র। আশা করি, পত্রিকার সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমান্ দুর্গাদাস লাহিড়ী, উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৩। জন্মভূমি।—১২৯৭ সালের পৌষ, "জন্মভূমির" জন্ম-মাস। তদবধি এতাবৎ উহার সজীবতা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। সূচী পত্রে লেখকদের নাম কেন দেওয়া হয় না? ইহা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে।

৪। সৎসঙ্গ।—১৩০০ সালের বৈশাখ হইতে "সৎসঙ্গ" সাহিত্য-সেবীদের সঙ্গী হইয়াছে। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখিতেছি। "অনুশীলনে" (প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায়) ভাষাগত কোন দোষের উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহা শোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ধীরে ধীরে ইহা উচ্চতর উন্নতি-সোপানে অধিরূঢ় হউক।

৫। সমীরণ।—১৩০০ সালের শ্রাবণে "সমীরণ" প্রথম প্রবাহিত হয়। যে "সমীরণ" জগৎপ্রাণ, ইহা সে 'সমীরণ' নয়। এই "সমীরণের" যেরূপ গতি, তাহাতে ইহাকে "সমীরণ" বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে ভাল প্রবন্ধ থাকে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ যথেষ্ট। সম্পাদন উত্তম হইতেছে, না। কোন কোন প্রবন্ধ ভ্রান্তিময়।

৬। বাসনা।—১৩০১ সালের প্রথম মাস হইতেই "বাসনা" সাহিত্যালোচনা-বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন। অত্যন্ত অনিয়মিতরূপে বাসনা পাইয়া থাকি। প্রথম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা হইতে পাইতেছি। মধ্যে ৮ম হইতে

১২শ সংখ্যার দর্শন পাই নাই। প্রবন্ধগুলি মাঝারি রকমের। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে খর দৃষ্টি সঞ্চালন আবশ্যক।

৭। আভা—মাসিক পত্র ও সমালোচনী। ১৩০১ সালে ফাল্গুনে ইহার প্রথম প্রচার। শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমিদার দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ৪ ফর্ম্মায় সমাপ্ত; কিন্তু ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় একত্র ৭ ফর্ম্মা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এই ৭ ফর্ম্মায় সর্ব্ব-শুদ্ধ ২৬টী বিষয়, সূচীপত্রে দেখিলাম। ইহার মধ্যে ১৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। এক এক জন লেখকের তিন চারিটী কবিতা। একটী প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা, একটী শ্লোক সংগ্রহ, আর বাকী গদ্য প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প। "আভা" পাঠ করিয়া মনে হয়, জমীদার মহাশয়ের এ সখ্ হইল কেন? "অতি জঘন্য" "সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট" মাসিক পত্রিকা বলিলেও "আভার" প্রকৃত অগুণের ব্যাখ্যা হয় না। "আভায়" বিন্দুমাত্র আভা দেখিতে পাইলাম না, সেই জন্য বিনিময়ে "অনুশীলন" প্রেরিত হইল না। এরূপ মাসিক পত্রিকা, বাঙ্গালা ভাষার কলঙ্ক। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপমান আর জমীদার মহাশয়ের অর্থনাশ। শেষে মনস্তাপও ঘটিতে পারে।

৮। জ্যোৎস্নাহার—বর্ত্তমান বর্ষের মাঘ হইতে জ্যোৎস্নাহার, বঙ্গসমাজ-গলে অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠোপযুক্ত অধিক প্রস্তাব নাই।

পত্র।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

"জগদীশ্বর।

"সুহৃজ্জন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পরম-প্রেমাস্পদেষু।

"প্রিয়তমেষু

"সবিনয়নমস্কারপুরঃসরনিবেদনমিদং——

"আপনার জীবন সম্পর্কীয় শুভ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত

হর্ষিত হইলাম। কখন কোথায় কোন্ দিকের বাতাস বহিতে থাকে, কিছুই বলা যায় না। যখন এক মকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, যেন আরও বা কি হয়। আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকার ত্যাগ করিবার চেষ্টায় আছি। দুই তিন মাস হইল, মৎস্য মাংস গ্রহণ করি নাই। কিন্তু অদ্যাপি পরীক্ষার অবস্থা যাইতেছে। সুরাপান করা তো অভ্যাসই নাই, কিন্তু সে বিষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হই নাই। আর শুনিয়াছেন, এ তরঙ্গ অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্দ্ধমানের রাজা প্রায় তিন দিন পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন নাই, লিখিয়াছেন। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, যদি তাহা আহার না করিলে কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়, তবে একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। বিধবাদেরই জয়, কেবল আতপ তণ্ডুল অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু আমাদের বড় বাবু* সে ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ মৎস্য মাংস বর্জ্জিত না হইলে উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ করা হয় না। আপনার ছাত্রদিগের পরীক্ষার কাল উপস্থিত, অতএব আর গল্প করিয়া কালহরণ করিব না। ইতি। ২১ ভাদ্র।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।”

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিতেছেন,—

“উত্তরপাড়া বালি, ১২৯১ সাল, ২৫ শে ভাদ্র।

“মদেকসদয়সুহৃত্তমেষু——

“সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন——

“আপনার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট গোলাব জলের ঘ্রাণে আপনারই স্নেহ-সৌরভ অনুভব করিলাম। অধিক আর কি লিখিব? ইহা আমার সুখসেব্য ঔষধ-বিশেষ। আপনি এখন যে স্থানে যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা শ্রীমান্ মুলরকে অবগত করিয়াছি। তিনি আপনার অধ্যয়ন-সংক্রান্ত যে কথাটী জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও যথোচিত লিখিয়া পাঠাইয়াছি। রামমোহন রায়ের কৃত “তোহফ্ তুল্ মোহদীন্” নামক পারসীক গ্রন্থ খানি কুত্রাপি পাওয়া যায় কি না, এই বিষয়টী তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহার

* “বড় বাবু” শব্দের লক্ষ্য যোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

উহার অপ্রয়োজন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সমাজের পুস্তকালয়ে ঐ গ্রন্থ যে খানি আছে, উপযুক্ত লোক দ্বারা তাহার প্রতিলিপি করাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলে হয় না? তাহা সঙ্গত কি না, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন। আপনাকে এখন এরূপ বিষয়ের বিবেচনা-ক্লেশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে অপরাধী হইতেছি কি না, জানি না।

রোগ ও বয়স উভয়ের প্রভাবে আমার শারীরিক অবস্থার হ্রাস বৈ আর উন্নতি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, আমার আশ্রম-বৃক্ষ গুলি বড়ই ভাল আছে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া ও লালন করিয়া সমধিক সুখী হই। আপনি যাবৎ ইহ-লোকে বিদ্যমান আছেন, তাবৎ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করেন, ইহাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সকল স্মরণে মনের ভাব-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমি তাহার বেগ সহ্যই করিতে পারি না, লিখিয়া অবগত করিব কি? ইতি।

নিতান্ত ভবদীয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।"

এই পত্রেরই শিরোদেশে সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়, মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহোদয়কে লেখেন,—

"প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার। 'তোহফ্ তুল্ মহদীন্' গ্রন্থের বিষয়ে তুমি অক্ষয় বাবুকে লিখিলে আপ্যায়িত হইব।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

বংশাবলী—ভরদ্বাজ গোত্র।

প্রথম বারে যত দূর বংশতালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল, এবারে তৎপরবর্ত্তিনী তালিকা প্রকাশিত হইল।

অষ্টম

১৩ শিরঃ (শিব)
১৪ নৃসিংহ (ফুলে),
১৪ রত্নাকর (কাচনা),
১৪ রাম (ছোট ফুলে)
১৫ গর্ভেশ্বর
১৬ মুরারি ওঝা,
গোবিন্দ
সূর্য্য
ভৈরব
সৌরি
১৭ মদন,
১৭ অনিরুদ্ধ
১৭ বনমালী,
মার্কণ্ড,
শ্রীনিবাস,
ব্যাস
১৮ রাঘব
১৮ কৃত্তিবাস পণ্ডিত
১৯ দেবানন্দ
১৮ লক্ষ্মীধর হালদার
২০ প্রয়াগ
২১ জগদীশ
২২ গোপাল
১৯ ত্রিলোচন,
১৯ দুর্গাবর পণ্ডিত,
১৯ মনোহর
২৩ রামনারায়ণ
২৪ রামকান্ত
২০ সুষেণ পণ্ডিত,
২০ জগদানন্দ,
২০ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য
২৫ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়
২১ রামাচার্য্য
২১ বসুদেব সার্ব্বভৌম,
২১ মুকুট
২৬ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
২১ শিবাচার্য্য,
২১ ভবানী,
২১ কানাই (ছোট ঠাকুর)
২২ রামেশ্বর,
২২ গোপীশ্বর (গোপেশ্বর) (রাঢ়ে)
২২ রত্নেশ্বর (রাঢ়ে)
২৩ রামকৃষ্ণ
২৪ মহাদেব
২৫ হরিরাম

শ্রীহর্ষ।

এই শ্রীহর্ষকে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। তিনি কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অন্যতম। শ্রীহর্ষ-নাম-ধারী কতিপয় ব্যক্তি, ভারতে বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে ভ্রমক্রমে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কান্যকুব্জাগত এই শ্রীহর্ষকে নৈষধ-চরিত-প্রণেতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাহা যে ভ্রমের কার্য্য, অন্য প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

মাধবাচার্য্য।

এই মাধবাচার্য্য, বেদব্যাখ্যা-কার মাধবাচার্য্য হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। আর এক মাধবাচার্য্য ছিলেন। তিনি "চণ্ডীমঙ্গল"-প্রণয়ন করেন। এই "চণ্ডীমঙ্গল" ১৫০১ শাকের গ্রন্থ। অতএব "চণ্ডীমঙ্গল"-প্রণেতা মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পূর্ব্বতন লোক হইলেন। সুতরাং আমরা আপাততঃ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তিন জন মাধবাচার্য্যের সন্দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইলাম। তিনি শ্রীহর্ষের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। আচার্য্য উপনামেই

তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় রহিয়াছে। তৎসন্তান কোলাহল। তাঁহার দুই পুত্র। তাঁহাদের নাম উৎসাহ ও গরুড়।

উৎসাহ ও গরুড়।

উৎসাহ ও গরুড়, ভরদ্বাজ গোত্রের প্রথম কুলীন। তাঁহাদের আরও তিন সহোদর ছিলেন, তাঁহারা অকুলীন। তাঁহাদের নাম ক্রমান্বয়ে এই —দাঁই, গোপাল ও বিঠোক। উৎসাহের আয়িত, অভ্যাগত ও মহাদেব এই তিন তনয়।

উদ্ধব, বিকর্ত্তন ও দৈবকীনন্দন পণ্ডিতরত্ন।

আয়িত—উদ্ধব ও লৌলিক এই দুই পুত্রের জনয়িতা। উদ্ধবেরও দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম বিকর্ত্তন ও শিয়। মতান্তরে শিয় শিব নামে পরিচিত। বিকর্ত্তনের আত্মজ দৈবকীনন্দন পণ্ডিতরত্ন। তাঁহার নাম হইতেই "পণ্ডিতরত্নী" মেলের সূত্রপাত।

শিয় (শিব) ও নৃসিংহ প্রভৃতি।

শিয়ের (শিবের) ঔরসে নৃসিংহ, দ্যাকর ও রাম এই তিন সন্তানের উদ্ভব হয়। প্রথম "ফুলের" মুখুটী, দ্বিতীয় "কাচনার" মুখুটী, কনিষ্ঠ "ছোট ফুলের" মুখুটী।

মুরারি ওঝা ও কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

নৃসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র, মুরারি ওঝা, গোবিন্দ ও সূর্য্য। তিনের মধ্যে মুরারি ওঝা খ্যাতিমান্ ব্যক্তি। ওঝা এই বিশেষণেই তাঁহার প্রসিদ্ধির পরিচয় করিয়া দিতেছে। এখন যেমন সর্পচিকিৎসককে "ওঝা" বলে, তখন উহার সে অখ্যাতি হয় নাই। মুরারি ওঝার আট সন্তান। যথা—ভৈরব, সৌরি, মদন, অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ড, [illegible]বাস ও ব্যাস। মদনের বংশে ভারতচন্দ্রের উৎপত্তি। মহাকবি

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, মদনের অধস্তন নবম পুরুষ (১)। বনমালীই সুবিখ্যাত কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতা। বনমালী তেমন গুণী ব্যক্তি ছিল না, তাই কৃত্তিবাস পিতামহ-নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে সদা বাস করেন ভারতী॥"

অতএব স্পষ্টই প্রতিভাত হইল—কৃত্তিবাস, মুরারি ওঝার পৌত্র, দৌহিত্র নহেন (২)। সুতরাং এই কৃত্তিবাসই যে, বাঙ্গালা রামায়ণের রচয়িতা, তাহা উদ্ধৃত কবিতা দ্বারাই বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কৃত্তিবাসের কোন পুত্র জন্মিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালা রামায়ণই তাঁহার পুত্রস্থানীয় হইয়া তদীয় কীর্ত্তি অক্ষয় রাখিয়াছে। (৩)

অনিরুদ্ধ ও লক্ষ্মীধর হালদার।

অনিরুদ্ধের ৭ সাত সন্তান—বরাহ, শুভঙ্কর, লক্ষ্মীধর হালদার, কিতো, নারায়ণ, ঋষি ও গোবর্দ্ধন। লক্ষ্মীধরের সময়েই সর্ব্বদ্বারী বিবাহ বিলুপ্ত হয়। সুতরাং তিনি দেবীবর ঘটকের সমকালীন ব্যক্তি। তখন মেল-বন্ধনের সূচনা হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল স্বগোত্রেই বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

---

(১) "বিশ্বকোষের" এই প্রবন্ধে ১৪০ পৃষ্ঠায় উহা নিবদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, স্ব-রচিত 'সত্যনারায়ণের' এক স্থানে নিজ-বংশ পরিচয় দিয়াছেন—

"ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ।
সদা ভাবে হত কংশ ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত।
ফুলের মুখুটী খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥"

কিন্তু বিশ্বকোষে যে' প্রকাশিত তালিকায় ভারতচন্দ্রের উর্দ্ধতন পুরুষগণের মধ্যে "ভূপতি রায়ের" নাম নাই। তিনি ফুলের মুখুটী ছিলেন, ইহাও জানা গেল।

(২) ১২৮১ সালের ৩১ শে আষাঢ়ের 'সুলভ সমাচারে' "নাতি" অর্থে যে দৌহিত্র বা পৌত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা ভ্রমমাত্র।

(৩) সম্বন্ধনির্ণয়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, সুলভ সমাচার (১২৮১ সাল, ৩১ শে আষাঢ়), জন্মভূমি (১৩০১ সাল, চৈত্র), সাহিত্য পরিষদ্ (১৩০১ সালের কার্ত্তিক) ইত্যাদিতে কৃত্তিবাস প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তখনকার জন্য ইহাই নিয়ম বলিয়া অবধারিত ছিল। পরবর্ত্তী নিয়মে ধার্য্য হয়, স্বগোত্রে পরিণয় যেমন নিষিদ্ধ.যথাবৎ তাহা বাহাল রহিল; অধিকন্তু সমান দোষাশ্রিত ঘরেই উদ্বাহ নিষ্পন্ন হইবে।

দুর্গাবর পণ্ডিত ও মনোহর পণ্ডিত।

লক্ষ্মীধরের ৭ পুত্র মধ্যে দুর্গাবর পণ্ডিত ও মনোহর পণ্ডিত কেবল যশস্বী ও মনস্বী নন, কিন্তু মানসিক তেজে তেজস্বী। দুর্গাবর পণ্ডিত, বল্লভী মেলের কুলীন। মনোহর,মেল-বন্ধনের কুলীন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠের নাম ত্রিলোচন ও কনিষ্ঠের নাম লোকনাথ পণ্ডিত। পণ্ডিত উপাধিই লোকনাথের জ্ঞানের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সুষেণ পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মনোহরের অপত্য-পঞ্চকের মধ্যে তৃতীয় সুষেণ পণ্ডিত, চতুর্থ জগদানন্দ পণ্ডিত ও পঞ্চম গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যই প্রধান। গঙ্গানন্দ সর্ব্বানুজ। প্রথম ও দ্বিতীয়ের নাম বল্লভ ও পঞ্চু। তাঁহাদের তিন জনের নামই এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কারিকা আছে, তাহার একাংশ এই,—

"সুষেণো জগদানন্দো,গঙ্গানন্দঃ কুলে কৃতী।"

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য.ফুলিয়া মেলের স্বনাম-প্রসিদ্ধ কুলীন। তাঁহার ভট্টাচার্য্য উপনামেই জ্ঞানশালিতার প্রভাব অনুভূত হইতেছে। চারিটী শাস্ত্রে (৪) পাণ্ডিত্য থাকিলে, 'ভট্ট' বলে। আচার্য্য উপাধিও শ্লাঘ্য (৫)।

"গঙ্গানন্দ ভটাচার্য্য ফুলিয়ার সার।
যাহা হইতে মেল কুল হইল উদ্ধার॥"

গঙ্গানন্দ, ফুলিয়া মেলের প্রথম ব্যক্তি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামাচার্য্য

---

(৪) "চতুঃশাস্ত্রাভিজ্ঞো ভট্টঃ"।

(৫) আচার্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থাদি "অনুশীলন ও পুরোহিতের" জ্যেষ্ঠ সংখ্যার ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি" গ্রন্থের প্রণেতা। মধ্যম বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীচৈতন্য দেবের, বঙ্গের নৈয়ায়িক রঘুনাথের ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শিক্ষাগুরু (৬)।

শিবাচার্য্য ও কানাই (ছোট ঠাকুর)।

শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই—ইহাঁরা সুসেণের আত্মজ। কনিষ্ঠ কানাই, ছোট-ঠাকুর সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের অধস্তন ১৮ অষ্টাদশ পুরুষ গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তদ্বংশীয়দের আদান-প্রদান চলে। শিবাচার্য্য কত বড় বিদ্বান্, তাঁহার "আচার্য্য" উপাধিতেই তাহা সাব্যস্থ করিয়া দেয়। (৭)

গোপীশ্বর।

শিবাচার্য্যের রামেশ্বর, গোপীশ্বর ও রত্নেশ্বর নামে তিন পুত্র জন্মে। মধ্যম ও অনুজ, বাসার্থে রাঢ় প্রদেশে গমন করেন। জ্যেষ্ঠ রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরিবংশ। তৎসুত রমণরাজবল্লভ। তিনি উলা-নিবাসী।

রামকৃষ্ণের সুত মহাদেব। তৎপুত্রের নাম হরিরাম। হরিরাম, লক্ষ্মী-নারায়ণের জনক।

লক্ষ্মীনারায়ণ ও দেবীপ্রসাদ।

লক্ষ্মীনারায়ণ, গোপীশ্বরের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। তিনি শ্রীধরপুরে বাস করিতেন। শ্রীধরপুর, মেমারির ক্রোশত্রয় দূরবর্ত্তী। তাঁহার ৬ ছয় পুত্র। দেবীপ্রসাদ, লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চম তনয়। তাঁহার অপর নাম গৌড়বল্লভ। তৎসন্তান রামধন।

রামধন।

ইনিও ঐ স্থানেরই অধিবাসী। ইঁহার তিন পত্নী। তিনি উত্তরপাড়া গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। তদ্গর্ভে আনন্দচন্দ্র, রামচন্দ্র, রাজকিশোর ও কৈলাস নামক চারি পুত্র জন্মে। তদ্ভিন্ন তাঁহার তিন তনয়া হইয়াছিল। মুর্শিদা-বাদের অন্তঃপাতী ভবানীপুরে তাঁহার দ্বিতীয়া বনিতার পিত্রালয়।

(৬) 'বিশ্বকোষে' সংক্ষেপে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

(৭) অনুশীলন ও পুরোহিতের ৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

তিনি রামচন্দ্র ও মুক্তারাম এই দুই পুত্র প্রসব করেন। তিনিও এক কন্যার প্রসবিত্রী (৮)। কলিকাতা-ভবানীপুর-নিবাসী ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের নন্দিনী দেবী রুক্মিণী, হারাণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের গর্ভধারিণী। এই হরিশ্চন্দ্রই হিন্দুপেটরিয়টের প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

একটী সত্য গল্প।

(৫)

কলিকাতায় পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়া বাটী যাইতে সাহস হইল না। ষ্টেসন হইতে গাড়ী করিয়া আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। গাড়ী যখন চোরবাগানের মোড় ছাড়াইল—একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। যাইবার সময় সেই আজন্ম পরিবর্দ্ধিত সুখ ধামের বাসবাটীকে প্রমোদকাননবৎ বোধ হইয়াছিল। আসিবার সময় বোধ হইল—যেন তাহা শ্মশানবৎ ধূ ধূ করিতেছে।

প্রভাত হয়—সূর্য্য-কিরণে আবার জগৎ হাসিয়া উঠে—আবার ফুলের উপর তেমনই করিয়া শিশির-বিন্দু দীপ্ত রবিকরে দ্যুতিময় হইয়া জ্বলিতে থাকে। আবার সূর্য্য অস্ত যায়, আবার প্রদোষের রক্তাভ, অল্পোজ্জ্বল মলিন ছটায় পশ্চিম গগন আলোকিত হয়—আবার চাঁদ উঠে—আবার দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজে—আবার—আকাশে নক্ষত্র ফুটে। প্রকৃতি নীরবে হাসে—ফুল নিভৃতে আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি ফোটে—গৎ যেমন বিলে তেমনই চলিয়া যায়—নদীতে স্রোত বহে, নীলাকাশে পাপিয়া ঝঙ্কার করে—কিন্তু সবই আমার কাছে যেন মৃতের ন্যায় বোধ হয়। আমি চারি দিকে যেন মৃত্যুর কালচ্ছায়া—অপ্রীতিকর ভাব দেখিতে পাই।

বাড়ীর খপর রোজই পাই। বাড়ীর কান্নাহাটি এখনও থামে নাই। সে অশ্রুজলের খর স্রোতে আমার উন্মুক্ত প্রবাহ মিশাইয়া আর কেন অনর্থক স্রোত বৃদ্ধি করিব ভাবিয়া—দুই সপ্তাহ পরের বাটীতে কাটাইয়াছিলাম।

এক দিন মা বিশেষ জেদ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন; বাটী গেলাম।

---

(৮) কন্যাদের নামাদির পরিচয় অজ্ঞাত।

হু-হু-ধূ-ধূ শূন্য-মহাশূন্য। ঘর দ্বার সবই যেমন আছে—তবু কে যেন নাই। আনন্দ ও প্রফুল্লতা—বিষাদ ও অশ্রুজলের জন্য আসন রাখিয়া কোথায় গিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় কত দিন চলে? হৃৎপিণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাসে আকুল হইয়া উঠে। চক্ষে জলের বাঁধ আর বাঁধিয়া রাখা যায় না। হৃদয়ের হুতাশনের ঝটিকা যে আর আটক করিয়া রাখা অসম্ভব। প্রাণের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া সে অগ্নিশিখা সর্ব্বত্রই তাহা—নিষ্পীড়িত করা দুরাশা মাত্র।

ছুটী শেষ হইয়া আসিল। এক বার—একবার শেষ দেখার জন্য পাষাণে বুক বাঁধিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। হৃৎকম্প হইল—ঘরের মধ্যে সুকুমারীর স্মৃতি আরও পরিস্ফুট। আলমারির মধ্যে কাচের বাসন ফ্যানসি জিনিস গুলি সে যেরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল—তাহা তেমনই আছে। বুককেসের উপর তাহার বই গুলি তেমনই ভাবে —নিশ্চল কেহ বহন করিতেছে। গৃহের এক স্থানে এক নিভৃত কোণে কোন এক স্মরণীয় ঘটনা লিখিয়া আমার নাম লিখিয়াছিলাম। সুকুমারী আমার অসাক্ষাতে তাহার নীচে লিখিয়াছিল—"চরণাশ্রিতা দাসী—শ্রীমতী সুকুমারী দাসী"। সেদিন তাহাকে আমি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলাম—"তুমি যে সূর্য্যমুখীকেও ছাড়াইয়া উঠিলে? দেয়ালের লেখা দেখিয়া তাহার তখনকার সে সলজ্জ ভাব টুকু মনে পড়িল। জ্যাকেটের উপর সুকুমারীর এক ছবি তুলিয়াছিল—একটি মুকুলিত পদ্মে ভ্রমর বসিয়াছে। ছবিটির অরিজিনালিটী খুব। সুকুমারী যত্ন করিয়া নিজের হাতে সেই ছবি খানি এমন এক জায়গায় খাটাইয়া ছিল যে, তাহা যেন সর্ব্বদাই আমার চোখে পড়ে। এক দিন দোলের সময় রহস্য করিয়া স্থির করিয়া সুকুমারী আমাকে "কুঙ্কুম" ছুঁড়িয়া মারে। কুঙ্কুম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ায় আমার গায়ে না লাগিয়া দেয়ালে লাগে। আজও সুধাধবলিত ভিত্তি-গাত্রে সেই আবিরের লোহিত চিহ্ন বর্ত্তমান। কে আর দেখিবে?, সুকুমারী চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঘরের সকল জিনিসেই তাহার হাতের চিহ্ন বর্ত্তমান।

যেরূপ অবস্থায় যেখানে যা ছিল, তাহাই রহিল। আমি দ্বাররুদ্ধ করিয়া চাবি লাগাইলাম। বিহঙ্গীন পলাইয়াছে, শূন্য পিঞ্জরে চাবি পড়িল। নীচে নামিয়া আসিলাম।

কর্ম্মস্থানে যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত ছিল। সেই দিন রাত্রির ডাকে রওয়ানা হইব। দ্বারে গাড়ী আসিল। পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। প্রতিবার বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে যাহা হয়,তাইই দেখিলাম। মাতার সকরুণ শ্বাস, ভগিনীর অশ্রুময় চক্ষু, দাস-দাসীর কাতর ভাব সবই চক্ষে পড়িল। পড়িল না হায়! অবগুণ্ঠন-বেষ্টিত লজ্জাবন্তী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত বলি বলি করিয়া বলা হইল না এরূপ উৎকণ্ঠা-বিশিষ্ট পবিত্র অশ্রুসিক্ত এক খানি মুখ এবার আর দরজার পার্শ্ব হইতে সেরূপ প্রেমপূর্ণ ভাবে উকি মারিল না। বড়ই সাধে গৃহ ভিত্তির মধ্যে নন্দন প্রতিষ্ঠার-সুখ কল্পনা করিয়া ছিলাম, বাগান শুখাইয়াছে। আমার চক্ষে আমি মরিয়াছি। খালি বিষের জ্বালা, মর্ম্মপীড়া শ্মশানের কোলাহল সেখানে রাখিয়া আমি বিদায় হইলাম।

সময়ের মত উপযুক্ত—নিদান-পারদর্শী চিকিৎসক দেখাইয়াছ কি? কার্য্যময় জীবনের মত শোকার্ত্ত রোগীর পক্ষে ফলপ্রদ ঔষধ কখন দেখিয়াছ কি? সময় ও সরকারি কার্য্য—কাল-ধর্ম্মে আমার শোক কমাইয়া আনিল। ঝটিকার পর মহাসাগর বাহির হইতে যেরূপ স্থির হয়—অথচ ভিতরে ভিতরে দুই তার একটা কলপ্লাবী চাঞ্চল্য আদ্যোপান্ত বিরাজ করিতে থাকে—আমার হৃদয়ের অবস্থা সেইরূপই হইল। সব গেল—একটা কিসের দুরপনেয় কৃষ্ণবর্ণ দাগ হৃদয়ের এক নিভৃততম কক্ষে বসিয়া গেল—তাহা আর মুছিত না। সেই সুদূর প্রবাসে, যখন—ঝুপ ঝাপ করিয়া গভীর নিশীথে বর্ষার ধারা পড়িত —আকাশে মেঘ করিয়া সূর্য্যকে ডুবাইয়া দিত—ঝড় আসিয়া প্রকৃতির গাছ-পালা ভাঙ্গিত, নির্জ্জনতা আমার চারি পার্শ্ব অধিকার করিত, তখন কি জানি কি একটা করুণ কাহিনীময় অতীত স্মৃতি আসিয়া—আমার সেই পাষাণীভূত হৃদয় হইতে দুই চারি ফোঁটা নীরব অশ্রু আমার চক্ষুঃ প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিত।

আমার এখন পদোন্নতি হইয়াছে। পঁচিশ টাকা বেতনে ঢুকিয়াছিলাম, এখন আড়াই শত পাইতেছি। এ দিকেও যেমন একটা শূন্য বাড়িয়াছে—ওদিকেও নীচে সেরূপ শূন্য দেখিতেছি। আমি মিরাটে ছিলাম। পবলিকওয়ার্কে কাজ করিতাম। আজ পাঁচ মাস হইল, বাবু নৃসিংহ-প্রসাদ দত্ত নামে আমাদের এক হেড একাউণ্ট্যাণ্ট আসিয়াছেন। তিনি

সৎকায়স্থ-কুলোদ্ভব—সদাশয়—প্রবীণ, বহুদর্শী। আজ-কাল্‌কার সংসারের সাধারণ লোক হইতে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমার বেতন-বৃদ্ধি নৃসিংহ বাবুর জন্য। তিনি আমায় বড় স্নেহ-মমতা করিতেন। লোকে ইহার মধ্যে অন্য এক উদ্দেশ্য কল্পনা করিত। পাঁচ জনে কানাকানি করিত—নৃসিংহ বাবু আমায় জামাতৃ-পদে বরণ করিবেন। এক দিন আমাকেও তিনি অতি সঙ্কুচিত ভাবে এ কথার আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ভাব-গতিক দেখিয়া নিরস্ত হন। সুকুমারী—আজ দেড় বৎসর হইল, সংসার ছাড়িয়াছে। ছি! ছি! আমার মুখে এ কথা শুনিয়া—হে নিস্বার্থ-প্রেমিক পাঠক, সরল-হৃদয়া বালিকা কতই না কি মনে করিতেন।

নৃসিংহ বাবুর কন্যাকে আমি দেখিয়াছি। শতাধিক সুন্দরের মধ্যে অমন একটী সুন্দর মেয়ে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাতে আমার! কি? জগতের সহিত আমার আর কোন সম্পর্কই নাই। এ বিষয়ের কল্পনাও মহাপাপ। কথাটী ভাবিলেই—সুকুমারীর সেই সরল কটাক্ষ যেন আজও ভ্রূকুটি করিয়া সম্মুখে আসিয়া বলে—ছি! ছি! অবিশ্বাসী তোমার এই কাজ!

আজ নৃসিংহ বাবুর বাটীতে আমার নিমন্ত্রণ। তিনি পাঁচ মাস আসিয়াছেন; তাঁহার বাড়ীতে কখন খাই নাই। আজ প্রথম খাইব। নিমন্ত্রণে গেলাম। তিনি ও আমি দুজনে একত্র আহারাদি করিলাম। আহারের সময় আকাশে মেঘ উঠিল–বিদ্যুৎ চমকিল—জোরে বাতাস বহিল—বাতাসের সঙ্গে ঘরের দোর জানালা গুলি ঝটাপট্‌ শব্দ আরম্ভ করিল। নৃসিংহ বাবু সস্নেহে বলিলেন—"যোগেশ! আজ আর তোমার বাসায় যাওয়া হইবে না। আজ এখানেই থাক।" অগত্যা তাই হইল।

তাঁহার উপরে মোটে চারিটী ঘর। একটীতে বাবু—অপরটীতে কন্যা ও আর একটীতে পরিজন থাকেন। তৃতীয় কক্ষ—এক বৃদ্ধার অধিকারে। সর্ব্বশেষেরটী আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। দ্বার বন্ধ করিলে এটা সকলের হইতে পৃথক্‌।

বিছানায় শুইলাম। আকাশ-পাতাল ভাবনা। সেই সব প্রাচীন কথা মনে উঠিতেছে। বাহিরে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। আর, হৃদয়ে

মহাঝটিকার পূর্ব্ব-সঞ্চার। কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। শেষে তন্দ্রাভিভূত হইলাম।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম, সুকুমারী যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে আমার গায়ে তাহার সেই পদ্ম-হস্ত বুলাইতেছে। তাহার হস্তস্পর্শে—মস্তিষ্কের ঘোর যাতনা—প্রাণের জ্বলন্ত জ্বালা কোথায়পালাইতেছে। সুকুমারী যেন বলিতেছে—"আর ভাবিও না। ছি! এই দেখ—আমি তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিলাম না। এত দিন ছিলাম, আর পারিলাম না। তুমি আমার জন্য অনেক কাঁদিয়াছ। ছি! একটা ছার রমণীর জন্য এতটা কেন? তুমি ইচ্ছা করিলে, আমার ন্যায় রূপে গুণে শত শত কিঙ্করী পাইতে পার!" সুকুমারী আরও যেন জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়াছে। সে জ্যোতিঃ—সে রূপ—যেন এখানকার নয়। সে এখন দেব-বালা।

সুকুমারী আবার বলিতে লাগিল—"আমি তোমায় দেখা দিব। কিন্তু আমার জন্য তুমি হৃদয়ের সুখ হারাইও না। সংসারে অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। একটা ছার রমণীর জন্য এখন কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইও না। বিবাহ কর—সংসারী হও। আমি—"সুকুমারী আর বলিতে পারিল না। তাহার সেই রক্তোৎপল-বিনিন্দী দেবী-চক্ষে দুই চারি বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেই স্বর্গের কয়টা অশ্রু-বিন্দু আমার উত্তপ্ত কপালে পতিত হইল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। বলিলাম "ছি! সুকুমারী! এখন আর কাঁদিও না। এখন তুমি স্বর্গের দেবী। স্বর্গে কি কান্না আছে?"

স্বপ্ন ভাঙ্গিল। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! হায় হায়—স্বপ্ন কেন চিরস্থায়ী হয় না! দিবারাত্রি কেন স্বপ্ন দেখি না! কাজ-কর্ম্ম, সংসার, কর্ত্তব্য সব ডুবিয়া যাক্ না কেন? হায় হায়—সুখের স্বপ্নই কেন আমায় অবলম্বন করিয়া থাকে না?

চক্ষু চাহিলাম। তখনও নিদ্রার ঘোর। কিন্তু সেই অস্পষ্ট-দীপালোকে দেখিলাম, এক রমণী মূর্ত্তি—ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমার আর তখন স্বপ্নের ঘোর নাই। জাগ্রৎ-পরিস্ফুট জ্বলন্ত

সত্য। আমার নিজের জ্ঞান-শক্তিকে—স্মরণ-শক্তিকে অবিশ্বাস করিবার কিছুই কারণ নাই। অদ্ভুত স্বপ্ন! স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ হয়? কপালে হাত দিয়া দেখিলাম—আর্দ্র—সিক্ত। গায়ে হাত দিলাম—ঘর্ম্ম-বিন্দু মাত্র নাই। কি বিভীষিকা! সত্যই কি সুকুমারী, স্বপ্নে এখানে আসিয়াছিল? সেই রোগ, শোক, দ্বেষ, হিংসা, কোলাহল ও ক্লান্তি বিরহিত রাজ্য হইতে স্বর্গের দেবী কি সত্য সত্যই আমার কাছে আসিয়াছিল?

ঘরের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত। সেই ছায়াময় দেহ-সেই দ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল। আমি সলম্ফে শয্যা ত্যাগ করিলাম। দ্বার হইতে বাহির হইলেই দালান। আমি নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়াইলাম। দালান অন্ধকারময়; কিন্তু অস্ফুট চন্দ্রালোক, তাহাতে অল্প আলো আনিয়াছে। আমি দেখিলাম-সিঁড়ি দিয়া সেই দেবী-প্রতিমা অতি দ্রুত নামিয়া যাইতেছে। আমি সোপান-শ্রেণী নিঃশব্দে অতিক্রম করিলাম। খিড়কীর দরজা খুলিয়া সে মূর্ত্তি, পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র উদ্যানে প্রবেশ করিল। আমি নিঃশব্দে অনুসন্ধান করিলাম। সে মূর্ত্তি, ধীরে ধীরে গিয়া এক আম্র-বৃক্ষের ঝোপের মধ্যে লুকাইল। আমি ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হইলাম।

দেখিলাম—সেই আম্রবৃক্ষের অন্ধকার-ছায়ায় এক শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। আমি সন্দেহে-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—দেবী! কে তুমি! যেই হও না কেন—কথা কহিয়া তোমার সজীবতা প্রমাণ কর। আমি হতভাগ্য—আমি তোমার অনুসরণে অন্যায় কাজ করিয়াছি।

আর বলিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে সেই খানে বসিয়া পড়িলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল। সহসা সেখানে মূর্চ্ছিত হইলাম। বোধ হইল, কে যেন ধীরে ধীরে আমার মাথা ক্রোড়-দেশে লইয়া বসিল।

(৬)

যখন চেতনা হইল, দেখিলাম,—নৃসিংহ বাবুর উপরের ঘরে একটী বিছানায় শুইয়া রহিয়াছি। কাছে নৃসিংহ বাবু বসিয়া আছেন। তাঁহার স্ত্রী বসিয়া বাতাস করিতেছেন। কন্যাটী নীচে বসিয়া কি একটা তরল দ্রব্য ছাঁকিতেছে। সকলকে দেখিলাম,—কিন্তু সে নাই। স্বপ্ন—নিশ্চয়ই

এ স্বপ্ন। আমার তখন শরীর বেশ সুস্থ। আস্তে আস্তে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম।

নৃসিংহ বাবু আমায় সুস্থ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী, সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। খালি তাঁহার কন্যাটী বসিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"বাসায় যাইব মহাশয়! অনর্থক আপনাদিগকে কষ্ট দিয়াছি। আজ বাসায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

বাবু, তিরস্কার-পূর্ণ একটী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে যেন প্রকাশ পাইল—তিনি যেন আমার কথায় একটু রুষ্ট হইয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"যোগেশ! হয় তো তুমি পর ভাবিয়া এত সঙ্কুচিত হইতেছ। কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না যে, আমি তোমায় সন্তানের মত স্নেহ করি। আমার ইচ্ছা, তুমি বাসা তুলিয়া দিয়া আমার এখানেই থাক।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—"আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। আপনার আদেশই প্রতিপালিত হইবে।"

(৭)

সেদিন আর আপিসে গেলাম না। যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেই খানেই খানিক ঘুমাইয়া কতকগুলি যে খপরের কাগজ পড়িয়াছিল, তাহাতেই কতকটা সময় কাটিল। রাত্রিতে অনেক ক্ষণ ধরিয়া বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইল। আমি শয়ন করিলাম।

কালকের ঘটনা মনে জাগিতেছে। আজ ইচ্ছা করিয়া দ্বার খুলিয়া শুইলাম।

আবার ঘুম—আবার সেই স্বপ্ন। আবার সেই সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে আমার সুকুমারী। আমি চীৎকার করিলাম না, ব্যাকুলতা দেখাইলাম না, কথাটী পর্য্যন্ত কহিলাম না—তখনও আমার গায়ে কাহার কোমল হাত খানি, ধীরে ধীরে পুষ্পময় প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে।

চক্ষু উন্মীলন করিলাম। আলো জালিয়া রাখিয়াছিলাম। কে তখন নিবাইয়া দিয়াছে। ঘর অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার ঘরে আমার পাশে কে বসিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতেছে। তাহার মৃদু নিশ্বাস,

আহা! যেন কতই সুগন্ধ-মাখা ধীর মলয় সমীরের ন্যায় একটু একটু থাকিয়া থাকিয়া বহিতেছে।

আমি একটু বেশী সাহস সহকারে বলিলাম—"দেবী! কে তুমি? তুমি সত্যই যদি আমার সুকুমারী হও—আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। আর বেশী ভাবাইও না। ইহার পরের অবস্থা—উন্মত্ততা। যেই হও—কে তুমি কথা কহিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।

কত কোমল, কত মধুর—কত ভালাবাসা-মাখা কথায় সেই অন্ধকার-বেষ্টিতা অদৃশ্য মূর্ত্তি বলিল—"চুপ কর। আস্তে কথা কও। আমি—আমি—তোমার হতভাগিনী—সুকুমারী।—আমি মরি নাই।"

আমার শরীরে তখনই একটা ভীষণ তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আমি উঠিয়া বসিলাম। সেই পার্শ্বস্থা মূর্ত্তির হাত দুখানি একটু জোরে ধরিলাম। যেন না পালায়। বলিলাম"সুকু! তুমি! তুমি! না—না—স্বপ্ন—আমার মনের বিকার। তুমি সুকুমারী-হইতে পার-কিন্তু এখন আর এ পৃথিবীর নও। নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে আসিয়াছ। আমায় ছলনা করিতেছ। চল, আমায় স্বর্গে লইয়া চল। দুজনে বড় সুখে থাকিব।"

সহসা সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। সেই অন্ধকার-বেষ্টিতা মূর্ত্তি আমার মুখে হাত দিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিল। দুই চারি মিনিট কাটিল। তাহার পর দেখিলাম, আমার হাতে এক খানি কাগজ দিয়া—সে মূর্ত্তি অন্ধকারে মিশিয়া গেল। যাইবার সময় অস্ফুট স্বরে বলিয়া গেল—"সব ঘটনা কাল্‌ পিতার মুখে শুনিবে। নৃসিংহ বাবুকে আমি পিতৃ-সম্বোধন করি।"

মূর্ত্তি চলিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত ও নিশ্চল ভাবে বিছানায় পড়িয়া—কত কি মাথা মুণ্ডু ছাই ভস্ম ভাবিলাম। তার পর উঠিয়া আলো জ্বালিলাম। আলো জ্বালিয়া কম্পিত হস্তে কাগজ খানি দীপালোকে ধরিলাম। যাহা দেখিলাম—যাহা পড়িলাম—রাগে, দ্বেষে, ঘৃণায়—মর্ম্ম-পীড়ায়—তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শয়ন করিলাম। ঘুম আর হইল না। ঘড়ির আওয়াজ শুনিতে শুনিতে রাত্‌ কাটাইলাম। অমন ভীষণ রাত্রি আর কখন আসিবে না।

(৮)

প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলাম। মন শূন্য—ধূ ধূ করিতেছে। কি এক জাগ্রৎ, প্রত্যক্ষ সত্য স্বপ্ন আমার মস্তিষ্কটাকে একবারে পিষিয়া ফেলিয়াছে। নৃসিংহ বাবু আসিলেন। কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম "ভাল আছি।"

সেদিন বাবু আপিসে গেলেন না। মধ্যাহ্নে আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন. "যোগেশ! তোমার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে।"

আমার মন আবার সেই গত রাত্রির কথায় কেমন চঞ্চল হইল। বাবু বলিতে লাগিলেন। আজ প্রায়—দেড় বৎসরের কথা—আমি—মামুদপুরে আমার শশুরবাড়ী হইতে স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকা যোগে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। তখন সকাল হইয়াছে। দেখিলাম, জলে কি একটা সাদা কাপড়ের মত ফুলিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আমি মাঝীদিগকে বলিলাম—দেখ! ওটা কি ভাসিয়া যায়। মাঝীরা ধরিয়া তুলিল। দেখিলাম, রমণীর দেহ।

সেইখানে তখনই কিনারায় নৌকা ভিড়াইলাম। নিকটের গ্রাম হইতে এক জন ডাক্তার আনাইয়া স্ত্রীলোকটির চেতনার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম। প্রথমে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। শেষে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিল।

স্ত্রীলোকটী অচেতন। আমি কলিকাতায় যাইয়া আবার তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। সে রক্ষা পাইল।

তাহার মুখে তাহার পরিচয়ের অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে বলিল না। বাড়ীর মেয়েদের সাক্ষাতেও বলিল না। আমি কন্যাবৎ স্নেহের সহিত তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিলাম।

আজ আমার বাড়ীতে সে সাত মাস রহিয়াছে। কিন্তু কাল সবেমাত্র তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমার স্ত্রীর নিকট সে সবই বলিয়াছে। তাহার নাম সুকুমারী দাসী। সে কুসুমপুরের রায় বাবুদের বাটীর কন্যা, তোমার পরিণীতা স্ত্রী। তুমি তাহাকে এত দিন সত্যই জানিতে না।

বাবা! আমি তোমায় জামাতা করিব, ভাবিয়াছিলাম। তুমি এক্ষণে আমার কন্যাস্থানীয়া সুকুমারীর সম্পর্কে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা। আমি আজ যে আনন্দ পাইলাম, তাহা একা ভোগ করিবার নহে। তুমি চিরসুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি।

উদারপ্রকৃতি নৃসিংহ বাবুর কথা শেষ না হইতে আমি তাঁহার পায়ে গড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—"আপনি পিতৃতুল্য, অন্নদাতা—আপনার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।"

গত রাত্রিতে যে কাগজ খানি মুড়িয়া সুড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আজ সেখানি অনেক যত্নে কুড়াইয়া লইয়া নৃসিংহ বাবুর হাতে দিলাম।

তিনি পড়িয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"বাবা! যোগেশ, তোমার মাকে এ আনন্দের সংবাদ দিয়া আসি।"

পত্রে সুকুমারীর হাতে লেখা ছিল—"প্রাণাধিক! আমার অনুরোধ. তুমি নৃসিংহ বাবুর কন্যা ইন্দিরাকে বিবাহ কর। এখন অমত করিতে পার—কিন্তু কাল সব কথা শুনিলে আর কিছুই বলিতে চাহিবে না। তিনি আমার জীবন দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, তোমায় জামাতা করেন। ইন্দিরা আমার কনিষ্ঠা ভগিনী। দুজনে বড় সুখে থাকিব"। লজ্জার কথা—বলিব কি—মাস খানেকের মধ্যে ইন্দিরা আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইল। সুকুমারী, বিবাহের অনেক আগে আমার বাসায় আসিয়া পাকা গৃহিণীর ন্যায় সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিল। পরিশেষে নিজে বরণ করিয়া নূতন বধূ ঘরে তুলিল।

তার পর কত বৎসর কাটিয়াছে। এখন আমি চাকরি ছাড়িয়া কলিকাতায় আছি। বেশ চলিতেছে। দুই গৃহিণী লইয়া যেরূপ সুখে ও শান্তিতে কাটাইতেছি—অনেকে এক গৃহিণীতেও সে সুখ-শান্তি-শৃঙ্খলা চলে না। একথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি।

তোমাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল না কেন? কিন্তু ইন্দিরা ও সুকুমারী যেন এক বৃক্ষে দুইটী ফুল। একটী কমলা, অপরটী বাণী। একটী বসন্তের চঞ্চল শোভা, অপরটী শরতের স্থির গম্ভীর মনঃপ্রাণহারিণী জ্যোতিঃ। একটী বিদ্যুৎ অপরটী স্থির পবিত্র-জ্যোতিঃ চন্দ্রিকা। একে বাসন্তী লতার সৌরভ—অপরে মাধবীর কোমলতা। জানি না—বিধাতা কেন এ অভাগার জন্য এত সুখ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কেন?

যামিনী এসেছ কেন?
ভাবিতে কি ভাবাতে?
কামিনী এসেছ কেন?
মজিতে কি মজাতে?
দামিনী এসেছ কেন?
জ্বলিতে কি জ্বালাতে?
তটিনী বহেছ কেন?
ভাসিতে কি ভাসাতে?
বসন্ত এসেছ কেন?
সাধিতে কি সাধাতে?
বরষা এসেছ কেন?
কাঁদিতে কি কাঁদাতে?
কোকিল ডেকেছ কেন?
পুড়িতে কি পোড়াতে?
বকুল ফুটেছ কেন?
মরিতে কি মারিতে?
চন্দ্রমা উঠেছ কেন?
হাসিতে কি হাসাতে?
তারকা ফুটেছ কেন?
দেখিতে কি দেখাতে?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

বৃথা আশা।

মিছে জগতের আশা, স্নেহ আর ভালবাসা,
মিছে হায়! প্রাণের বাসনা।
সমীরে সমীরে খেলা, সলিলের মহামেলা,
সব এবে মুহূর্ত্ত বাসনা॥

এত যতনের দেহ, যতন করে বা কেহ,
শব নাম সকলে ধরিবে।
প্রিয় সুত যারা সব, দেখে দেখে তারা সব,
সকলেই সরিয়া পড়িবে॥
চড়াইবে চিতানলে, হু-হু শেষে যাবে জ্বলে,
ভস্মমাত্র রবে পড়ি তার।
পঞ্চ ভূতে মিশাইবে, চিহ্নমাত্র নাহি রবে,
কেহ তারে স্মরিবে না আর॥
জীবনের শেষ দিন, কাল-স্রোতে হয় লীন,
শেষ হয় জীবন-সংগ্রাম।
অস্থায়ী জীবের গতি, আত্মীয়েতে করে গতি,
মানবের শেষ পরিণাম॥
ধীরে ধীরে যায় দিন, ক্রমে হয় আয়ু ক্ষীণ,
শেষে ক্রমে জীবন ফুরায়।
সুখের শৈশব কাল, ঠিক্ তরঙ্গের থাল,
সতত চঞ্চল যেন হায়॥
ছায়ামাত্র এ জীবনে, শুধু রে জগৎ-সনে,
জীবন যে নিশার স্বপন।
ভাঙ্গিয়া সে কু-স্বপন, বারেক কর স্মরণ,
কোথা রবে সাধের ভবন॥
এবে কেন বল তবে, "আমার" "আমার" সবে,
খালি হাট কর বেচা-কেনা।
দু-দিনের আগমন, চখে চখে সুমিলন,
প্রাণে প্রাণে নাহি হয় চেনা॥
মহাযাত্রা মহাকালে, একা তুমি যাবে চলে,
কে তোমার হবে হে সহায়।
ভবে একা এসেছিলে, একাই যাইবে মিলে,
কেঁদে শেষে লইয়া বিদায়॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ঐতিহাসিক পরিভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

সাহিত্য-পরিষদের বিগত মাঘ মাসের অধিবেশনে আমরা যে প্রস্তাব করি, তাহা পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইল। এ বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। ইতিহাসের বিবিধ দুর্গতি-দর্শনে আমরা ইতিহাসের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতিহাস-প্রিয় লোকের এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পত্র খানি এই,——

"সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু।

"মানাস্পদেষু

"সাহিত্য-পরিষদে ভূগোল পুস্তকের পারিভাষিক শব্দের আলোচনা চলিতেছে। ইতিহাস-সম্বন্ধেও ঐ রূপ হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভৌগোলিক পরিভাষা সমাধা করিতে যত অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইবে, মৎ-প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে তাদৃশ অসুবিধা ঘটিবে না।

"পরিষদ্, বিদ্বন্মণ্ডলী লইয়া গঠিত। বিশেষতঃ পরিষদের দুই জন প্রধান কর্ম্মচারী, দুই প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক। তদ্ভিন্ন সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটীর ক্ষমতাবান্ অন্যতম সদস্য মানাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সুশিক্ষিত সুধীগণ এই সমিতির সভ্য; অতএব এখানে আমার প্রস্তাবের সুমীমাংসারই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আমার প্রস্তাব এই,——

'ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তক-বিশেষ পাঠ্য নয়। পরীক্ষক মহাশয় কোন্ পুস্তক হইতে পরীক্ষা করিবেন, তাহারাও ঠিকানা নাই। অথচ নানা পুস্তকে মুসলমান সম্রাট্‌দের নাম ভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতাদিগকে কষ্টে পড়িতে হয়। একই নামের বানান, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রদত্ত হইল।

১। আলতমস, আলতামস, আলটামাস, আলটমাস, ইলতমস।

২। আকবর, আকবর সা।

৩। আরাম, আরাম সা।

৪। আরঙ্গজীব, আওরঙ্গজেব, আরঙ্গেব, আরংজীব, আরাঞ্জিব।

৫। আবু বৌকর, আবু বকর, আবুবেকের।

৬। এব্রাহিম, ইব্রাহিম।

০৭। কুতবুদ্দীন, কুতবউদ্দিন, কুতুবুদ্দিন।

৮। খিজার খাঁ, খিজির খাঁ।

০৯। গয়স উদ্দীন তোগলক, গিয়াস উদ্দীন টোগলক, গীয়াসুদ্দীন তগলক, গিয়াসুদ্দিন।

১০। জলাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ, জেলাল উদ্দিন, জেলালুদ্দিন।

১১। তোগলক বংশ, তগলক বংশ, টোগলক বংশ, তুগলক বংশ।

০১২। নাসির উদ্দিন, নাজির উদ্দিন, নাজীর উদ্দিন, নাসিরুদ্দিন।

০১৩। নুরজাহান, নুরজিহান, মহরল নেসা।

১৪। বহলোল লোদী, বিলোল লোদী, বিলোলি লোদি।

০১৫। বহরাম, বেহরাম, বেরাম, বৈরাম, রহরম সা, বেহ্রাম।

১৬। বুলবন, বুলবন্, বোলবন্।

১৭। মোবারক, মুবারক।

০১৮। রুকন উদ্দীন, রুকণুদ্দীন, রুকনুদ্দিন।

০১৯। লোদি বংশ, লোদী বংশ, লোডি বংশ, লোডী বংশ।

২০। ফেরোজ, ফিরোজ।

২১। হুময়ুন, হুমায়ুন, হোমায়ুন, হুমায়ুন।

০২২। রেজিয়া, রিজিয়া, রেজিয়া বেগম, সুলতান রিজিয়া, সুলতানা রিজিয়া।

০২৩। শূর বংশ, সুরবংশ।

০২৪। সের সা, সের শা, সেয়ার খাঁ।

২৫। সাহাজিহান, শাহাজহাঁ, সাজেহান, শাহজহান, সাজাহান।

২৬। জাহাঙ্গীর, জাহাঁগীর, জাহাঙ্গির, জহাঙ্গীর, জোহঙ্গীর।

২৭। মুসায়ুদ, মসায়ুদ, মসাউদ, মসুদ শা। ইত্যাদি।

এক ব্যক্তির নামের বর্ণ যোজনা ভিন্ন পুস্তকে এই রূপ অসদৃশ হ'লে সময়ে সময়ে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয় যে, ইলতমস ও আলতামাস ইত্যাদি এক ব্যক্তির নাম কি না। এতদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, বিদেশীয়

শব্দের বানান, তত্তাষার উচ্চারণের নিয়মানুসারে সমাহিত হওয়া সঙ্গত ও উচিত। অথবা এমন কোন সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হউক, যাহাতে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। এ বিষয়ে কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীতির অনুসরণ করিলে হয় না ? তথায় ভারতবর্ষীয় শব্দের বানান করিবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে।

'কোন কোন হিন্দু-নরপতির নামের বানানও সমান নয়। যেমন— শিলাদিত্য ও শীলাদিত্য, অনঙ্গ পাল ও আনন্দ পাল। শিলাদিত্য শব্দের বর্ণ-যোজনানুসারে অর্থেরও বৈলক্ষণ্য হয়। দীর্ঘ-ঈকার যুক্ত শীলাদিত্য শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। আনন্দপাল ও অনঙ্গ পাল—উভয় শব্দেরই অর্থ আছে। তবে কথা হইতেছে, আনন্দপাল নামটী প্রকৃত কি না।

'খৃষ্টাব্দ ও ঘটনাও সকল পুস্তকে সমান নাই। কোন কোন পুস্তকের মতে ৬২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেব জাত ; ৫৪৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পরলোকগত। অন্য পুস্তকে এ স্থলে ক্রমান্বয়ে ৫৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ও ৪৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে। অর্থাৎ ৫৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৪৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

'এক বুদ্ধদেব কত বার জন্ম পরিগ্রহ করেন ? আর তিনি কয় বারই বা স্বর্গে যান ?

'প্রথম মতের তাৎপর্য্য এই যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিরোভাব ঘটে। দ্বিতীয়-মতাবলম্বীদের মতে নিষ্কর্ষ এই হইতেছে যে, খৃষ্ট জাত হইবার পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দী, বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল এবং পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার দেহ নাশ হইয়াছিল। ফলতঃ, দেখিতে গেলে, উভয় মতে এক শতাব্দীর ব্যবধান। সূক্ষ্ম হিসাবে অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কালের তারতম্য রহিয়াছে। বিরোধীয় মতে অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর আর ষোড়শ বর্ষ সংযোগ করিলে ৬৬ ছষট্টি হয়। উভয়ের মধ্যে এই সুদীর্ঘ কালের বৈলক্ষণ্য। এই রূপ অনেক অনৈক্যই রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সমস্ত লিখিতে পারিলাম না। এখানে এক কথা বলা আবশ্যক, বুদ্ধদেব অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়া অসুত্যাগ করিয়াছিলেন, এই অংশে উভয় মতের পার্থক্য নাই।

'নানা কারণে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইল না। ইতি।

১৩০১ সাল, ১৭ই মাঘ।——নিবেদক——শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

কেশব একাডামি।"

পরিষদে ধার্য্য হয়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তালিকা প্রথমতঃ মুদ্রিত হইবে। সে তালিকা রাজেন্দ্রলাল মিত্রজের পত্রের সহিত উদ্ধৃত হইল।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহোদয় আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধরী এম, এ, মহাশয়কে এতদ্বিষয়ে লেখেন,——

"মদাত্মীয়েষু—

"গত বৈকালে আপনার ভারতবর্ষের ইতিহাস পাইয়া উপকৃত হইয়াছি এবং তদর্থ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহার গুণ-গরিমার বিষয়ে আপনাকে আমার মত জ্ঞাপন করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর সভাপতি। এই কমিটীর একটী নিয়ম এই যে, সভ্যেরা পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকের মাহাত্ম্য বিষয়ে কমিটী ভিন্ন অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না এবং আমি তাহার অধীন; পরন্তু আপনার পত্রে আমাকে গ্রন্থের ভ্রম দেখাইতে লিখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সম্প্রতি উক্ত কমিটীতে এক প্রস্তাব হইয়াছে যে, বিদেশীয় শব্দ সকল এক নিয়মে এবং প্রকৃত তজ্জাতীয় উচ্চারণের অনুকরণ করা হয়। সেই নিয়মটী কেহ প্রতিপালন করেন না এবং আপনার পুস্তকেও সেটী রক্ষা হয় নাই। পারসী নাম গুলি প্রায় সমস্তই অশুদ্ধ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমি যে কএকটী পত্র পড়িয়াছি, তাহা হইতে একটী তালিকা করিয়া পত্রস্থ করিলাম, দৃষ্টি করিবেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অন্তস্থ ব-কারের স্থানে ভ কার ব্যবহার করা অত্যন্ত মূর্খের চিহ্ন জ্ঞান করেন। তদ্বিষয়ে একটী গল্পও প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে, এক জন পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ অন্তস্থ বকার স্থানে ভকার ব্যবহার করায় লোকে তাহার উপহাস করিল। সে স্বয়ং কিছু বলিতে না পারিয়া

কালিদাসের সাহায্য চাহিল। কালিদাস অন্ত উপায় না পাইয়া তাহার পোষকতা এই শ্লোকে কহিলেন।

'কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
রাক্ষসানাং কুলশ্রেষ্ঠঃ রাভণো ন তু রাবণঃ॥'

"এতদ্দ্বারা ইংরাজি V স্থানে ভ ব্যবহার করা অত্যন্ত দূষণীয়। আদৌ অন্তাস্থ বকারের লোপ করিয়া পরে তাহার স্থানে ভ ব্যবহার পরামর্শ-সিদ্ধ নহে। ৩১ শে ডিসেম্বর * শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আলতামস	ইলতমস্	আকবর	অকবর
বায়রাম	বহরাম	জাহঙ্গীর	জহাঙ্গীর
মসায়ুদ	মুসায়ুদ	সাহজহাঁ	শাহজঁহা
বলবন	বুল্বন্	আরঙ্গিব	আওরঙ্গজেব
কাইকোবাদ	কৈকোবাদ	বাহাদুর সাহ	বাহাদুর শা
জেলাল উদ্দীন	জলাল উদ্দীন	জেহান্দর সাহ	জঁহাদর শা
আলাউদ্দীন	অলা	ফেরোক সের	ফর্রোখ [illegible]
মহম্মদ তোগলক	মুহম্মদ তুগলক্	রফিউদ্দরাজাৎ	রফি উদ্দর্জাৎ
ফৌরোজ সাহ	ফিরোজ শাহ	মহম্মদ সাহ	মুহম্মদ শাহ
আবু বাখর	আবু বকর	আহাম্মদ সাহ	অহম্মদ শাহ
হুমায়ুন	হুমায়ুন	লর্ড অকল্যাণ্ড	লর্ড অকলণ্ড
মামুদ	মহমুদ	লর্ড ডলহৌসি	লর্ড ডেলহৌসী
খিজির খাঁ	খিজর খাঁ	গন্তর সরকার	গণ্টুর সরকার
মোবারক	মুবারক্	পুলোপিনঙ	পুলোপেনাং
মহম্মদ	মুহম্মদ	দিন্দিগল	ডিণ্ডিগল
বেলোল	বহলোল	ধারাবার	ধারবার
ইব্রাহিম	ইব্রাহীম	আমেদাবাদ	অহম্মদাবাদ

* ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই পত্র লিখিত হয়।—সম্পাদক।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সের সাহ	শের শাহ	খান্দেশ	খান্দশ
আদিলী	No name; mere adjective	আজমীর	অজমীর
বুসি	বুষী	কঙ্কণ	কনখল
আলিগহর	অলীগৌহর	নবাব উজীর	In 1356 he was a King, not Vazir
ভাল্সিটার্ট	বাসিটার্ট	গন্দ	গোণ্ড
মিরজাফর	মীরজফর	মলবর	মলাবর
ভেলোর	বেলোর	সাহেব উদ্দীন	সিহাব উদ্দীন
সালাবৎ	সলাবৎ	গেলট	গেহলোট
মজফর	মুজফ্ফর	বাকট্রিয়া	বাকত্রিয়া
ডুপ্লে	হুপ্লে No (ড) d in French	বালথ	বল্থ
		চল	চোল
		সাহ always	শাহ

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম।

(সমালোচনা।)

এই পুস্তক শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত—কলিকাতা, ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্, বঙ্গবাসী মেসিন্ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য চারি আনা মাত্র। "বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর স্থান" এবং "উপন্যাসিক বঙ্কিম-চন্দ্র" শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া হারাণচন্দ্র বাবু দুইটী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই পুস্তক খানির আলোচনা "সাধনা" ও "শিক্ষা পরিচয়" এই দুই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সেই সমস্ত আলোচনা-সম্বন্ধে দুই এক

কথা বলিয়া তার পর আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। বর্ত্তমান পুস্তক "জন্মভূমিতে" প্রকাশিত "বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম" প্রস্তাবের পুনর্ম্মুদ্রন মাত্র। কচিৎ সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমেই আমরা একটী কথা বলিয়া লইতে চাই। দুইটী প্রবন্ধ একত্র মিলিত করা ভাল হয় নাই। স্বতন্ত্র রাখিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে দুইটীরই প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইত। দুই প্রবন্ধ মিলিত করায় দ্বিতীয় জরাসন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে।

'সাধনায়' সম্পাদক শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

"লেখক এই গ্রন্থে স্বহস্তে একটী উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়া আছেন এবং বঙ্কিমকে ও সেই সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যের আর কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাল ছেলেকে হাস্য মুখে ছোট বড় পারিতোষিক বিতরণ করিয়া লেখক,সাধারণকে পরম আপ্যায়িত এবং উৎসাহিত করিয়াছেন। লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি কাহাকেও খাতির করিয়া কথা কহেন নাই। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন— "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। * * * স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য (?) পরে কা কথা।"

"শুনিয়া ভয়ে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এত বড় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের নিকট সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তথাপি কর্ত্তব্যবোধে একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। বর্ত্তমান গ্রন্থকার, পাঠকদিগকে নিতান্ত যেন ঘরের ছেলে অথবা ইস্কুলের ছাত্রের মত দেখিয়া থাকেন। এক স্থলে শুদ্ধ মাত্র বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" গানটী তুলিয়া দিয়া লেখক প্রবীণ হেড্‌মাষ্টারের মত লিখিতেছেন "বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে?" তাহার পরে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্যটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লেখক নবীন রসিক পুরুষের মত বলিতেছেন—"কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে? আ মরি মরি! কি সুর রে!" পর পৃষ্ঠায় পুনশ্চ অতি পরিচিত কুটুম্বের মত পাঠকদের গায়ে পড়িয়া বলিতেছেন "আরোও শুনিবে? তবে শুন।"

এক স্থলে দামোদর বাবুর রচিত কপাল-কুণ্ডলার অনুবৃত্তিগ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখক, নখশরিহিতা প্রৌঢ়ার মত বলিতেছেন—"সে মৃণ্ময়ী আবার পুনর্জ্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পোড়া কপাল আর কি!" ভাষার এই সকল অশিষ্ট ভঙ্গীমা ভদ্র সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন-যোগ্য।

"গ্রন্থকার, বঙ্কিম-রচিত উপন্যাসের পাত্রগুলির মধ্যে কে কতটা পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অতি সূক্ষ্ম রূপে ওজন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা ও প্রসংশা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, সেই ওজন অনুসারে মডেলভগিনীকেও চন্দ্রশেখরের সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, এ কথা আমাদের সমালোচকদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্য-সমালোচনাকালে মনুসংহিতা আদর্শ নহে, মানব-সংহিতাই আদর্শ।" (১)

"সাধনার" এই আলোচনাটী সম্পাদকেরই লিখিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আর যদি অন্যের লেখা বলিয়া তর্ক করা যায়, তাহা হইলেও ইহাতে সম্পাদকের টীকা টীপ্পনী ও মতামত সংযুক্ত থাকা আবশ্যক ছিল। সাধনা-সম্পাদক শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। সুতরাং এখানে তিনি শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র রক্ষিতকে ঠিক্ ভাবে চিত্রিত করেন নাই। এই বার একে একে 'সাধনার' কথা খণ্ডন করিতেছি।

ক। হারাণচন্দ্র রক্ষিত বাবু যে উচ্চ মঞ্চ করিয়াছেন, তাহাতে রবি-কবিও স্থান পাইয়াছেন। তথাপি এত দুঃখ, এত আক্রোশ কেন? তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'কবীন্দ্র' 'উদীয়মান কবি' 'কবিপ্রবর' ইত্যাদি না লিখিয়া কেবল "কবি" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, রক্ষিতের এই প্রথম অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধ—"জন্মভূমিতে" "হাসি ও অশ্রু" কবিতা-পুস্তকের উল্লেখের সময় রবীন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান গীতিকাব্যের নেতা "সারদামঙ্গলের" মহাকবি বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ও তাঁহার দোষ ভাগের সাধারণতঃ নকলকারী বলা হইয়াছে। যথা—

(১) সাধনা, ১৩০২ সাল, আষাঢ়।

"'হাসি ও অশ্রু' যে ধরণের কবিতাপুস্তক, এ ধরণের কবিতার প্রবর্ত্তক ও নেতা "সারদামঙ্গলের" কবি ৺ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গুণভাগ ছাঁকিয়া লইয়াছেন—তাঁহার মেধাবী শিষ্য প্রতিভাবান্ বঙ্গের কৃতী কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সেই রবি কবির পাঠশালে এখন অনেকে হাতে খড়ি দিতেছেন; দুই এক জন নায়েকও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখ এই, "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়া পড়িতেছে। গুরুর গুণ বড় একটা কাহাতেও বর্ত্তিতেছে না,—দোষের ভাগ ষোল আনা সুদ-সমেত সকলে আদায় করিয়া বসিতেছেন। তাঁহাদের কবিতা পড়িতে অনেক সময় অরুচিকর বোধ হয়। দেখিয়া সুখী হইলাম, সরোজকুমারীর কবিতা তেমন হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ ও প্রাণহীন নহে।" (২)

খ। রক্ষিত মহাশয়, নির্ভীক ভাবে আপন মতামত বলিয়া যাইতেছেন, এই বিষয়টী যেখানে আছে, তাহা বেশ সুসংলগ্ন। সেই অংশটী এই,—

"আমি যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতে লোকের মুখের পানে না চাহিয়া, যথাসত্য প্রকাশ করিতে আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" (৩)

কিন্তু এই দোষালোচক মহাশয়, রক্ষিত-কৃত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার গুণ-বর্ণনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সেই নির্ভীকতার উল্লেখ করিয়া কি সুকৌশলই প্রদর্শন করিলেন! ১১ একাদশ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের ভাষা-বিষয়ে রক্ষিত বাবু, মতামত দিয়াছেন। আর ১২১ এক শত একুশ পৃষ্ঠায় যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। এই এক শত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মতটাকে ১১ একাদশ পৃষ্ঠায় লইয়া যোড়া দেওয়া হইল। অনুবৃত্তিটা পূর্ব্বের প্রসঙ্গ হইতেই হয়। এখানে পরবর্ত্তী পদার্থটা 'পরনিপাত' হইয়া পূর্ব্বে গিয়া বসিতেছে! মানব-সংহিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বটে।

সম্পাদক মহাশয় ষ্টার (তারক) চিহ্ন দিয়া কেন যে দুই ছত্র তুলিয়া দিলেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। বাদ দেওয়া অংশ এত অধিক নয় যে, স্থানাভাবে মুদ্রিত হইল না। ঐ স্থলটী তুলিয়া দেওয়ায় লেখকের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। সেই বাদ পড়া অংশ এই,—

(২) জন্মভূমি, ১৩০২ সাল, আষাঢ়।

(৩) বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ১২১-১২২ পৃষ্ঠা।

"অমন মধুময়ী ভাষাও যেন কেমন বিনাইয়া বিনাইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়।"

গ। তার পর শিক্ষকের ছাত্রদিগকে কবিত্ব বুঝানর মত প্রভৃতি ভাল হয় নাই বলিয়া সাধনায় যাহা লেখা হইয়াছে, আমরা সে মতের সহিত এক-মতাবলম্বী।

ঘ। "কবিত্ব কাহাকে বলে বুঝিলে" ইত্যাদি লেখায় রক্ষিত বাবুকে নবীন রসিক পুরুষ বলা হইয়াছে। ভাল জিজ্ঞাসা করি,—রস, কবিত্ব, রচনা-নৈপুণ্য, শিল্প-চাতুর্য্য বুঝিবে কে—ঐতিহাসিক, না পুরাতত্ত্ববিদ্? রসজ্ঞ লোক—ভাবুক জন, কবিরা বা সুসমালোচক সহৃদয় না হইলে কি আর কবিতার বা মনোহর বর্ণনায় রক্ষা আছে!

ঙ। কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ "মৃণ্ময়ী" রচিত হওয়ায় হারাণচন্দ্র "পোড়া কপাল আর কি!" লিখিয়াছেন। তদর্থে তাঁহার ঐ "ভাষার অশিষ্ট ভঙ্গিমা" হইয়াছে। ঐ ভঙ্গিমা "সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন-যোগ্য!" এ দিকে দোষদর্শী সাধনার লেখক, হারাণচন্দ্র রক্ষিতকে "নথ-পরিহিতা প্রৌঢ়া" বলিয়া খুব শিষ্ট আচারের পরিচয় দিয়াছেন!

চ। হিন্দুয়ানীর মাপানুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল পাত্রকেই হারাণ-চন্দ্র ওজন করিয়াছেন, কে বলিল? "চন্দ্রশেখর" নাকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চিত্র, তাই চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মডেল ভগিনীর রাধাশ্যামের চরিত্রের তুলনা হইয়াছে। আমরাও কি বলিতে পারি না—ব্রাহ্ম সমাজের মত-বিরুদ্ধ পদার্থমাত্রই "সাধনা"-সম্প্রদায়ের চক্ষুঃশূল। ও কথা বলিয়া তাঁহাদের জিতিবার কিছুই নাই। তাঁহারা যাহা যাহা বলেন বা লেখেন, সেই সকলেরই "মানব-সংহিতা আদর্শ"! কেন না, ব্রাহ্ম মত—ব্রাহ্ম সমাজই—"মানব-সংহিতা।"

রবীন্দ্রনাথ বাবু তো পুস্তক খানির কোথাও প্রশংসা করিবার কিছুই পান নাই। তবে তিনি স্বয়ং পরীক্ষক হইয়া কিরূপে হারাণচন্দ্র

বাবুকে পদক পাইবার যোগ্য পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? সাধনার একদেশদর্শিনী আলোচনাও, "বঙ্গ-সাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য"।

এই তো গেল "সাধনার" কথা। তার পর "শিক্ষা-পরিচয়ের" মতামত দেখা যাউক। "শিক্ষা-পরিচয়ের" (৪) সম্পাদক কতক কতক দোষ দেখাইয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত কোন কোন দোষ অনুমোদনীয় বটে, কিন্তু আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথাও কি গুণ দেখিতে পান নাই? ফলতঃ, আমরা "শিক্ষা-পরিচয়ের" কৃত বঙ্গ 'সাহিত্যে বঙ্কিমের এই সমালোচনা ও "অনুসন্ধানে" 'নব্য-বঙ্গের' সমালোচনা পাঠে সাধারণতঃ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহারই নাম স্বাধীন সমালোচনা। অনর্থক অমূলক নিন্দাবাদ বা স্তুতিবাদ—স্বাধীন সমালোচনার সংজ্ঞা পাইবার কোন মতেই অধিকারী হইতে পারে না।

হারাণচন্দ্র বাবু, বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর পুস্তক হইতে যে যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কেমন হইয়াছে, পাঠকের তদ্বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই দেখুন তাহার নমুনা,—

১। "বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে আমার—সেই মজুরদারীর ফল এই কয়েটা প্রবন্ধ। বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বন-ফুল দিয়া মাতৃ-পদে অঞ্জলি দিবে নাই। বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যত লিখুক না কেন,—সে মাতৃ-পদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি তো কুলী-মজুরের কাজ করিয়াছি, এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্ত্তা তো শুনিলাম না"।

বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর ঐ উক্তি খণ্ডন করিবার যো নাই। বৎসর কয়েক পরে উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিকের উৎকৃষ্ট ইতিহাস বাঙ্গালায় দেখিতে পাইব, এমন আশা করা যায়।

২। " "উত্তর-চরিতের" সমালোচনার পূর্ব্বে বিস্তৃত সমালোচনা কি রূপে করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা জানিত না;—বঙ্গদর্শনই প্রথম সেই

(৪) ১৩০২ সাল, আষাঢ় মাস।

পথ দেখাইল। বঙ্কিমের এই সমালোচনা-শক্তি, বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।"

উক্ত উক্তির সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্রও মত-বিরোধ নাই।

রক্ষিত বাবু স্থানে স্থানে নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট ভাষায় যে সকল সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহার ও কিছু কিছু প্রদর্শিত করা যাইতেছে।

৩। "জর্জ্জ ইলিয়টের গভীর-ভাব ও লিপি-কুশলতা, ভিক্টর হিউগোর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা, ডিকেন্‌সের সরস ও মর্ম্মস্পর্শী রসিকতা এবং স্কটের বৈচিত্র্যময় প্লট—এই চারি জনের কিছু কিছু বঙ্কিমের মধ্যে দেখিতে পাই; অথবা এই চারি জনের কিছু কিছু লইয়াই আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র। সুতরাং উপন্যাস-জগতে তিনি রাজ-রাজেশ্বর।"

৪। "এক বার যেন শুনিয়াছিলাম, কোন এক খানি পার্শী গ্রন্থে একটী গল্প আছে। এক লোকের ভাষার উপর প্রবল আধিপত্য জন্মিয়াছিল। ভাষা যেন লেখকের কিঙ্করী-বিশেষ ছিল। সেই লেখক, আত্ম-জীবন-বৃত্তান্তে লিখিতেছেন "আমি যখন লিখিতে বসি, তখন আমার চারি দিকে অপ্সরা-নিন্দিত নারী মূর্ত্তি বিবিধ কারু কার্য্য খচিত, নয়ন তৃপ্তি কর, মনোহর বসন ভূষণ পরিয়া মধুর নৃত্য করিতে থাকে এবং সাগ্রহে, উপযাচক ভাবে বলে, 'আমাকে গ্রহণ কর—আমাকে গ্রহণ কর।' ভাষা তখন আমার আজ্ঞাকারিণী কিঙ্করী হয়।" (ক)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দেখিয়া বিষয় বিচার করিয়া রক্ষিত লিখিতেছেন;—

৪। "কিন্তু এখানে একটী বিশেষ ভাবিবার বিষয় আছে। উপরে যে ভাবে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ করিলাম, তাহা কিন্তু ঠিক্ পর পর লেখা নয়। নিম্ন-লিখিত সময়ে বঙ্কিম নিম্নলিখিত উপন্যাস গুলি প্রণয়ন করেন।

(ক) "কনে বউ" সমালোচনা—"প্রতিমা", ১ম খণ্ড, ১১ শ সংখ্যা (১২৯৭ সাল, কাল্‌গুন মাস), ৪২৫ পৃষ্ঠা। এই অংশে "প্রতিমার" এই সমালোচনার কথা উল্লিখিত হইলে, ভাল হইত। মহাকবি কালিদাসের "অজবিলাপ" ও "রতিবিলাপ"-বিষয়িণী সমভাবাপন্না কবিতা উভয়ত্রই নিবদ্ধ আছে।

১৮৬২ খৃঃ অঃ দুর্গেশনন্দিনী।

১৮৬৭ খৃঃ অঃ কপালকুণ্ডলা।

১৮৭০ খৃঃ অঃ মৃণালিনী।

১৮৭৯ খৃঃ অঃ ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের আভির্ভাব হয়। বঙ্গ-দর্শনে বঙ্কিম বাবুর বাকী উপন্যাস গুলি, কোন খানি সম্পূর্ণ রূপে, কোন খানি অসম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়।

"কেবল মাত্র "সীতারাম" খানি "প্রচারে" এবং "দেবী চৌধুরাণী" খানি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৮ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দ-মঠ প্রকাশিত হয়। অতঃপর যথাসময়ে উপন্যাস গুলি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল।"

এই সংগ্রহটী ভাল হইয়াছে। এখানে "পুরোহিত" পত্রিকার নাম উল্লিখিত হইলে ভাল হইত। 'পুরোহিতে' উক্ত গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মতামত প্রকাশে হারাণ-চন্দ্র, কি নিজ মত ব্যক্ত করা কি অন্যের মত উদ্ধৃত করা—এই দুই বিষয়ে অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫।" সংসারের খুটী নাটী লইয়া চরিত্র-বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় বেগ পাইতে হয় না। এই সম্বন্ধে গত শ্রাবণ মাসের "নব্য-ভারতে" একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল। লেখক বলিতেছেন, "এই জন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকার রামায়ণ মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু কবির চেষ্টা, আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সহিত যুদ্ধে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু কবির প্রধান উদ্দেশ্য। * * * কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই এ রূপ আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। * * * পূর্ব্বকার কথা যাউক, আমাদের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গ-লতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মত আদর্শ চরিত্র চিত্র ও বিলাতী নবেলে পাওয়া

যায় না।" * লেখক এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য মনস্বী রাস্কিনের 'Queen's Garden" (৫) শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অন্য পরে কা কথা—

"বিলাতী কবি সেক্সপীয়র বা স্কট্ কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্রের সৃষ্টি করেন নাই। কয়েকটী বিলাতী আদর্শ নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র।" লেখক আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ (প্রথম কেন, প্রধান এবং একমাত্র কারণ বলিলেও দোষ হয় কি?) হিন্দুর ধর্ম্মভাব। * * * বাঙ্গালার প্রধান কবি, তাঁহার অতুল্য প্রতিভা বলে তাঁহার উপন্যাসে এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। * * * শুধু বাঙ্গালায় কেন জগতের সাহিত্য-মধ্যে এই উপন্যাস গুলি প্রচার হইবে, (আশা করা যায় সে দিন আসিতে বড় অধিক বিলম্ব নাই) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই সকল উপন্যাস সমস্ত জগৎ মধ্যে বিশেষ আদৃত হইবে এবং সে গুলি জগতের উপন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।"

"দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর যে কথা, আমাদেরও সেই কথা। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাস গুলি আমরা এত দূর সম্মানের চক্ষে দেখি।"

৬। "তাঁহার লক্ষ্য বড়—উচ্চ" মহান্। সমস্ত জগৎ যাহার আদর্শ লইয়া চলিতে পারে, প্রতিভাবান্ বঙ্কিম সেই রূপ সার্ব্বজনীন আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"

নিম্নে যে দুই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে নির্ভীক মত দেখিতেছি।

৭। "গল্পের "প্লট্" উদ্ভাবনে বঙ্কিমের তেমন কৃতিত্ব ছিল না।"

৮। "দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার লেখা, তাই এই দুই উপন্যাসের ভাষা তেমন মনোজ্ঞ নহে এবং কোন কোন স্থলে লিপিকুশলতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। মৃণালিনীতে এ ত্রুটি প্রায় নাই।"

---

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বাবু লিখিত বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব"। নব্য ভারত, দ্বাদশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

(৫) কুইন্‌স্ গার্ডেন্।

৯। "এমন অপূর্ব্ব ইতিহাস খানি কেন যে তিনি সৈয়র মুতক্ষ-রীনের ঝুটা ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিতে গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিনা।" রক্ষিতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তির পরিচয় স্থলে স্থলে পাইয়াছি। যথা—

১০। "উপন্যাসে গানের প্রচলন বঙ্কিম বাবুই প্রথম মৃণালিনীতে করেন।"

১১। "৺রাজকৃষ্ণ রায়কে আমি এখানে উদ্দেশ করিতেছি। বস্তুতঃ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রের গদ্য বর্ণনা ও কবি রাজকৃষ্ণের পদ্য বর্ণনা শক্তি আধুনিক বাঙ্গালায় অতুল্য।"

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রতি এই মতামত প্রকটিত দেখিয়া লেখকের হৃদয় অনুভব করা যায়। কৃতজ্ঞতা বা গুণগ্রাহিতা যে লেখকে না দেখিতে পাই, তাঁহার মত সঙ্কীর্ণ-মনাঃ ও সাহিত্যের ভীষণ বিপক্ষ আর কে আছে?

(ক্রমশঃ)।

সন্ধ্যা।

চুপি চুপি আসি, লম্পট শশী,
প্রকৃতি-প্রিয়ারে চুম্বিল।
প্রেমে মাতোয়ারা, আপনা-হারা,
প্রকৃতি-জোৎস্না হাসিল।
রসিক সমীর, হরষে অধীর,
চৌদিকে সে কথা কহিল।
ফুল মাখি যারা, আমোদেতে তারা,
হাসিয়া ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

এই সংখ্যায় শ্রাবণের তিন ফর্ম্মা দেওয়া গেল। বাকী তিন ফর্ম্মা ভাদ্রের সহিত প্রকাশিত হইবে।—প্রকাশক।

"অনুশীলনের" নিয়মাবলী।

১। "অনুশীলন" প্রতি মাসে, ডিমাই ৮ আট পেজী ৬ ছয় ফর্ম্মা ৪৮ আটচল্লিশ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হয়।

২। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, প্রত্নতত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পদ্য, জীবনচরিত, সমালোচনা, নানাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অনুশীলন, "অনুশীলনে" স্থান পাইবে।

৩। "অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধ, বিনিময় এবং সমালোচনের পুস্তক ও পত্রিকাদি, পাঠাইবার ঠিকানা ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরি"।

৪। টাকা, কড়ি ইত্যাদি ৪৯নং কিম্বার লেনস্থ "মোহন প্রেসে" শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাক মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

৬। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৭। বিজ্ঞাপন ছাপিবার নিয়ম— প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৪৯ নং কিম্বার লেন, কলুটোলা,—কলিকাতা।	গোবিন্দপ্রসাদ দে প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকাবলী—

১।	অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত	৸০
২।	প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত	।৶০
৩।	ব্যাকরণ প্রবেশিকা (৩য় সংস্করণ)	৵১০
৪।	হানিমানের জীবনী	।৶০
৫।	সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর	॥০
৬।	স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর	।০
৭।	ভূ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর	।০
৮।	বংশাবলী (যন্ত্রস্থ)	

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

১৩০২ সাল, শ্রাবণ—ভাদ্র।] [২য় ভাগ, ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা।

অনুশীলন ও পুরোহিত

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

সম্পাদক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কলিকাতা।

২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, "কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০২ সাল।

সংবাদপত্রের মতামত।

(1) "Anusilan—vol I, nos 1 and 2 (together)—"A literary journal conducted with ability. The numbers under notice contain some interesting articles, Viz, one on Budhistic Monastery at Howra and another on the history of amateur theatricals in Bengal."—Calcutta Gazette, 8th Sep, 1895.

(2) Anusilan and Purohit.—Vol II, no I.

"Devoted to literary criticism".—Calcutta Gazette, January 1st, 1896.

(3) "One of the objects of the Editor seems to be to develope the critical faculties of the young men under his educational charge, and hence perhaps the preponderance of literary and theatrical notices in the pages of the journal, under review. The Editor's own serial on the history of the Bengali stage, however a valuable contribution in the line. The present issue deals with the production of *Sarmistha* (শর্ম্মিষ্ঠা) on the board of the Belgachia stage. The other contributions of the Editor in this double number of the magazine, namely those headed "Khanakul-Krishnagar-Samaj" and *Bangsabali* promise valuable reading."—*Indian Mirror, Sep 15, 1895.*

(৪) "অনুশীলন—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত। বিদ্যানিধি মহাশয় সাময়িক-পত্র-জগতে সুপরিচিত ; সুতরাং 'অনুশীলন' যে সুপরিচালিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। 'অনুশীলনে' সকল বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি সুপাঠ্য ও সারগর্ভ। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃতিত্ব, তিনি সেই 'থোড় বড়ি খাঁড়া, খাড়া বড়ি থোড়' নামজাদা লেখকগণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ পুনঃ-প্রকাশে মনোযোগী না হইয়া কতকগুলি নূতন লেখক তৈয়ার করিতেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে সম্পাদক-গণের এরূপ চেষ্টা ভিন্ন উন্নতির আশা নাই।"

—হিতৈষী, ১৩০২ সাল, ১ম ভাগ, ৩০ সংখ্যা।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিবৃন্দ ও নব্য-কবিগণ।

অধুনা সাহিত্যজগতে, কবি ও কাব্যের কিছু অধিক প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে। সকলেই কাব্যরসাস্বাদনে লোলজিহ্ব। যিনি বাঙ্গালা কথা কহিতে শিখিয়াছেন, তিনিই অমিত্রাক্ষর, মিত্রাক্ষর প্রভৃতি নানা ছন্দে আপনার মনোভাব অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন। যাঁহারা ছন্দাদি শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ হইতে চাহেন না, তাঁহারা দেশী Tennyson এর মত সাদা কথায় সাদা ভাব (Commonplace ideas) প্রকাশ করিয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। আমাদের উক্তি সমর্থন করিবার জন্য একটী মাত্র উদাহরণ দিব। নিম্নলিখিত কবিতা কেমন (ভাবময় ?) দেখুন,—

"মাগো আমার লক্ষী, মনিষি না পক্ষী।"

এইরূপ যে কতশত (উদীয়মান !) কবি, কালের মাহাত্ম্যে আপনাদের কৃতিত্ব জাহির করিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা বর্ণনার অতীত। কতকগুলি কবি আছেন, যাঁহাদের ভাব ও ভাষা, চিন্তা-গভীরতা, সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির অপরিজ্ঞেয়। হয়তো, ভাব-বিকাশ (Inspiration) অন্তর্ধান হইলে, কবি নিজেই আপনার উক্তির অর্থ বোধ করিতে পারেন না।

যাহা হউক এ বিষয় আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। এই কবি-স্রোত কিন্তু আমি হংসপুচ্ছ পরিচালনে প্ররুদ্ধ করিতে পারিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উপযুক্ত রূপে চালিত হইলে এই স্রোতের মধ্যে দুই একটা উৎকৃষ্ট কাব্যও পাওয়া যাইতে পারে।

নব্য-কবিগণের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা খাঁদী কানীর প্রেমের বর্ণনায় বৃথা সময়াতিপাত না করিয়া, যদি সেই প্রেমময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায়, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস দুঃখীশ্যাম গোবিন্দদাস প্রভৃতি উপাসকের পদানুসরণ করেন, তাহা হইলে কাব্য-কাননে সুসৌরভ মনোহর কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত হইতে পারে। আর তাঁহারাও যশোদেবীর বরপুত্র হইতে পারেন। আমাদের এই আকাঙ্খা দু'এক জন পূরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে, রসিক লাল

দত্ত, আর্য্যাদর্শনে. "বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী" মুদ্রিত করিয়া আমাদের আশার সঞ্চার করিয়াছেন। নারাজোল ও মেদনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্র-লাল খাঁন মহাশয়ও "মান-মিলন" নামক গীতি-নাট্যে আপনার প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়,বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়া "মান" মালা সাধারণ্যে উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুস্তক সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইহাদের কবিগণের কৃতিত্ব নির্ব্বিরোধ ও স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণব কবিবৃন্দের পদানুসরণ করিলে যে অভিনব কবিগণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবেন,তাহার আলোচনা আমরা এই প্রস্তাবে করিব।

আধুনিক একজন কবি, (বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ) ঐ সকল পদাবলি হইতে ভাব সকলন করিয়া, নিজ ছন্দে ও ভাষায় "দান-লীলা" নামক এক খানি সুন্দর পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তিনি পুরাতন কবির গ্রন্থ হইতে ভাব সকলন করিয়া,কি রূপ পরিচ্ছদে ইহা সজ্জিত করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রাচীনও নব্য কবির রচনা পাশাপাশি সাজাইয়া তুলনা করিয়া দেখাইব। প্রাচীন কবির সহিত নব্য-কবির রচনা তুলনা করিয়া উভয়ের কৃতিত্ব প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

"গোবিন্দ-মঙ্গলে" ৺দুঃখীশ্যাম দাস "রাধা-কৃষ্ণ-মিলন-প্রসঙ্গে" যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইঃ—

"দেখনা কদম্বতলে শ্যাম রূপ হইয়া।
কত চাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়া॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া।
কস্তুরী তিলক কুলবতী কুল ছাড়া॥
কোন বিধি কত কালে নিরমিল তনু।
আঁখি ঠারে মুরছিত কত ফুলধনু॥
শ্রবণে মকর কড়ি গলে মণিহার।
অধরে অলপ হাসি অমিয়া পসার॥
কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর॥

চরণে বঙ্কিম রাজ নাচনিতে বাজে।
লাগি রহু দুঃখী শ্যাম চরণের মাঝে॥" ধ্রু॥

এক দিন ত্রিভঙ্গিম-ঠাম নটবর বনমালী, নব-রঙ্গে ত্রিভঙ্গে কদম্ব তরুতলে দণ্ডায়মান। এমন সময় বৃষভানুসুতা রাধিকা (প্রকৃতি) সখীগণ সাথে যমুনায় যাইতেছিলেন। মনে মনে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন বলিয়া ভক্ত-চূড়ামণি পথমাঝে ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়িয়া, কদম্ব-পাদপ-তলে দরশন দিলেন। রাধা (রাই) কানু রূপে মুগ্ধ হইয়া, যমুনার জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, বনমালী অন্তর্হিত হইলেন। রাধিকা সেই অবধি শয়নে স্বপনে কৃষ্ণ রূপ ধ্যান করিয়া উন্মাদিনী-প্রায় হইলেন। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু আর কি থাকিতে পারেন? তিনি রাধিকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বড়াইয়ের (বৃন্দার) সহিত পরামর্শ করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন—

"বড়াই!
কহিগো তোমার ঠাঁই, কি ক্ষণে দেখিনু রাই,
অখিল ভুবন অনুপমা।
কুরঙ্গ-নয়নী ধনী, ইঙ্গিতে পঞ্চম হানি,
মরমে মারিয়া গেল আমা॥

* * * *

রাধিকার অনুরাগে, অন্তরে অনল জাগে,
জগধে দারুণ কাম শরে।
তাহার বিরহে প্রাণ, রাখিতে নারিবে কান,
বলহ বড়াই, বুদ্ধি মোরে॥
আপনি করহ দয়া, রাধা দেহ মিলাইয়া,
বিনয় করিয়া বলি তোরে।
তোমা বিনু কেহ আর, না করিবে প্রতিকার,
রাধা দিয়া জীয়াও কানুরে॥"

"রাধা-কৃষ্ণ-মিলনে" বড়াই (বৃন্দা) প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিল। বনমালী তাহাকে উত্তর করিলেন :—

"রাধিকা বিহনে মোর প্রাণ নাহি রয়।
কহিও রাধারে মোর অনেক বিনয়॥
রাধা বিনু নয়নে না দেখি অন্য জনে।
রাধা নাম বিনে কিছু না শুনি শ্রবণে॥
রাধিকা বিহনে প্রাণ রাখিতে নারিব।
রাধা না পাইলে গো বৈরাগী হয়ে যা'ব॥"

কানুর এইরূপ অনুনয় বিনয়ে বৃন্দা শেষে সম্মত হইল। পুরুষ-প্রকৃতি (শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা) মিলনে যত্নবতী হইল।

এ ভক্তিতত্ত্বের,—রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এইরূপ আন্তরিক অনুরাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন:—

"ভাগবতকার সাধারণতঃ ব্রজগোপদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতে রাধিকার নাম গন্ধও নাই; সে আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারের সৃষ্টি। * * * বুঝিলে, (ব্রজলীলার) কথাটা আদৌ কদর্য্য নয়। কুমার সম্ভবের উমা যা, এই রাধাও তাই। ঈশ্বরানুসারিণী ঈশ্বরময়ী ঐশিক সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধা বহিঃপ্রকৃতি। ঈশ্বর জগতে এবং জগৎ ঈশ্বরে। প্রতি জড়পিণ্ডের প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর আছেন এবং প্রতি জড়পিণ্ডের প্রতি পরমাণু ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর জগতে রত, জগত ঈশ্বরে রত। রম+ক্ত=রত। তাই কৃষ্ণ রাধারমণ (রাধন, সাধনে প্রাপ্তৌ তোষে পূজনে। যিনি ঈশ্বর সাধিকা, ঈশ্বর প্রাপ্তা, ঈশ্বরে তুষ্টা, ঈশ্বর-পূজা-কারিণী, তিনি রাধা বা রাধিকা।) এই রাধা জগৎ। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জগদীশ্বর বলিলে যাহা বুঝায়, রাধানাথ বলিলে তাহাই বুঝায়। তবে রাধানাথের ভিতর একটা অনন্ত পবিত্র অনির্ব্বচনীয় প্রেম আছে, যাহা শুধু জগদীশ্বরে বুঝায় না।"

"প্রচার" নামক মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৪২১ পৃষ্ঠা হইতে ৪২৪ পৃষ্ঠায়) শ্রীহরিদাস বৈরাগী রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"ব্রজ গমনে। ব্রজ, অর্থাৎ যা' যায়। * * * * গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা'বার তাই জগৎ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, তাই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক। "বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্"। যে স্থানে বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবন। * * রাধা ষোড়শ নাম্নাং চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্। তস্যা ক্রীড়া বনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্। রাধাই বৃন্দা। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্তৌ, তোষে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে তাঁহাকে পায়, যে তাঁহাকে পূজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা। * * * গোপিনী শব্দ জয় না-গোপ শব্দ। গো শব্দে পৃথিবী। যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক। তাঁহারাই গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাঁহারা গোপী।"

বড়াই (বৃন্দা) শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। গিয়া দেখে, রাধিকার দশাও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ। তিনিও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনী-প্রায়। তখন বৃন্দা মনে মনে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণকে বলিল যে, তাঁহারা কৃষ্ণকে পুত্র রূপে পাইয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছেন, আর মথুরার হাটে দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা প্রভৃতি গো-রস বিকি-তরে (বিক্রয়ের জন্য) প্রেরণ করেন না বলিয়া, কংশরাজ বড় রুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"বিহানে কটক সাজ গোকুল বেড়িব।
গোপগণে মারি সব গোধন আনিব॥
বিকে যদি আইসে গোপী গো-রস লইয়া।
আনন্দে থাকুক, তবে না' যা'ব সাজিয়া॥"

কংশরাজের সে সময় অশেষ প্রতাপ। নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি তাঁর রোষের কথা শুনিয়া বড়ই শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, গোপীগণ মথুরার হাটে গো-রস বিক্রয়ার্থ যাইবে কিন্তু মন্দলোকে রমণীগণকে দেখিয়া মন্দ কথা বলিবে তাহার উপায় কি? বড়াই বলিল— "কংশরাজের যোগানে যাইব, তা'তে কেহ কথা কহিবে, এত সাধ্য কার?" তখন আয়ান ঘোষ রাধিকাকে বড়াইয়ের (বৃন্দার) হস্তে সঁপিয়া দিলেন; অন্যান্য গোপীগণেরও রক্ষক হইয়া বৃন্দা মথুরার হাটে যাইতে স্বীকৃতা হইল।

"গোপগণ বলে বড়াই ধরি তোর পায়।
তুমি সে রক্ষক হৈলে বিকে গোপী যায়॥

* * *

শুনিয়া সন্তুষ্ট গোপী যোগানের নামে।
আসিতে যাইতে পথে দেখিব সে শ্যামে॥

* * *

কহেন আয়ান ঘোষ ডাকিয়া বড়াই।
তোমারে স পিয়া দিনু বিনোদিনী রাই॥

* * *

বড়াই বলে রাধা মোর পরাণ পুতলি।
সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী॥"

সুচতুরা বৃন্দার (বড়াইয়ের) সুকৌশলে মথুরা যাত্রা স্থির হইলে রাধিকা এবং অন্যান্য গোপীগণ সকলেই আনন্দিতা হইলেন। পরে পসরা লইয়া মথুরা-যাত্রা পালা আরম্ভ হইল। পথে কদম্ব-পাদপ-মূলে শ্রীকৃষ্ণ মোহন-বেশে দণ্ডায়মান। গোপীগণ তথায় উপনীত হইবামাত্র তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া রাধার গমনে বাধা দিয়া বলিলেন :—

"আইস গো সুন্দরী রাধে শুন মোর বাণী।
কি পসরা মাথে তোর কোথারে সাজনি॥

* * *

শুন রাধে পথে মোর মহাদান লাগে।
পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে॥

ছল করিয়া বৃন্দা (বড়াই) জিজ্ঞাসা করিল—"কি দান চাই?" শ্রীকৃষ্ণ-তখন রাধিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্য-আস্যে দানের দাবী বর্ণন করিলেন।

* * *

তুমি নব যুবতী যুবতি শিরোমণি।
দৈত্যেরে দলিতে আমি দৈবকী কুমার।

নন্দ গৃহে স্থিতি মোর লীলার কারণে।
যত দৈত্য বধ কৈনু দেখিলে নয়নে॥

* * * *

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমার নিমিষে।
মোর বোলে রাত্রি দিন জলদ বরিষে॥

সুর মুনিগণ মোরে ধেয়ানে না পায়।
শুন রাধে হেন হরি তোরে প্রেম চায়॥"

গোবিন্দ দাস কৃত পদাবলীতেও "দানলীলা" অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত আছে।

"গোঠে গেল বিনোদিয়া, সকালে গোধন লইয়া,
দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান।
গুরু জন আঙ্গিনাতে, না পারিনু বাহির হৈতে,
না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান॥

কোন পথে গেল শ্যামরায়।

* * *

চল যাই সেই পথে, পসরা লইয়া মাথে,
যেখানে আছয়ে শ্যামরায়॥

* * *

ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই,
আমরা পুরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে,
সচেলে সিনান করি॥"

* * *

"এ গজগামিনী তু বড় সেয়ান।
বল ছলে বাঁচবি গিরিধর দান॥
চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।

দশনে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার।
অধরে কোরায়সি সুরঙ্গ পঙার ॥'

* * *

রাধা-মাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলা-রস দান ছলে।।"

"দানলীলার" ব্যাপারটী সাধারণের চক্ষে নূতন হইলেও, আমরা বলিতে পারি, উপরোক্ত গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ ও গোবিন্দদাস কৃত পদাবলীর সাহায্য লইয়াই সম্ভবতঃ, বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ "দানলীলা" রচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে সকল পুস্তক দেখিতে পাই, সে সকল পুস্তকে, বিস্তারিত রূপে এ দানলীলার ব্যাপারটী লিখিত হয় নাই। তবে চণ্ডীদাস কৃত পদাবলী হইতেও গ্রন্থকার অনেক স্থানে সাহায্য লইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। "সেই যমুনা কলকল—সেই রাধার আঁখি জল—সেই ব্রজের কেলিকুঞ্জ—অনুরাগিনী গোপি-পুঞ্জ—সেই বৃন্দার দূতীব্রত—সেই রসের সদাব্রত—সেই হাসির হেলাফেলা—সেই শ্যামের ছলা কলা—দানলীলার প্রেম খেলা—শ্যামের প্রেমে মোহন মেলা—সেই প্রেমের প্রস্রবণ—সেই মধুর সম্মিলন!"—সকলি সেই পুরাতন, তথাপিও যেন নূতন। সুতরাং "দানলীলা পুরাতন ভাব-কবিদিগের সুমধুর কৃষ্ণলীলানুসরণে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে গঠিত" এ কথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।

"দানলীলার" প্রস্তাবনার গীতটী বেশ ভাবপূর্ণ; এই জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

(প্রস্তাবনা গীত)

"মরি কি প্রেমের খেলা যাই বলিহারি।
কভু শ্যামা অসিধরা, কভু বাঁকা বংশীধারী ॥
বিবসনা কভু কটী,
কভু পরা পীত-ধটী
কেশ লটাপটী,

কভু চূড়া মনোহারী।
এ লীলা বুঝিতে নারি।
কভু মুখে অট্টহাসি,
অপাঙ্গে অনল রাশি,
মৃদু হাসি পরকাশি,
কভু আঁখি ঠারাঠারি।
মজাতে ব্রজের নারী॥

তার পর প্রথম অঙ্কে, প্রথম দৃশ্যে, বৃন্দার প্রথম গীত "কেটে সরমের ফাঁসি" বেশ কবিত্ব পূর্ণ। বৃন্দা কহিল—"দু'জনে দু'ধারে বসে, প্রাণে প্রাণে টানাটানি চলেছে, কিন্তু মাঝে অকুল পাথার বিষম বাধা, এ বাধা ঘুচাতে বৃন্দা ছাড়া আর কে পারে? দিবসে রাধা-কৃষ্ণের মিলন করাবই করা'ব; তবে আমার নাম বৃন্দা দূতী! এবার যে উপায় স্থির করেছি, এতে আয়ান ঘোষ, জটিলা ও কুটীলার চোখে ধুলো দেবই দেব।"

বৃন্দার এই উপক্রমণিকাতেই বুঝা গেল, গ্রন্থকারের পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য কি। তাহার পর বৃন্দা মিথ্যা প্রবঞ্চনায় নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণকে কংশ রাজের ভয় দেখাইয়া গোপিগণের মথুরার হাটে যাওয়া সাব্যস্থ করিল।

এই সময় ব্রজনারীগণ কলসী কক্ষে যমুনার জল লইয়া ফিরিতেছিল। বৃন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁলা! তোদের জল নিয়ে ফের্‌বার কি এই সময় হ'ল?"

এক জন ব্রজনারী উত্তর করিল—"কি কর্‌ব বল্‌, পথে যে চোরের ভয়!"

বৃন্দা বলিল—"আমায় দেখিয়ে দিস্‌, আমি চোর ধরে দেব।"

আর এক জন ব্রজনারী উত্তর করিল—"ধর্‌তে গেলে ধরা দিয়ে আস্‌বি!"

বাস্তবিক কালাচাঁদের রূপ গুণে ও বাঁশরীর ধ্বনি শ্রবণে ব্রজনারীগণের এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়াছিল বটে। ব্রজনারীগণ গাহিল:—

(ব্রজনারীগণের গীত।)

জানি না কালা কি গুণ জানে।

যমুনায় যাই আন্‌তে বারি, ঘরে ফিরে আস্‌তে নারি,

চেয়ে বাঁকা নয়ন পানে।

মন মজায় হাসি হাসি, পরায় গলে প্রেমের ফাঁসী,

চরণে সবে হয়গো দাসী, বাঁশীর রব গেলে কাণে॥

উপরোক্ত গীতটী চণ্ডীদাস কৃত পদাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে পারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একস্থল হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"যাইতে জলে, কদম্ব তলে,

ছলিতে গোপের নারী।

কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধণ,

বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥

মোহন মুরলী হাতে

যে পথে যাইবে, গোপের বালা,

দাঁড়াইল সেই পথে॥"

রাধাকে কিরূপ ভাবে, কি চক্ষে দেখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বৃন্দাকে বুঝাইয়া বলিতেছেন :——

(শ্রীকৃষ্ণের গীত।)

আধ বদন বসনে ঢাকা,

মরি কি মাধুরী মাখা,

যমুনা পুলিনে দেখা,

চোখের দেখায় চুরি গেছে প্রাণ।

তড়িত জড়িত তনু, ভ্রুকুটী কামের ধনু,

তাহে বিষম সন্ধান, কুটীল কটাক্ষ বাণ।

হেরে সেই মুখ চাঁদে, প'ড়েছি প্রেমের ফাঁদে,

মিলায়ে তাহার সাথে, দেহে দেহ প্রাণ দান।

পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, আমরা পূর্ব্বে "গোবিন্দমঙ্গল" গ্রন্থ হইতে বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত এই

গীতের কত সৌসাদৃশ্য আছে এবং প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের ভাব লইয়া আধুনিক কবি বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ উপরোক্ত সঙ্গীত রচনায় কত বাহাদুরি দেখাইয়াছেন।

"বৃন্দাবন দৃশ্যাবলীতে "রসিক লাল দত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখে রাধিকার বর্ণনা যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইল:—

"অপরূপ পেখনু যমুনা কিনারে,
নীল-চল-সলিলে কনক-নলিনী!

*   *   *

অধর সুমধুর প্রবাল-রঞ্জিত,
মনমথ-বাঞ্ছিত অমৃতাগার!—
নিতম্ব বিম্বে বাসনা তরঙ্গ,
ইন্দু বিনিন্দিত বদন মাধুরী!
মদন-নিকেতন যুগল মলয়ে,
সুললিত আবলি জলদ ধনুক!—
কবরী-কুণ্ডলিত ফণিনী আকারে,
ফুলদল শোভিত মণি হেন তায়!—

*   *   *

রাধা রমণী শিরোমণি,
রাধা বিধাতা-সৃজন চাতুরী!
চন্দন সৌরভ কাঞ্চন গলাই,
মদন হুতাশনে নিরমল তায়!
নিরমল সোহাগ রসান রঞ্জনে,
হেমাঙ্গ উজলি সৃজিল তাহারে!
নবীন নীরদে গরল মিশাই,
রচল কৌশলে নয়ন-যুগলে!
তরুণ প্রবালে অমৃতে গলাই,
বিরচল অধরে মধুর ভাণ্ডার!

বক্ষে পীনোন্নত বিকচ কমলে,
রচল যুগল মলয় মন্দিরে !—

* * *

রাধারূপ কৌমুদীময় মম অন্তর,
রাধা বিনা নিখিল নিরখি আধার !
রাধা নাম জপ—রাধা রূপ ধ্যান—
"রাধা রাধা"স্মরি ত্যজব জীবন !—

* * *

ব্যঙ্গ ত্যজ বৃন্দে ! কহ করি কি উপায় !
সাগর শুখায়ব ! শশী ভানু খসব !
সাগর উঠব হেমাদ্রি শেখরে !
যদি দিনেশ দেব পচিমে উদয়ব !
গরল খেলব মলয়-অনিলে !
কাম রতি ছোড়ব ! জলদে না সাধব,
চাতক পিয়ব নীলাম্বু জল !
বৈকুণ্ঠ টলব ! তাপ নাহি রহব অনলে !
সলিলে ভাসব অচল !
ইহ যমুনা যদি
সাগরে না যাই শেখরে ফিরব !
রাধা-রূপ তবু নাহি পাসরিব !—

* * *

রাধা-স্মৃতি মালা জপব নীরবে !"

——০——

হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম।

(ইহার উদারতা, দান, দয়াদি।)

আর্য্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহারা, ইংরাজি সমাজ তত্ত্বে নিপুণ তাঁহাদেরই মুখে শুনিতে পাই—হিন্দু ধর্ম্ম অনুদার। ইংরেজ বাহাদুরেরা হিন্দু ধর্ম্মের গতি বুঝিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন, হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ—হিন্দু সমাজ অসমদর্শী। এই স্থূলদর্শীদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে গিয়া কি স্বদেশীয় কি ভিন্নদেশীয় বহুতর লোকেই সহসা ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। যাঁহারা নিজে কোন স্বধর্ম্মের সমাজতত্ত্বের কোন সন্ধান রাখেন না, এমন হিন্দুর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প হইবে না। তাঁহারা আপনারা ত আলোচনা কোন কালেই করেন না, কেহ তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে বলিলে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বধিরবৎ কার্য্য করাই এক শ্রেণীর লোকের কার্য্য। এই দল সংখ্যায় নিতান্ত ন্যূন হইবেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজেরা বুঝিতেছেন না; বরং আপনাদের এক সম্প্রদায় শিষ্য করিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় তামসে নিমগ্ন থাকিতেছেন, থাকুন অন্যকে মজান কি ভাল? শুধু মৌখিক উপদেশে হিন্দু মতের অপ্রশস্ত ভাব প্রচারে তাঁহাদের সুখোদয় হইতেছে না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লিপি যোগে স্বীয়-হৃদয়োত্থ গরল বমন না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অত্যাচারের মাত্রাধিক্যে নিশ্চেষ্ট জড়কেও কার্য্য-তৎপর করিয়া তোলে। আমরা নিরীহ জাতি, জিঘাংসা প্রবৃত্তিতে আমরা বিমুখ, সতত আমরা দ্বন্দ্ব কলহে বাদে বিবাদে কাতর বলিয়া তাহা হইতে সুদূরে অবস্থিত, এই অপরাধে তো এত উৎপীড়ন।

ইংরেজ! তোমার সংঘর্ষে, তোমার দোষানুকরণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দুই চারিটা গুণ আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছ। সেই গুণের অন্যতম গুণ ভ্রমের প্রতিবাদ করা। তোমাদের দেখা দেখি আজ অসংখ্য অসংখ্য হিন্দু মত খণ্ডনে উদ্যতায়ুধ। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও সেই অগ্নিময় ভীষণ স্থানে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্ম ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে কতক গুলি উচ্চ কার্য্য হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন, এখনও রাখিতেছেন। এক কালে কিন্তু হিন্দু-সমাজ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণকেও ব্রাহ্মণত্বে তুলিয়া লইয়া জগতের সমক্ষে আপনার মহত্ত্বের মনোমোহন ছবি আঁকিয়াছেন; কেবল বিশ্বাস এই আমাদের দৃষ্টান্তের বিষয়ীভূত নয়। বিষ্ণুপুরাণ আমাদের উক্তির সাক্ষ্যদান করে। ছিদ্রান্বেষীরা বলিবেন, এক্ষণে সে প্রথার অস্তিত্ব কোথায়? দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল সমাজেই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ইতিহাস পাঠকগণ আমার কথার পোষকতা করিবেন। যে সুপ্রাচীন সময়ের কথা তুলিয়াছি তখন আমাদের হিন্দু রাজত্ব চলিতেছিল। স্বাধীন রাজ্যে রাজা নিজ অভিপ্রায়ে আইন গড়িতে পারেন—তদীয় অধিকারে তদীয় অনুজ্ঞা অক্ষুণ্ণ। পরতন্ত্র রাজত্বে তাহার সম্ভাবনা কি? কে কাহার কথায় পরিচালিত হইবে বল? কে নেতা কেই বা তদধীনস্থ আজ্ঞাবহ? তবে আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল নয় বলিয়া এখনও কোন কোন বিষয়ে তাহার দৃঢ়তা অনুভবনীয়। হিন্দু ধর্ম্ম এক মহাকার পদার্থ। হিন্দুর এই ধর্ম্ম-বন্ধন হেতু যাঁহাদের মতে ইহা অনুদার, তাঁহারা ইহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখুন, কোন অনৌদার্য্য অনুভূত হয় কি না।

ক। দরাফ খাঁ এক মুসলমান ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার অটল আস্থা জন্মিয়াছিল। কেবল সংস্কৃত জানা নয় তাঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতা আছে। যে সে বিষয়ে কবিতা বলিবার যো নাই—সেটী গঙ্গা স্তোত্র। সেই শ্লোক গুলিতে যেমন কবিত্ব, তদনুরূপই রসজ্ঞত্ব, সুতরাং কাব্যকারের কৃতিত্ব শ্লাঘনীয়। এই সাধক দরফ খাঁর কৃত গঙ্গার স্তব হিন্দুর সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। কেবল মুখস্ত করা নয়, সময়ে অসময়ে এমন কি স্নান আহ্নিকের কালেও আবৃত্তি করিয়া কৃতার্থ হন! পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মী যবনের রচিত শ্লোক, ধর্ম্ম কার্য্যে আগ্রহ সহকারে পাঠ! তাহার অনুশীলনে মোক্ষ হইবে, এই বিশ্বাস হিন্দু মনে মনে পোষণ করেন। না হয় হিন্দুর ধারণা হইবে,

দরাফ শাপভ্রষ্ট। তাহাতে কি? ইহা দেখিয়াও কি বলিব—হিন্দু ধর্ম্ম অনুদার? দরখাঁর গঙ্গাস্তোত্রের সর্ব্বজন-পরিচিত শ্লোক একটী এই,—

১। "সুরধুনি! মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং,
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বং।
যদি চ গতিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥"

অয়ি জাহ্নুমুনি কন্যে দেবনদী! তুমি তো ধর্ম্মাত্মাকে উদ্ধার করিয়া থাক। ধার্ম্মিক লোক, আপন পুণ্য-প্রতাপে স্বয়ংই মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন—এতদ্বিষয়ে তোমার মাহাত্ম্য কি! আমি পাতকী। যদি অগতি (অতএব নিঃসহায়) পাপ জীবন আমায় তুমি মোক্ষ প্রদান করিতে পার, তাহাই তোমার পক্ষে মহত্ত্ব। আর সেই মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব নামের উপযুক্ত।

খ। এই অধঃপতিত দৈন্যাবস্থাতেও হিন্দুর মহিমা দেখিতে পাইবে। যে জাতিই হউক, যত নীচ জাতিই হউক—যোগী মুনি হইলে, ভক্ত সাধক হইলে—হিন্দু তাহার নিকট শির অবনত করিবেন—ভক্তিভাবে শিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এ কথা তখন তাঁহার স্মরণ নাই! রাজরাজেশ্বরের মস্তকও নীচ জাতীয় সাধুর পদে বিলুণ্ঠিত। ভেকধারীর নিকট দ্বেষাদ্বেষ ভেদ জ্ঞান অন্তর্হিত।

গ। হিন্দুর দান শৌণ্ডতাতেও মহত্ত্ব, উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে বিরাজমান। হিন্দু উপদেষ্টা শিক্ষা দিতেছেন,—

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথা যোগ্যঃ সর্ব্ব দেবময়োঽতিথিঃ॥

ভাবার্থ এই—

উত্তম বর্ণের আলয়ে যদি নীচ বর্ণ সমাগত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্মান করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গৃহে শূদ্র অতিথি পূজ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের

নিকট বৈশ্য অতিথিও পূজনীয়। ব্রাহ্মণের বাটীতে ক্ষত্রিয় হইলেও তাহাকে সৎকার করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণের সমীপে ব্রাহ্মণের আতিথ্যের কথা কি বলিব? সেখানে সমানে সমান কথা। কিন্তু অতিথি বলিয়া সমানও সমান গৃহীর পূজ্য ব্যক্তি। এইরূপ স্থলেই—

১। "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গুরুঃ।"

স্বয়ং মনুর সাক্ষাৎ উপদেশ,—

২। "গুরুরাগ্নির্দ্বিজাতীনাম্ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥"

চতুর্বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ। অগ্নি ব্রাহ্মণের গুরু। স্বামী পত্নীর গুরু। অতিথি সর্ব্বত্রই গুরু। এখানে অতিথির বর্ণ বিচার নাই। তিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন তাঁহার প্রতি সভক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এই দেখুন, অতিথির বর্ণ বিচার আছে কি না। এই অতিথি সৎকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেও, আমরা হিন্দুর মহিমা বুঝিতে পারি। যথা—

হিন্দুর উক্তি এই,—

৩। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥"

যে গৃহস্থের নিকেতন হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তিনি তাঁহাকে নিজের পাপরাশি দিয়া, তাহার পুণ্য লইয়া গমন করেন।

এই উপদেশ যে সঠিক্ প্রতিপালিত হয়, বর্ত্তমান আতিথ্যই তাহার সপক্ষে সাক্ষী। কেননা, অতিথিকে দেবতা বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস, তাহা উপরে বলিয়া আসিয়াছি।

৪। "উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥"

শ্রেষ্ঠ বর্ণের গৃহে নীচ-বর্ণ ব্যক্তি যদি সমাগত হন, তাহার যথোপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করিবে। কেন না, অতিথি সর্ব্বদেব-সারভূত।

শত্রু যদি আতিথ্য স্বীকার করেন, তাঁহাকেও সেবা করিবে, শাস্ত্রের এই শিক্ষা।

৫। "অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ ॥"

গৃহাগত অরির প্রতিও যথোপযুক্ত অতিথি সৎকার বিধেয়। দেখ, পাদপও, পার্শ্ববর্ত্তী ছেদককে ছায়া দানে কার্পণ্য করে না। (বৃক্ষচ্ছেদন-কর্ত্তা বৃক্ষেরই পার্শ্বস্থিত ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন করে, তথাপি সে ছায়ায় বঞ্চিত হয় না।)

তরু উদ্ভিদ্। উহা অচেতনের মধ্যে গণ্য। তাহার এই নীরব উপদেশ, মনুষ্যের সমুচিত শিক্ষণীয়। আমরা যবন জাতীয়ের অদ্ভুত আতিথেয়তায় বিস্মিত হই। তজ্জাতীয় আতিথ্য সমাদর অবনী-মণ্ডলে নাই বলিয়া থাকি, কিন্তু গৃহ-কোণে যে রত্ন অযত্নে মলিন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান লই নাই।

ঘ। চাণক্য মুনি বলিয়া গিয়াছেন,—

৬। "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥"

বিষমধ্য হইতে সুধা গ্রহণ করিবে। অপবিত্র স্থান হইতে স্বর্ণ গ্রহণীয়। নীচের নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুষ্কুল হইতেও উত্তম নারীর গ্রহণ প্রার্থনীয়।

নীচকে শিক্ষাগুরু করিতে শাস্ত্রের নিষেধ নাই। এ সকল কি অনুদারতার লক্ষণ ?

এই সকল উপদেশ পুস্তকগত নয়, কার্য্যতঃ ইহার আদেশ সযত্নে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে প্রত্যক্ষ প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইতেছে।

হিন্দু-ধর্ম্মের—হিন্দুসমাজের ঔদার্য্যগুণের সঙ্গে দান ও দয়ার অদূর সম্বন্ধ। হিন্দুর দান সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান। হিন্দুর দয়া যেমন্ বিশ্বব্যাপিনী, তেমন বুঝি আর অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

গুণহীন প্রাণীতেও দয়া প্রকাশ বিধেয়। সগুণকে সকলেই তো সমাদর করিবে। তাই আর্য্যগণ বলিতেন,—

৭। "নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি॥"

সাধুরা গুণহীন জীবেও দয়া করিয়া থাকেন। চন্দ্রদেব, কি চণ্ডালের আলয়ে জ্যোতি বিকিরণ করেন না?

হিন্দুর দয়া এত গভীর—এত সহার্থকর—এত সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিকত্বের কি দৃষ্টান্ত দিতে হইবে?

৮। "ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ।"

দান করিয়া তাহা নিজ মুখে ঘোষণা করিবে না। রাশি রাশি দৃষ্টান্তে ইহা সমর্থিত হয়। তাই হিন্দু, গঙ্গাস্নান করিয়া মুখে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তীর্থ-পর্য্যটনের পর তাহার কীর্ত্তন কোন্ হিন্দু করিয়া থাকেন? রাজা হরিশ্চন্দ্র দান-ঘোষণ করিয়া বিষম সঙ্কটাপন্ন হন, এ উজ্জ্বল উদাহরণও হিন্দুর গৃহেই প্রাপ্তব্য। এতটা কোন্ ধর্ম্মে আছে?

পুস্তক সমালোচনা।

১। প্রমোদ-লহরী বা বিবাহ রহস্য—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন,—কাব্যামৃত রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, বঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহাদের নিকট পরিচিত। যাহারা কালীপ্রসন্ন বাবুর "প্রভাত চিন্তা" ও "নিভৃত চিন্তার" গভীর ভাব সাগরে ডুবিয়া সুধামৃত পান করিয়াছেন, "প্রমোদ-লহরীও" তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিবে। যাঁহাদের জ্ঞান, শব্দ স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ায় তলস্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, এবং যাঁহারা গুরু-গম্ভীর রচনা বলিয়া পাঠ-বিরত হইয়াছেন "প্রমোদ-লহরী" পড়িতে তাঁহাদের সে আশাভঙ্গ বা অপরিতৃপ্ত চিত্ত হইয়া পাঠ-বিরত হইবার সম্ভাবনা

নাই। যাঁহারা রহস্যপ্রিয়, নাটক নভেল যাঁহাদের প্রধান পাঠ্য পুস্তক, "প্রমোদ-লহরী" যে তাঁহাদের হৃদয়ে অনন্ত আনন্দ লহরী তুলিতে পারিবে, আমরা এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

বৈদেশিক দর্শনশাস্ত্রের কূট মীমাংসায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া ষ্টাটিক্স বা হাড্রোষ্টাটিক্সের প্রশ্ন অথবা জ্যামিতির অনুশীলনী সমাধান করিয়া, কিংবা ভারবির অর্থ পরিগ্রহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলে, মনের প্রফুল্লতা সম্পাদনের জন্য মিষ্টিরির হিষ্ট্রি পড়িতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যদি "প্রমোদ-লহরী" পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে হাসি স্ফুরিত হইবে, এবং হৃদয় এক বিমল আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া যাইবে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় যাহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাঁহারাও এ পুস্তক পাঠে অধিকারী হইবেন।

রঙ্গালয়ে অভিনয় কালে বীর বা করুণ রসের অবতারণায় দর্শকবৃন্দের ধমনীতে শোণিত দ্রুত গতিতে সঞ্চালিত হইয়া শরীর উত্তেজিত করিলে অথবা করুণ রসে আপ্লুত হৃদয় দর্শকগণের অজ্ঞাতসারে নেত্র-বারি বিগলিত হইলে, অমনই ঐক্যতান বাদন বা হাস্য-জনক বিষয়ের প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনে স্ফূর্ত্তির বিকাশ পায়। কালীপ্রসন্ন বাবুও তদনুরূপ "প্রভাত-চিন্তা" প্রভৃতি গভীর চিন্তা-প্রসূত পুস্তকাধ্যয়নে বিলোড়িত-মস্তিষ্ক পাঠকের মনে সুখরসের সঞ্চারার্থে এই অপূর্ব্ব ও মনোরঞ্জন "প্রমোদ-লহরী" প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার, ভাষার বসন ও আভরণ। কালীপ্রসন্ন বাবু ভাষাকে যেরূপ বসনালঙ্কারে সাজাইয়া মনোজ্ঞ করিয়াছেন, বোধ হয় অতি অল্প লেখকের নিকট সেরূপ লাভ, ভাষার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখা পড়িয়া যে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, অধিকাংশ পুস্তক পাঠে সে আনন্দ রসাস্বাদন দুর্ঘট হইয়া উঠে। বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণাশুদ্ধি পুস্তক মধ্যে দৃষ্ট হইলে, ভাষানুরাগী পণ্ডিতমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হন। আর বহু মূল্য বাস ছিন্ন হইলে যেমন তাহার দর বা আদর থাকে না, ভাল বিষয় লইয়া লিখিত পুস্তকও তদ্রূপ প্রমাদপূর্ণ হইলে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সুখকর বা সু-পাঠ্য

হয় না; কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখায় সে দোষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"প্রমোদ-লহরী" পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার হাসাইতে হাসাইতে সমাজের যে সমস্ত কুরীতি আছে, তাহা দেখাইয়াছেন। "বিবাহ কত প্রকার" শীর্ষকপ্রবন্ধ পাঠ করিলে, আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু সে হাসির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলও আসে। আর সেই জল আনাই লেখকের কৃতিত্ব। ঘোমটা শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে লেখকের সহিত একমতাবলম্বী। বিবাহ কালে কন্যার বয়স নয়, দশ বা একাদশ, এ বয়সে পর পুরুষের নিকট অর্থাৎ অতিথি অভ্যাগত বা বিবাহ সভায় সমাগত লোকের নিকট এমন কি বরকে দেখিয়াও কন্যা ঘোম্‌টা দেয় না। পরদিন সীমন্তে সিন্দুর দানের পর ঘোম্‌টা টানিয়া দিলে, ঘোম্‌টা দেওয়া আরম্ভ হইল। সুতরাং বিবাহের আসরে ঘোম্‌টা না দেওয়া দোষাবহ নহে। অন্যান্য যে বিষয়ে মতভেদ রহিল, তাহা অদ্যকার আলোচ্য নহে। "বাসি বিবাহের কাদা খেলা" এ প্রদেশে হয় না। বিবাহের পরদিন যে "কুশণ্ডিকা" হয়, তাহাকে অনেকে চলিত কথায় বাসি বিয়ে বলে। আর আদ্য ঋতু হইলে রমণী যেদিন ঋতুস্নান করেন, সেইদিন বৈকালে কামিনী, যামিনী, ভামিনী, সুখদা মোক্ষদা মানদা জ্ঞানদা প্রভৃতি আসিয়া যে কাদাখেলা করে বা দাশুরায়ের বিরহ বা মান-ভঞ্জনের ছড়া কাটায় বা গান গায়, তাহাই কাদামাটী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে বাসি বিয়ের কাদা যদি অন্য কোন দেশের প্রচলন থাকে, এ দেশের নহে।

মুখরা ভার্য্যা বা গৃহিণী রোগ—বেশ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থাও দিয়াছেন। তবে এই গৃহিণী রোগ ম্যালেরিয়ার মত দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তাদের সাবধান হওয়া উচিত এবং তৎসঙ্গে ঔষধ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

কালীপ্রসন্ন বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের নয়নপথে আনিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গ ভাষার উন্নতি কল্পে যত্নবান্ হউন এবং বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে

আরও এমন অমূল্য রাশি রাখিতে চেষ্টা করুন, বিদেশী জহরীরাও যাহা দেখিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইবেন।

২। সহমরণ—শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তক খানির বর্ণণীয় বিষয়টী বেশ। অনেক স্থলের বর্ণনায় গ্রাম্য দোষ থাকিলেও স্থানে স্থানের বর্ণনা মন্দ নহে। পুস্তক খানিতে বর্ণা-শুদ্ধি বা ব্যাকরণাশুদ্ধি বড় বেশী। যখন "সংশোধিত" সংস্করণেই এত প্রমাদ, তখন প্রথম সংস্করণে যে কিরূপ ভুল ছিল, তাহা পাঠক-বর্গ অনুমান করিয়া লইবেন। এরূপ প্রমাদপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের মঙ্গল নয়।

যেখানে প্রমীলা তারা গণিতেছে, এক, দুই, তিন ইত্যাদি করিয়া চৌদ্দ অবধি গণনা করার পর গ্রন্থকার বলিলেন, প্রমীলা আর গণিতে জানে নাই। আবার সেই ১৪০ পৃষ্ঠাতে একটু পরেই বলিতেছেন সে লেখা-পড়া জানিত, চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ বলিতে পারিত।

আর এক কথা, অষ্টম বর্ষীয়া প্রমীলার ওরূপ প্রেমানুরাগ আমাদের ভাল লাগিল না। লেখকও রাখালের ন্যায় প্রমীলা দর্শনে আত্মহারা হইয়া কিরূপ লিখিয়াছেন তাহা আমরা দেখাইতেছিঃ—

"প্রমীলা-দর্শনাভিলাষী রাখাল বাতায়ন পথে প্রমীলাকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া ভাবিল "প্রমীলা নিশ্চয় জানেলায় বসিবে—যদি আমার ভালবাসা প্রকৃত হয়, নিশ্চয় জানেলায় আসিবে। আবার ভাবিতেছে, প্রমীলা যদি আজ না আসে, আমি কতক্ষণ বসিয়া থাকিব। এইরূপ কত ভাবনায় ভাসমান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে রাখাল প্রমীলার নিদ্রিত দেহকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।" (১৫০ পৃষ্ঠা)

রাখাল কি কোন ইন্দ্রজাল জানিত, না মক্ষিকা বেশে বা নিরাকার হইয়া প্রমীলার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল? রাখাল কি কল্পনা বলে "প্রমীলার নিদ্রিত দেহকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল!"

বর্ণনীয় বিষয়টী (Plot) বোধ হয় গ্রন্থকার, মাতামহী বা পিতামহীর নিকট গল্পচ্ছলে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সময়ে উপন্যাসাকারে প্রকাশ

করিয়াছেন। স্থানে স্থানের বর্ণনা এরূপ বড় অরুচিকর। এরূপ কতক গুলি কথার প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহাতে পুস্তক খানি মার্জ্জিত-রুচি সম্পন্ন পাঠকবর্গের ভোগোপযোগী হইবে বলিয়া অনুমিত হয় না। বিশেষ যত্ন সহকারে সংস্কার করিলে পুস্তক খানি পাঠকবর্গের তৃপ্তি-প্রদ হইলেও হইতে পারে।

৩। শান্তি-সোপানম্—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলয়িতা। মূল্য ।৵০ আনা।

সংগৃহীত শ্লোক সমুদয় পাঠ করিলে বাস্তবিকই মনের শান্তি লাভ হয়। শ্লোকের অনুবাদও মধুর এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। সমস্ত শ্লোকই পয়ার ছন্দে অনুবাদিত হইয়াছে। সুকবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার "রস-তরঙ্গিণী" নামে এক খানি শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্লোকেরও অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। নানাবিধ ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়া, পুস্তকখানি অধিকতর সুললিত ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন রসাত্মক শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে অনুবাদিত হইলে শ্রুতিমধুর হয় বটে, তবে পয়ার ভিন্ন অন্য অন্য ছন্দে কতিপয় শ্লোকের অনুবাদ করিলে শান্তি-রসামোদী ব্যক্তি-গণের যে পাঠ-পিপাসা অধিক পরিতৃপ্ত হইত একথা বলা যাইতে পারে।

আর এক কথা। সংস্কৃত শ্লোকের যেমন একাদিক্রমে সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,এক একটী অনুবাদের শেষে সেই সেই সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দের বাঙ্গালা শব্দ অর্থাৎ (১,২,৩,৪, ইত্যাদি) প্রয়োগ করিলে ভাল হইত।

সঙ্কলয়িতা, পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ পরোপকারার্থে দান করিয়াছেন। ইহাতে শান্তিসোপান তাঁহার স্বর্গ সোপানও হইয়াছে। এই জন্য তিনি সাধারণের যে প্রীতিভাজন হইয়াছেন, একথা বলাই বাহুল্য।

৪। জীবনী কোষ—শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

পুস্তক খানি দেখিবামাত্রই এক খানি উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম এবং কৌতূহল-পরবশ হইয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে ইহা যেরূপ সারবান্ গ্রন্থ হইবে বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, পাঠান্তে সে সারবত্তা পরিলক্ষিত হইল না।

প্রথম কথা, গ্রন্থ খানি অসম্পূর্ণ। এ অসম্পূর্ণতা দুই প্রকার। (১) অনেক লোকের নাম দেওয়া উচিত ছিল, দেওয়া হয় নাই। যথা,— দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন ইত্যাদি। কালিদাস প্রভৃতি কবির নাম দেওয়া হইল, অথচ মল্লিনাথের নাম নাই। মল্লিনাথ কাব্য লেখেন নাই বলিয়া নাকি? মল্লিনাথের টীকা না থাকিলে, কাব্যামৃতরসাস্বাদ সহজে ঘটিত না।

(২) (ক) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের জীবনী আছে, কিন্তু রামেশ্বরের সত্য-নারায়ণের কোন উল্লেখ নাই। যে সত্য-নারায়ণের কথা রচনা করিয়া রামেশ্বর আবাল বৃদ্ধ বণিতার নিকট পরিচিত, সে কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল।

(খ) পুষ্কর—কেবল নলরাজার ভ্রাতা এই কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ ভিন্ন পুষ্কর-নামা এক নরপতি ছিলেন। পুষ্কর বলিতে মেঘ, এবং পুষ্কর অর্থে বরুণ পুত্র। এ সব কথা কেন বলা হয় নাই?

পুষ্পদন্ত—গন্ধর্ব্ব বিশেষ এবং তাঁহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জানা উচিত, পুষ্পদন্ত বলিতে বায়ুকোণের হস্তী ও বিদ্যাধর-বিশেষ বুঝায়।

আমরা যত দূর দেখিলাম, তাহাতে ভ্রম প্রমাদও দেখা গিয়াছে (১) অক্ষয়কুমার নামে রাবণের পুত্র ছিল না। তাহার নাম "অক্ষ" এবং হনুমান কর্ত্তৃক সে নিহত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে উহা আছে, একথা বলিতে যান তাহা প্রামাণিক নয়।

(২) পুষ্কর নামে ভরতের কোন পুত্র ছিল না তবে "পুষ্কল" নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। বোধ হয়, দ্বারকানাথ বাবু "পুষ্কলকে" "পুষ্কর" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

আর একটী অসদৃশ দর্শন করিলাম এবং সে কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকে লিখিত হইয়াছে ১২২৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয় এবং ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সালের নাম দেওয়া কেন? বিদ্যাসাগর

মহাশয় ইংরাজের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই কিন্তু দ্বারকানাথ বাবু তাঁহার চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাল প্রবর্ত্তিত করিয়া একটী অসদৃশ দর্শনের উদাহরণ দিলেন। কেবল এক স্থানে নয়, চাকরীর আরম্ভ হইতে মানব লীলা সংবরণ অবধি সবই ইংরাজী সালের প্রয়োগ। আর এক কথা। ইতিহাসে যে সমস্ত লোকের নাম পাওয়া যায়, অথবা যাঁহাদের জীবন লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের কথা যত দূর পাওয়া যায়, সাল ও তারিখ সব দেওয়া উচিত ছিল। যখন "জীবনী-কোষ" নাম দিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইল, জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে সাল তারিখ না থাকায় একটী অসম্পূর্ণতা বা অসদৃশ দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।

"সহৃদয়বান্" এরূপ কথার প্রয়োগে যে ব্যাকরণের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করা হইয়াছে, পাঠকমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। (২৫ পৃষ্ঠা)

পুস্তক খানির ছাপা ভাল এবং যে মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহা সুলভ বটে। দোষ সংশোধন করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলে এখানি ভাল বই হইতে পারিবে।

ধর্ম্ম-গীত।

নীরদলাঞ্ছনবরণী, ঘোর রণ কারিণী,
দৈত্যবিঘাতিনী, ঘোর ঘন বেশে॥ ধ্রু॥
সদা অট্ট অট্ট হাসে, চপলা জিনি প্রকাশে,
গভীর হুঙ্কার ভাষে, ঘনরব শেষে॥ ১॥
প্রবল নিশ্বাস বহে, জিত অতি গন্ধবহে,
দনুজ সুস্থির নহে, সমর আবেশে॥ * ॥
রুধির-নীর-পায়িনী, শোভে চাতকী যোগিনী,
শির মালে ইন্দু ধনু, কণ্ঠ কম্বু দেশে॥ ২॥

আমি তো চিনিনে তারে, সে চেনে আমায়।

১

আমি তো চিনিনে তাঁরে, সে চেনে আমায়,
কত দেশ-দেশান্তরে গিরি নদী-পারাবারে,
দূরেতে বিভিন্ন থাকি কিন্তু ভিন্ন নয়।
তাহার হৃদয় কাছে, আমার হৃদয় আছে,
তাঁর রূপে মোর রূপ, সেই গুণে গুণ,
অথচ চিনিনে তাঁরে, সে যে নেছে চিনে মোরে,
চিনিতে তাহার মত নাহি তুলনায়,
আমি তো চিনিনে তাঁরে সে চেনে আমায়॥

২

আমার মঙ্গল আশা নাহি করে যারা,
তাদের রেখেছি চিনে পূর্ণ পরিচয় বিনে,
অথচ যাহার পাই পূর্ণ পরিচয়,
তাহার আকৃতি কিবা, আঁধার না স্পষ্ট দিবা,
কিছুই জানিনে আমি, চিনিনেকো তায়,
মোর মুখে দিয়ে চুম্, আমার তাহারে ঘুম্,
যে জন নিয়েছে জেনে এ মর-ধরায়,
আমি তো চিনিনে তারে সে চেনে আমায়॥

৩

আমার সুখের দিনে হৃদয় কখন
ভুলেও করে না মনে, কি শয়নে কি স্বপনে,
যেই নাম সুধু-মাত্র জানি আমি তার।
কিন্তু সে অচেনা জন্য দুঃখের সময়,
আমারে যতন করে, চিনিয়ে আদরে ধরে,
তাপে ছায়া, শোকে শান্তি—করে যে প্রদান,
আমি তারে জানিলাম. চিনিনে কোথায় ধাম,

মোর নাম-ধাম সব জানা আছে তার,
কোথা হতে আসি যাই, কোথা যাব কি যে চাই,
সব জানা আছে তার, সে যে সর্ব্বময়,
আমি তো চিনিনে তাঁরে সে চিনে আমায়॥

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীমধুসূদন।

(চতুর্দ্দশ-পদী)

বঙ্গের সাহিত্য-রাজ্যে ছিল বহুদিন,
কবীশ-আসনশূন্য, তামসী অমায়,
চন্দ্রাসন নভে যথা; দেবের কৃপায়
সে শূন্য আসনে তুমি হইলা আসীন!
তেজস্বী ভাবেরে হেরি, ছন্দের অধীন,
নবলব্ধ সাম্রাজ্যের হিত-কামনায়,
গঠিলা অমিয় ছন্দে নূতন প্রথায়,
শত্রুর পরুষ বাক্যে হয়ে উদাসীন!
অভিনব ফুলে গাঁথি অনুপম হার,
পরালে পরম যত্নে বঙ্গবাসি-গলে;
যত দিন কাব্যে মুগ্ধ হইবে সংসার,
তত দিন কীর্ত্তি তব অবনীর তলে,
জাগ্রত রহিবে, কবি! অন্তরে সবার;—
গাহিবে মানবে "ধন্য শ্রীমধু ভূতলে"।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

প্রতিবাদ-সমালোচনা।

"এডুকেশন গেজেটে" (১) "প্রভাত চিন্তা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম—কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাত চিন্তার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যখনই এই ভাব মনোমধ্যে উদিত হইল, লেখকের নাম জ্ঞাত হইবার কৌতূহল আসিয়া তৎক্ষণাৎ দেখা দিল। দেখিলাম, প্রবন্ধশেষে লেখকের নাম নাই। অনেকে মনে করেন, নাম না দিয়া পুস্তকের ভুল ধরা বা কাহারও মতের প্রতিবাদ করা অনেকটা নিরাপদ্; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নাম না দিলে তো নিরাপদত্ব হয় না' অধিকন্তু কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়। হয়তো লেখকের নাম না দিবার স্বতন্ত্র কারণ থাকিতে পারে, সে বিষয় আমাদের আলোচনা অনাবশ্যক।

প্রবন্ধারম্ভে লেখক যে ভূমিকা করিয়াছেন, তাহার এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। "বই পড়িব আর তাহার সমালোচনা করিব না, এটী কি মানুষে পারে?"

সমালোচনা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সমালোচন সাহিত্যানুশীলনের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা কাহাকে বলে, সেটী সমালোচনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জানা আবশ্যক। গ্রন্থের দোষ-গুণ-পর্য্যালোচনা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদির বিচার, সেই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকের তুলনায় কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য, সেই সমস্ত নিরূপণ করাই প্রকৃত সমালোচনা। পুস্তকে যে দোষ থাকিবে, সেই দোষ দেখাইয়া দিতে হইবে, অথচ ব্যক্তি-বিশেষের নিন্দাবাদ থাকিবে না। যে সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হইবে, তৎসমুদায়ের উপযুক্ত প্রশংসা করাই প্রকৃত সমালোচনা। কেবল দোষ দেখাইয়া সমালোচক ক্ষান্ত হইবেন না। কিরূপ দোষ এবং সেই দোষ পরিহারের উপায় উদ্ভাবন করাই প্রকৃত সমালোচনা

---

(১) ১৩০২ সাল, ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ।

বাস্তবিক, নিরপেক্ষভাবে দোষ গুণ বিচার করাই স্বাধীন সমালোচনা। ইংরাজি ভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত (২) প্রকৃত সমালোচনা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠকবর্গ দেখুন—

"It (true criticism) teaches us in a word to admire or to blame with judgment and not to follow the crowd blindly."

উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মতে, অজ্ঞ হইয়া সাধারণ মতের অনুবর্ত্তী হইলে প্রকৃত সমালোচনা হয় না।

এখন পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন, প্রভাত চিন্তার সমালোচক; সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কেবল কয়েকটী ভুল (৩) দেখাইয়াছেন মাত্র। সুতরাং পুস্তক খানির যে যথার্থ সমালোচনা হয় নাই, এ কথা স্পষ্ট রূপে বলা যাইতে পারে। সমালোচক মহাশয় নিজের ভূমিকায় এক স্থানে বলিয়াছেন "আমি বহু কাল "পূর্ব্বে বান্ধবের" দু' এক সংখ্যা পড়িয়াছিলাম, সেই দলিলে প্রভাত চিন্তার এক পাতাও না পড়িয়া নিজেই কত লোকের নিকট সাধারণতঃ কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখার—এমন কি খাস প্রভাত-চিন্তারও প্রশংসা করিয়াছি। এ রকম অনেকেই করিয়া থাকেন।"

এ কি প্রকৃত সমালোচকের কথা? সাধারণ মতের অনুসরণ করিয়া এবং পুস্তকের এক পাতাও না পড়িয়া যাঁহারা মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহারা কিরূপ সমালোচক? বোধ হয়, তাঁহারা সমালোচক-পদবাচ্য হইতে পারে না।

আর এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক মহাশয়ের দূরদর্শিতার পরিচয় দিব।

"বড় বড় লাইব্রেরী বা ভাল ভাল পুস্তকবিক্রেতাদিগের পুস্তক-তালিকায় গ্রন্থের নাম মাত্র দেখিয়া কত লোকে তরিয়া যান। নচেৎ যদি সকল বই পড়িয়া তাঁহার কথা বলিতে হইত, তাহা হইলে

(২) Blair.

(৩) প্রকৃত-ভুল কিনা পরে আমরা তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব এবং যথাবিধি, পাঠকবর্গকে জানাইব।

আজি কালি, যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের টি টি সুখ্যাতি, তাঁহার বড় অধিক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিবার অধিকারী হইতেন না।'

এ মত সম্পূর্ণ অমূলক। পৃথিবীতে থাকিয়া নক্ষত্ররাজির আকার নিরূপণ বা সিদ্ধান্ত করা, অল্প-বুদ্ধির কথা নয়। জলাশয়ে থাকিয়াও বিশাল বারিধির আকার জ্ঞান সকলের থাকে না। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহারা আপনার অল্প জ্ঞান বা উত্তীর্ণ ব্যক্তির গুণপনা স্বীকার করে না। উত্তীর্ণ ব্যক্তির কপাল ভাল, পড়্তা ভাল, তাহার একাদশ বৃহস্পতি ইত্যাদি বলিয়া তাহার বাস্তবিক ক্ষমতা মলিনীকৃত করিয়া তোলে। যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, যাঁহারা বাস্তবিক বিদ্যানুরাগী, তাঁহারা যত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তত পুস্তক পাঠের সময় কোথা হইতে হয়, এ বিষয় সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ বা ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের মত সকল উকীলের পশার হয় না কেন? সকল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বা আর সি চন্দ্রের মত হয় না কেন? অনেক বাঙ্গালিই প্রফেসারী করিতেছেন, কিন্তু মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার লাহিড়ীর অভাব মোচন হইল না কেন? ইহার উত্তরে কেহ হয়তো উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিবেন "কপাল"। অন্যদিক হইতে হয়তো আর একজন বলিবেন "সময় ভাল"। কিন্তু আমরা বলি "পাঠের তারতম্য অনুসারে, আপনার উৎকর্ষ, অপকর্ষ, উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। সেইরূপ যাঁহারা সমালোচক—প্রকৃতসমালোচক; তাঁহারা যে কত পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদ পত্র কি স্থানীয় কি বৈদেশিক, এত পড়িয়া থাকেন যে, সেরূপ অনেক পুস্তক বা পত্রিকার নাম, অনেক শিক্ষিত লোকের অবিদিত। রাজেন্দ্রলাল ও অক্ষয় কুমার বাবুর পুস্তক পাঠে কেহ কি বলিতে চান, তাঁহাদের অনেক বহি পড়া ছিল না? না ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবের জটিল মোকদ্দামা দেখিয়া মত প্রকাশ করিতে চান, যে জ্যাকসন সাহেব যত বই আনিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ বই পড়েন নাই?

এত ক্ষণ আমরা লেখকের ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য বা প্রতিবাদ করিবার ছিল, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইলাম। এখন তিনি

যে সব ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য বা প্রতিবাদ করিবার আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

(ক) "প্রথম প্রবন্ধ 'নীরব কবির' প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা আছে,—

"কোন একটা নাম দিতে হইলে ইহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কেন না শব্দের পর শব্দ বিন্যাসের চাতুরী বিনা সাধরণতঃ ইহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায় স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।"

লেখক যে স্থানে স্থানে অমূলক ও ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই:—

"চতুর্থ সংস্করণের 'প্রভাত চিন্তা' টীকা টিপ্পনি-সমেত নূতন স্কুলের পাঠ্য পুস্তক। এবার আর সাহিত্য-সেবীদিগের তৃপ্তিপ্রদ হইবার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই।"

এ কথা কে বলিল? পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে "সাধনা ও সিদ্ধি" প্রভৃতি প্রবন্ধ থাকায় তাহা কেবল চিন্তাশীল ও ভাবুকের তৃপ্তিপ্রদ ছিল, সুকুমারমতি ছাত্র-বৃন্দের পক্ষে সে গভীর ভাব-বারিধি দুর্গম হইয়া পড়িত, সুতরাং তাহারা পাঠ করিতে পারিত না। নূতন পুস্তক উভয় শ্রেণীর তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে।

একটু পরেই আবার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "১৫ বৎসরের এবং তিনটী সংস্করণের পর প্রভাতচিন্তার এই যে দশা-বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহার কারণ বোধ হয় বয়স-ভেদে প্রকৃতি-ভেদ এবং প্রকৃতি-ভেদে রুচিভেদ।"

চতুর্থ সংস্করণের প্রভাতচিন্তার প্রকৃতি-ভেদও হয় নাই আর রুচি-ভেদও হয় নাই। প্রভাতচিন্তায় দুই একটী নূতন প্রবন্ধের সন্নিবেশকে প্রবৃত্তি বা রুচিভেদ বলা যায় না। অন্ততঃ কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবৃত্তি ও রুচির অর্থ তাহা নহে। সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন—

১। "এস্থলে 'বিনা' শব্দটি ঠিক ব্যবহৃত হয় নাই। "ব্যতীত" বলিলেই সঙ্গত হইত।

২। শব্দের পর শব্দ বিন্যাস বলায় পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

শব্দ-বিন্যাসের চাতুরী বলিলেই যথেষ্ট হইত। ৩। যাঁহারা কেবল শব্দ-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হন, তাঁহারা রসজ্ঞ না হইতে পারেন, কিন্তু স্বাদগ্রাহী বটেন, এবং যদি কোথাও শব্দ-রচনার বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু থাকে, তাহা স্বাদগ্রাহীর ভোগ্য কেন হইবে না?

৪। "স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী হয় না" বলিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু ইংরাজিওলা লেখক Is not considered fit for the enjoyment of—এই ইংরাজির খাড়া খাড়া তরজমা মাত্র করিয়া দিয়াছেন। স্বদেশীয় রীতির মুখাপেক্ষা করেন নাই।"

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই,—

(১) 'বিনা' ও 'ব্যতীত' শব্দের পার্থক্য কি? 'বিনা' লেখাতেই বা কি দোষ হইয়াছে? কারণ, উভয় শব্দেই 'ভিন্ন' এই অর্থ বুঝায়। (২) "শব্দের পর শব্দ বিন্যাস" "কথার পর কথা" এরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) এখানে সমালোচক মহাশয়ের বুঝা উচিত যে, যাঁহারা রসজ্ঞ নহেন, তাঁহারা কিরূপে স্বাদগ্রাহী হইবেন? এখানে স্বাদ গ্রহণ অর্থে সেই রসাস্বাদন বুঝিতে হইবে। যাঁহারা রসজ্ঞ নহেন, তাঁহারা রাসাস্বাদান করিতে অক্ষম। বালককে বহুবাজার, বড়বাজার বা জোড়াসাঁকোর সন্দেশ দাও, সে খাইয়া বলিবে, সন্দেশ মিষ্ট। কিন্তু যাঁহারা রসজ্ঞ, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন—ভীম নাগের সন্দেশেই বা কি রস, আর দ্বারিকা ময়রার সন্দেশেই বা কি রস। অনেক অসার ও নীরস পদার্থের মধ্যে যদি কথঞ্চিৎ সারবান্ ও সরস পদার্থ থাকে, তবে তাহা গ্রহণোপযোগী হইলেও, স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির 'ভোগ্য' হইতে পারে, কিন্তু ভোগোপযোগী হইবার যোগ্য নয়। কারণ, অসার ও নীরস বিষয় পড়িতে প্রথম প্রথম বহুমূল্য সময় নষ্ট হয়। দ্বিতীয় কথা। পড়িতে পড়িতে এত বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় যে, ভোগোপযোগী বিষয়ে উপনীত হওয়া যায় না। ৪। "স্বাদ-গ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী হয় না, বলিলেই যথেষ্ট হইত।" আমরা বলি, যথেষ্ট হয় না। কারণ সরস বা সারত্ব বিশিষ্ট বিষয় যেখানে থাকিবে, সেই স্থানই ভোগোপযোগী হইতে

পারে, কিন্তু সে ভোগোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। গ্রাহ্য না হইবার কারণ, হয় সময় নাশ, না হয় বিরক্তি। ইংরাজিতে যে ইজ্ নট্ কন্সিডার্ড ফিট (Is not considered fit) আছে, তাহার কোনটাই বাহুল্য রূপে ব্যবহৃত নহে। সুতরাং অনুবাদে গ্রাহ্য এই পদটা পরিত্যাগ করিলে লেখা অসম্পূর্ণ হইত।

(খ) পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের পরেই আছে (২য় পৃষ্ঠা) সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আরও একটুকু ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। 'আরও একটুকু' বলিলেই 'পূর্ব্বের অপেক্ষা' একটু ঊর্দ্ধে আরোহণের কথা বুঝায়—কিন্তু আরোহণের সুরুর কথা ত পূর্ব্বে বলা হয় নাই। ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন—ইহা ইংরাজী Go higer up ইহার তরজমা মাত্র। একটুর পর 'কুকার দেওয়া সর্ব্ব-প্রদেশ প্রচলিত নয়।"

আমাদের উত্তর।

"আর ও একটুকু" বলিবার প্রয়োজন যে কি, পরের বাক্যটী পড়িলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। "সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটুকু ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতক গুলি সুললিত শব্দ পাইয়া মোহিত হন না।" এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল—"ছন্দো বদ্ধ বাক্য" বা "সুললিত শব্দ" হইতে "আর একটু ঊর্দ্ধে আরোহণ।" করেন।" যাঁহারা প্রকৃত সহৃদয় রসজ্ঞ ও কাব্যান্বেষণ তৎপর, তাঁহারা কখন ছন্দোবদ্ধ ও সুললিত শব্দ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হন না, তাঁহারা আর একটুকু ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া তবে পরিতৃপ্ত হন। কালী-প্রসন্ন বাবু যে কেবল অনুবাদের অনুরোধে বা থাড়া থাড়া তরজমার খাতিরে "আর একটুকু" কথা বসাইয়াছেন, আমরা সে কথা বলি না। ইহাতেও যদি বুঝিতে কঠিন হয় বা এ সিদ্ধান্ত ভাল না লাগে, তবে আর এক কথা বলি। সমালোচক ইংরাজী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি, সুতরাং এটা সহজে বুঝিতে পারিবেন, যে মধুর ধ্বনি আনন্দদায়ক, সে ভাব হৃদয় স্পর্শ করে না। যাহাকে ইংরাজিতে বলে (Does not touch the heart), এখানেও সেই রূপ হৃদয় স্পর্শ করে না।

ভালবাসা।

—o—

ভালবাসা, কোথা তুমি—কত দূরে হায়!
অরধ জীবন গত তব অর্চ্চনায়;
শুধু অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস,
শুধু ব্যথা, হা হতাশ,
নিয়ত আকুল প্রাণী কি এক তৃষ্ণায়!
নাই সুখ, নাই শান্তি,
শুধু শ্রান্তি, শুধু ভ্রান্তি,
এ জীবনে 'প্রাণ' যেন নাহিক কোথায়!
নিঠুর জলৌকা-সম,
হৃদয়-শোণিত মম,
তোমারি নামেতে শুষি' লইয়াছে ধরা!
মন্দার-সৌরভ-ভার,
শান্তি-সুখ অমরার,
কোথা ইথে? এ যে মহাপ্রীতি গন্ধে ভরা!
পশ্চিম-গগন-গায়,
রবি অস্ত যায় যায়,
যে দূরে, সে দূরে তুমি, ছুটাছুটি সার!
খুঁজিতে এ জন্ম গেল,
আর কত জন্ম, বল,
ঘুরি' ফিরি' দেখা তবে মিলিবে তোমার?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেম-বলিদান।

—০—

সারা বেলা, শ্যাম-জ্বালা দারুণ দহনে।
সাধিতে, কাঁদিতে আর পারি না জীবনে॥
প্রতি নিশি জেগে বসি,
ভাবি শুধু কাল-শশী,
জাগে নাকি তার সেই পাষাণ পরাণে।
অভাগিনী জর জর বিরহ-দহনে॥

রয়েছে কি প্রাণ মোর বিভোর স্বপনে!
মধু-মাখা কূট বিষ পিয়িয়া যতনে॥
এত যে বেদনা পাই,
তবু কেন তারে চাই,
না জানি কি মধু আছে তাহারে মননে।
ব্যথা-ভরা হৃদি ভাবে শয়নে স্বপনে॥

ভাবিব না মনে করি তাহা তো পারিনে।
ছাড়ি ছাড়ি, ছাড়ি ছাড়ি, তবু যে ছাড়িনে।
চমক ভাঙে না মোর,
এ কি এ মায়ার ঘোর,
মরণ বরণ করি তবু তো মরিনে।
তিলেক তাহারে ছাড়ি থাকিতে পারিনে॥

যেথা যাই সেই কথা জাগে গো স্মরণে।
ওই বুঝি ডাকে মোরে বাঁশরী আহ্বানে॥
শাখে বসি পাখী গায়,
যমুনা বহিয়া যায়,

মোর মত তারা কি গো বহিছে উজানে।
দিবা-নিশি এক সুর বাজিছে পরাণে॥

পরী কি মন্ত্র জানে বলিতে পারিনে।
অবলারে দগ্ধ করে কেন নিশি-দিনে?
যে দিন তাহারে ভুলে'
যাই গো যমুনা-জলে,
পূর্ব্ব-স্মৃতি জেগে' উঠে ফিরিতে পারিনে।
কত সুখ হ'ত হেথা শ্যাম-দরশনে॥

শ্যামের সোহাগ যেন জড়িত জীবনে।
দাগা দিয়া অবশেষে নিভিবে মরণে॥
আজ সে কালাও নাই,
আর সে বাঁশরী নাই,
তবু যেন ভাঙা সুর বাজে গো পরাণে।
শুনি যেন রুনু ঝুনু নুপুর চরণে॥

কত দিন রহিব এ কঠোর জীবনে।
কর্ম্মনাশা ভালবাসা পুষিয়া পরাণে॥
যাক্ প্রাণ, থাক্ মান,
থাক্ যত অভিমান,
এই হেথা থাক্ তারা নীরব জীবনে।
ডুবিনু যমুনা-জলে প্রেম-বলিদানে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

এমনি পড়েছে কাল।

(১)

যার গুণ গাই সেই রুষ্ট হয়ে
আমারেই দেয় গাল।
যার করি ভাল সেই মন্দ কয়ে
এমনি পড়েছে কাল।

(২)

ধর্ম্ম-পথে গেলে' ধর্ম্মপত্নী চাই
ধর্ম্মের সহায় নারী।
রমণীর হৃদে নাহি ধর্ম্মভাব
বিলাসে মজেছে ভারি।

(৩)

শুধু আত্মসুখ আমোদ-প্রমোদ
পর-সুখে দৃষ্টি নাই।
কিসে সুখে রব এই চিন্তা মনে
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

(৪)

ইষ্ট মন্ত্রে দৃষ্টি কারো নাহি আর
মত্ত সৃষ্টি-ছাড়া কাজে।
বেদ-বিধি ছাড়ি' সব বিপরীত
নাহি ভয় লোক-লাজে।

(৫)

রূপ-মুগ্ধ হ'য়ে সবার বাসনা
তুলিতে গোলাপ ফুল।
ডালে কাঁটা আছে ফুটে যাবে হাতে
তুলিবার কালে ভুল।

(৬)

ধর্ম্মভীরু যেবা ধর্ম্মপথে চলে
তারে কহে বোকা অতি।
ভণ্ড ব'লে লোক করে তারে ঘৃণা
জপে তপে যার মতি।

(৭)

কলহ বিবাদ পরনিন্দা-বাদ
যেবা নাহি ভালবাসে।
কাপুরুষ বলি' লক্ষ্য করি' তারে
কথা কহে উপহাসে।

(৮)

না থাকে বিচার আহারের কালে,
যার পায় তার খায়।
নাহি ভেদ-জ্ঞান সকলে সমান
এই কথা শোনা যায়।

(৯)

লঘু গুরু জ্ঞান মূর্খে, যেবা করে
গুরু বলে' নাহি মানা।
হালে এ আইন হয়েছে প্রচার
নাহি আগে ছিল জানা!

(১০)

পীঁড়ে পেতে অন্ন খাইবে না আর
লইবে চামচ কাঁটা।
কেমনে বসিবে পীঁড়ের উপরে
পেণ্টেলুন বুট আঁটা।

১১

করিবে না বালা বার, ব্রত কিছু
প্রাতে যায় পাঠশালা।
বোধোদয় পড়ি বুদ্ধি বিপরীত
ক্রমশঃ বাড়িছে জ্বালা।

(১২)

সম্প্রতি রমণী অঙ্কে লীলাবতী
বি—এ, এ—মে, করে পাস।
পাচকের পীড়া হ'লে কোন দিন
উপবাসে রাত্রি-বাস।

(১৩)

রমণী প্রধান সংসার ভিতর
এমনি পড়েছে দিন।
রমণীর মতে চলিছে সংসার
পুরুষে পৌরুষহীন।

(১৪)

রমণীর কার্য্য অপূর্ব্ব অদ্ভুত
কতই দেখিব আর।
কিছু দিন পরে হেরিব নয়নে
বাঙ্গালিনী অফিসার।

(১৫)

ভট্টাচার্য্যপুত্র ছাড়ি' ভবদেব
ইংরাজিতে দিল মত।
শিখা কাটি সিঁথি রাখিল মাথায়
দেখিব আর বা কত।

(১৬)

মলমাস তত্ত্ব কিংবা প্রায়শ্চিত্ত
নাহি পড়ে স্মৃতি-ন্যায়।
ব্যবস্থা বিধান করিলে জিজ্ঞাসা
বিষম বিপদ তায়।

(১৭)

বিষম বিপদে যেই মহাজন
টাকা দিয়া রাখে দায়।
তাহারেই কহে নিঠুর শাইলক্
দোষ তার টাকা চায়।

(১৮)

ব্যবসা বাণিজ্যে নাহি সুখ আর
ধারে বিক্রি সমুদায়।
প্রাপ্য টাকা চাও অসন্তুষ্ট সবে
মূল ধন শেষে যায়।

(১৯)

স্বার্থলিপ্সু সবে সুখপ্রিয় অতি
আত্মসুখ শুধু চাই।
পর উপকার পূর্ব্বকার মত
কার আছে দেখি নাই।

(২০)

কি ছিল কি হ'ল কিবা হ'বে পরে
গেল পুরাতন চা'ল্।
কার সাধ্য বলে কেবা দোষ ধরে
এমনি পড়েছে কাল।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ।

—o—

গতবারে রঘুনন্দনের নামোল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহার গ্রন্থ-তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ব্যতিরেকে আরও অনেক গ্রন্থ, তাঁহার কর্ত্তৃক বিরচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল।

১। মলমাস তত্ত্ব।
২। দায়ভাগ তত্ত্ব।
৩। সংস্কার তত্ত্ব।
৪। শুদ্ধি তত্ত্ব।
৫। প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।
৬। উদ্বাহ তত্ত্ব।
৭। তিথি তত্ত্ব
৮। জন্মাষ্টমী।
৯। দুর্গাপূজা তত্ত্ব।
১০। ব্যবহার তত্ত্ব।
১১। একাদশী তত্ত্ব।
১২। জলাশয়োৎসর্গ তত্ত্ব।
১৩। ঋগ্বেদীয় বৃষোৎসর্গ তত্ত্ব
১৪। যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গ তত্ত্ব।
১৫। সামবেদীয় বৃষোৎসর্গ তত্ত্ব।
১৬। শ্রাদ্ধ তত্ত্ব।
১৭। ব্রত তত্ত্ব।
১৮। দেবপ্রতিষ্ঠা তত্ত্ব
১৯। পরীক্ষা তত্ত্ব।
২০। জ্যোতিষ ত।
২১। বাস্তুযাগ তত্ত্ব।
২২। দীক্ষা তত্ত্ব।
২৩। আহ্নিক তত্ত্ব।
২৪। কৃত্য তত্ত্ব
২৫। শূদ্রকৃত্য তত্ত্ব।
২৬। মঠপ্রতিষ্ঠা তত্ত্ব।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম তত্ত্ব
২৮। সামবেদীয় যজুঃশ্রাদ্ধ তত্ত্ব।

এতদ্ভিন্ন রাসযাত্রা-পদ্ধতি, ত্রিপুস্কর-শান্তিতত্ত্ব, সঙ্কল্পচন্দ্রিকা, দ্বাদশযাত্রা-তত্ত্বাদিও রঘুনন্দন-বিরচিত বলিয়া খ্যাত।

এইবার দেখিব, খানাকুল-কৃষ্ণনগর পীঠস্থান কি না। পীঠস্থানের তালিকা এই,—

অঙ্গের নাম।	কোন্ স্থানে পতিত হয়।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
১। ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গুলায় বা হিঙ্গুলের	কোট্টরী	ভীমলোচন
২। ত্রিনেত্র	সর্করে	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৩। নেত্রাংশ	তারায়	তারিণী	উন্মত্ত
৪। বাম কর্ণ	করতোয়া তটে	অপর্ণা	বামেশ
৫। দক্ষিণ কর্ণ	শ্রীপর্ব্বতে	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ
৬। নাসিকা	সুগন্ধায়	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৭। মনঃ	বক্রনাথে	পাপহরা	বক্রনাথ
৮। বামগণ্ড	গোদাবরীতে	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ
৯। দক্ষিণ গণ্ড	গণ্ডকীতে	গণ্ডকী চণ্ডী	চক্রপাণি
১০। ঊর্দ্ধদন্ত	অনলে	নারায়ণী	সংক্রুর
১১। অধোদন্ত	পঞ্চসাগরে	বরাহী	মহারুদ্র

অঙ্গের নাম।	কোন্ স্থানে পতিত হয়।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
১২। জিহ্বা	জ্বালামুখীতে	অম্বিকা	বটকেশ্বর বা উন্মত্ত
১৩। কণ্ঠ	কাশ্মীরে	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্য
১৪। গ্রীবা	শ্রীহট্টে	মহালক্ষ্মী	সর্ব্বানন্দ
১৫। ওষ্ঠ	ভৈরব পর্ব্বতে	অবন্তী	নম্রকর্ম্ম
১৬। অধর	প্রভাসে	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
১৭। মর্ম্ম	প্রভাস খণ্ডে	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বর
১৮। চিবুক	জনস্থানে	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
১৯। দ্বিহস্তাঙ্গুলি	প্রয়াগে	কমলা বা কল্যাণী	বেণীমাধব
২০। ডান হস্তার্দ্ধ, বাম হস্ত	(মানস-সরোবরে)	দাক্ষায়ণী	হর
২১। ডান হস্তার্দ্ধ	চট্টগ্রামে	ভবানী	চন্দ্রশেখর
২২। বামস্কন্ধ	মিথিলায়	মহাদেবী	মহোদর
২৩। ডানস্কন্ধ	রত্নাবলী	শিবা	শিব বা কুমার
২৪। বামমণিবন্ধ	মণিবন্ধে	গায়ত্রী	শঙ্কর বা সর্ব্বান
২৫। ডান মণিবন্ধ	মণিবেদে	সাবিত্রী	স্থাণু
২৬। বাম কনুই	উজ্জানিতে	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৭। ডান কনুই	রণখণ্ডে	বাহুলাক্ষী	মহাকাল
২৮। বাম বাহু	বাহুলায়ে	বাহুলা	ভীরুক
২৯। ডান বাহু	বক্রেশ্বরে	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
৩০। বাম স্তন	জালন্ধরে	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১। ডান স্তন	রামগিরিতে	শিবানী	চণ্ড
৩২। পৃষ্ঠ	বৈবস্বতে	ত্রিপুটা	শমনকর্ম্ম
৩৩। হৃদয়	বৈদ্যনাথে	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৩৪। নাভি	উৎকলে	বিজয়া	জয়
৩৫। জঠর	হরিদ্বারে	ভৈরবী	বক্র
৩৬। কোঁক	কোঁকে	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
৩৭। কাঁকালি	কাঞ্চীদেশে	বেদগর্ভা	রুরু
৩৮। বাম-নিতম্ব	কালমাধবে	কালী	অসিতাঙ্গ

অঙ্গের নাম।	কোন্ স্থানে পতিত হয়।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
৩৯। ডাননিতম্ব	নর্ম্মদা	শোণাক্ষী	ভদ্রসেন
৪০। মহামুদ্রা	কামরূপে	কামাখ্যা দেবী	রাবানন্দ
৪১। বামজানু	মগধে	শুভচণ্ডী	তাম্র
৪২। ডানজানু	স্রোতায়	চণ্ডিকা	সদানন্দ
৪৩। বামজঙ্ঘা	জয়ন্তায়	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৪৪। ডানজঙ্ঘা	নেপালে	মহাকায়া বা নবদুর্গা	কপালী
৪৫। বামপদ	ত্রিস্রোতা	অমরী	অমর
৪৬। ডানপদ	ত্রিপুরায়	ত্রিপুরা	নল
৪৭। ডান পদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রামে	যোগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ড
৪৮। ডানপদাঙ্গুলি চতুষ্টয় কালীঘাটে		কালিকা	নকুলেশ
৪৯। বাম গুল্ফ	বিভাগে	ভীমরূপা	কাপালী
৫০। ডান গুল্ফ	কুরুক্ষেত্রে	সাবিত্রী বা বিমলা	সম্বর্ত্ত
৫১। বাম পদাঙ্গুলি	বিন্ধ্যশেখরে	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন

ভৈরব, ভৈরবী, সতীর অঙ্গ ও স্থানের নাম মিলাইয়া দেখিয়া জানা গেল, খানাকুল-কৃষ্ণনগর পীঠস্থান নয়। কেহ কেহ বলেন বা বলিতেন, এখানে দেবীর স্তন পতিত হইয়াছিল। কোন্ স্তন পড়িয়াছিল, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। দক্ষিণ বা বাম যে স্তন পতিত হউক, এইরূপ তালিকা হইতেছে। যথা—

সংখ্যা	অঙ্গের নাম	কোন্ স্থানে পতিত	ভৈরবীর নাম	ভৈরবের নাম
৩০	বাম স্তন	জালন্ধরে	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১	দক্ষিণ স্তন	রামগিরিতে	শিবানী	চণ্ড

(১) কোন কোন মতে খানাকুল-কৃষ্ণনগর পীঠ স্থান। কোন কোন মতে উহা অন্যতম উপপীঠ। "নিজেশ্বর তন্ত্র" মতে উহা পীঠের অন্তর্গত; কিন্তু "তন্ত্রচুড়ামণির" তাহা হইতেছে না। "তন্ত্র চূড়ামণিতে" দেবীর পতিত অঙ্গ, ভৈরব ও দেবীর যাদৃশ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ইহাকে পীঠ খ্যাতি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কেননা এখানকার যে দেবীকে লইয়া পীঠ কল্পনা, সে দেবীর নাম "ভগবতী।" ভৈরবের নাম "ঘণ্টেশ্বর"। 'স্তন' পতিত হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহার সঙ্গে দেবী, ভৈরব ও স্থানের অনৈক্য ঘটিতেছে। অতএব "নিজেশ্বর" তন্ত্রের উক্ত "পীঠ" শব্দে ইহা উপপীঠ মধ্যেই পরিগণ্য হইল।

(২) রাজা রামমোহন রায়, এই খানাকুল-কৃষ্ণনগরাধিবাসী। ইংরেজাধিকারে ভারতে যাঁহার সমকক্ষ জ্ঞানবীর সঞ্জাত হন নাই, সেই রামমোহনকে খানাকুল সমাজ বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

(৩) রামমোহনের জ্যেষ্ঠ তনয় বাবু রাধাপ্রসাদ রায় মহোদয়ও সাধারণ্যে অসাধারণ ক্রিয়ার নিমিত্ত খ্যাতনামা না হউন, তিনি বিদ্যোৎসাহী ও এতদঞ্চলের হিতৈষী। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, "তত্ত্ববোধিনী সভার" অন্তর্গত যে পেপার কমিটির গ্রন্থ-সম্পাদক, তিনি তাহার অন্যতম গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বিদ্যাবত্তার ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়!

(৪) রাজা রামমোহনের দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ও এখানকার নিবাসী। তিনি তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সরকারী উকিল ছিলেন। উত্তর কালে ঐ উচ্চ বিচারালয়ের জজিয়তী তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হন।

(৫)খানাকুল-কৃষ্ণনগর হইতেই বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্রভৃতি ভ্রাতারা উৎপন্ন হন। প্রথমোক্ত মহাত্মা কলিকাতাস্থিত গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল (অধ্যক্ষ) হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার স্কুলপ্রণালী-সম্মত সরল ভাষায় রচিত "পাটীগণিত" ও "বীজগণিত" তাঁহারই প্রণীত। ডাক্তার সূর্য্যকুমার কলিকাতার এক গণনীয় চিকিৎসক। তৃতীয়—হিন্দুপেট্রিয়টের বর্ত্তমান সম্পাদক।

(৬) অত্রত্য আদিম ভূম্যধিকারী চৌধুরীরা কায়স্থের গোষ্ঠিপতি ছিলেন। তাঁহাদের সকাশ হইতেই বরণীয় মাল্য ক্রয় করায় বর্ত্তমান গোষ্ঠীপতিরা প্রতাপবান্ হইয়াছেন।

(৭) বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থেরও বাস—এই প্রদেশে। তাঁহারা সর্ব্বাধিকারী উপাধি-প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন চতুষ্পাঠী, ইংরেজি ও বঙ্গীয় বিদ্যালয়, ষ্টুডেণ্ট শিপ, এম্, এ, বি এ, এলে ইত্যাদি উপাধিধারী ইংরেজি শিক্ষিত বিদ্বান্, সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ইত্যাদিরও অসদ্ভাব নাই।

এরূপ প্রাচীন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনায়—তাহার উৎপত্তি, গতি, স্থিতি নির্ণয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গ যে বহু শিক্ষা লাভ করিবেন,—স্থানে স্থানে কৌতুকপ্রদ এবং অনৈসর্গিক ব্যাপার পাঠ করিয়া পুলকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের—শুধু বঙ্গের—কেন সমগ্র ভারতভূমির বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না—প্রাচীন নিভৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব কল্পনাময় ও অলীক উপাখ্যানরাশি হইতে নিকাশিত করা, এক রূপ অসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এই থানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ-সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা বলিব, তাহাতে যে ভ্রমের লেশ মাত্র থাকিবে না, এ কথা আমরা বলিতে সাহসী নহি।

ন্যূনাধিক ৮০০ সালে (১৩১৫ শকাব্দে, ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে) থানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের সূত্রপাত হয়। তৎপূর্ব্বে গ্রাম গুলির অস্তিত্ব ছিল মাত্র। এই সময় হইতে ইহাদের গৌরব-যশোভাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। জেলা হুগলীর* জাহানাবাদ সব্‌ডিভিজনের অন্তর্গত থানাকুল গ্রাম। থানাকুলে পুলিষের একটী প্রধান থানা অধিষ্ঠিত। থানাকুলের উত্তরে বৃহৎ গ্রাম কৃষ্ণনগর। এই দুই গ্রামের সমন্বয়ে থানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ নামকরণ হইয়াছে।

থানাকুল গ্রামটী বহু প্রাচীন। শিবের সহস্র নামের একস্থানে আছে,—

* পূর্ব্বে থানাকুল-কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত থাকে। কাগজ-পত্রে তখন "বর্দ্ধমান চাক্‌লে" লিখিত হইত। তাহার অনেক পরে "বর্দ্ধমান" 'জেলায়' পরিণত হয়। থানাকুল-কৃষ্ণনগর তখনও বর্দ্ধমান জেলার সীমাভুক্ত ছিল। পরে হুগলী জেলার সীমান্তর্গত হইয়াছে।

"রত্নাকরতীরে তিষ্ঠতি ঘণ্টেশ্বরঃ"

এখনও খানাকুল গ্রামে ঘণ্টেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ঘণ্টেশ্বর শিবলিঙ্গ নদীতীরে বিরাজিত আছেন বটে, কিন্তু সে নদীর নাম এক্ষণে আর রত্নেশ্বর নাই। এক্ষণে ঐ নদীর নাম "কাণানদী"। এই নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটি বিস্ময়জনক প্রবাদ এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। পশ্চাৎ আমরা পাঠকবর্গকে জানাইব।

"খানাকুল" এই নামটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গুলি কৌতুকাবহ বিস্ময়কর ও অশ্রুতপূর্ব্ব কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোকের মতে নদীর বক্র গতিতে যে স্থান কোণ বিশিষ্ট হয়, তাহাকে "কুল" বলে। "খানা" শব্দের অর্থ "খাদ" "গর্ত্ত"। এই উভয় শব্দের যোগে "খানাকুল" হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে"খানাকুল"গ্রামটীও নদীর এইরূপ বক্র গতির উপর অবস্থিত। খানাকুল নামের উৎপত্তি বিষয়ে অন্যান্য জনশ্রুতি আমরা যথা-স্থানে বিবৃত করিব। কারণ তাহার সহিত অন্য সব আখ্যায়িকা সংযুক্ত আছে। এখানে সে সকল আখ্যায়িকা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

কৃষ্ণনগর সুবৃহৎ গ্রাম হইলেও ইহার উৎপত্তি খানাকুলের পরে বলিয়া বিবেচিত হয়। জাহানাবাদের নিম্নে যে দারকেশ্বর নদ প্রবাহিত, উহা বহু পূর্ব্বে ধামলা ও পাতুল গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। ঐ নদই খানাকুলের নিম্নে আসিয়া "রত্নাকর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধামলা—খানাকুলের পূর্ব্বোত্তর, পাতুল—পশ্চিমোত্তর। এতদুভয় গ্রাম পরস্পর সার্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানবর্ত্তী। ধামলা হইতে পাতুল গ্রামে যাইত বহু পূর্ব্বে তদ্দেশবাসীরা নৌকা-যোগে যাতায়াত করিত। পাতুলের অর্জ্জুন বৃক্ষে নৌকাদি-বন্ধনের রজ্জুর দাগ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে ধামলাতেই প্রধান প্রধান লোকের বাস ছিল। কিন্তু কালের অপ্রতি-হত প্রভাবে দারকেশ্বরের গতি ফিরিল। নদী সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমোত্তর ভাগে যাইয়া বাঁটালের এক ক্রোশ নিম্নে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত হইল। সেখানে এই দারকেশ্বরের, নাম শঙ্কর। যাহা হউক, নদীও বিলুপ্ত হইল, অমনই সেইখানে নূতন

গ্রাম সকল দৃষ্ট হইল (৬)। এই সকল গ্রামই এখন কৃষ্ণনগর, রাধা-নগর ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। ধামলা প্রভৃতি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রধান প্রধান লোকেরা নূতন গ্রাম সকলে বসতি স্থাপনা করিতে লাগিল। কালক্রমে পরিত্যক্ত গ্রাম সকল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইল। ধামলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের কৃষিক্ষেত্রে এখনও বহুপূর্ব্বকালের ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকাদির ভগ্নাবশিষ্ট ভিত্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, এক্ষণে যাহা "কাণা নদী"—ইহাই পূর্ব্ব কালের দারকেশ্বর নদের ছিন্ন প্রবাহ। খানা-কুলের নিকট উহা পূর্ব্বে "রত্নাকর" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। (৭)

এবার আমাদিগকে পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বাপর যুগে যে শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সখা ছিলেন, তিনিই কলি যুগে অভিরাম গোপাল নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাতে অভিরাম গোস্বামী দ্বাদশ গোপালের মধ্যে এক প্রধান গোপাল। অভিরাম গোপাল গোস্বামী ১৩১৬ শকে আবির্ভূত হন। তৎপরে ১৪০৭ শক হইতে ১৪৫৬ শকেও (শ্রীচৈতন্য দেবের জীবন কালে) ভবধামে বিরাজমান ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, অভিরাম গোস্বামী

(৬) এ ব্যাপার অত্যাশ্চার্য্য নহে। প্রাকৃত ভূগোল পাঠে অবগত হওয়া যায়, বঙ্গ দেশের অনেক স্থল, নদ-নদীর চর হইতে উৎপন্ন।

(৭) ইহার তিনটী প্রবল প্রমাণ আছে। যথা—

(ক) লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিব-পার্ব্বতী সংবাদে পীঠাদি-ক্রমে মহাদেবের শতনাম-স্তব রহিয়াছে। তাহার এক স্থানে স্পষ্টই লেখা আছে—

"ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি! রত্নাকর-নদী-তটে।
ভাগীরথী-নদী-তটে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥"

স্বীয় অভীষ্ট দেব কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে এই খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এবং নদীতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় অভীষ্টদেবের চিন্তায় নিয়োজিত থাকেন। মতান্তরে অভিরাম গোপাল বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া নানা দেশ পর্য্যাটনান্তে অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া স্বীয় অভীষ্ট দেবকে প্রাপ্ত হন। তিনি তখন শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তিতে বিরাজমান। পরে তাঁহারই আদেশ ক্রমে অভিরাম গোস্বামী কৃষ্ণনগরে গোপীনাথ জিউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই মত সুসঙ্গত নয়।

গোপীনাথ বিগ্রহ রামকুণ্ড নামক জলাশয় খনন করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অভিরাম লীলামৃত পাঠে আমরা অবগত হই, যে অভিরাম গোস্বামী স্বেচ্ছায় কৃষ্ণনগর আসিয়াছিলেন। তিনি এক স্থলে শ্রীচৈতন্য দেবকে বলিতেছেন——

"শ্রীকৃষ্ণ নগরে আমি করিব প্রকাশ।
একেলা যাইব আমি কহিনু নির্ব্বাস॥

শীঘ্রগতি যাহ তুমি সবারে লইয়া।
পুনশ্চ মিলিব আমি তোমারে আসিয়া॥

(খ) "অভিরাম তত্ত্ব" গ্রন্থেও উহার সংজ্ঞা "রত্নাকর"। "রত্নাকর" নাম হওয়ার আনুষাঙ্গিক অন্ত বৃত্তান্তও দেখা যায়—

অভিরামের কৌপীন ভাসাইল স্রোতে।
কাঁপিছে গোসাঞি হয়ে ক্রোধান্বিতে॥
অন্ধ হও রত্নাকর ইথে গেল জানা।
তিন শত বৎসর বাদে হবে কানা॥
রত্নের আকর নদী খ্যাত রত্নাকর।
হেন মতে অভিশপ্ত হৈল দ্বারকেশ্বর॥

(গ) খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের প্রায় ক্রোশত্রয় পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত তাজপুর গ্রামের সমীপ দিয়া এই দ্বারকেশ্বর প্রবাহিত। তথায় উহা এখনও "রত্নাকর" নামেই আহূত হয়।

এতেক শুনিয়া সবে গমন করিলা।
একেলা গোঁসাঞি জীউ বিল্লোক আইলা ॥”(৮)

অভিরামের হরিসাধনার স্থল-সম্বন্ধে প্রধানতঃ আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। এক মতে তিনি বিল্লোকে (কৃষ্ণনগরের পশ্চিম-দক্ষিণে) মিঠে আম গাছের দক্ষিণ পূর্ব্বে সত্যপীরের আস্তানার নিকটে নদীতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। উপরোক্ত শেষের শ্লোকটীও এইমত সমর্থন করিতেছে। অন্য মতে তিনি দারকেশ্বর তীরে কদমখণ্ডী নামক পরম রমণীয় অতি নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া আরাধনা করিতেন।

এরূপ মতদ্বৈধ বহু প্রকার রহিয়াছে। ফলতঃ অভিরাম গোপাল যে কৃষ্ণনগরে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন ইহা নিঃসন্দেহ।

দ্বাপরে যিনি বৃন্দা সখী ছিলেন, তিনিই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাতে মালিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া অভিরাম-সেবিকা হইয়াছিলেন।

মালিনীর উৎপত্তি অতি অলৌকিক বিস্ময়াবহ কথায় পূর্ণ। তাহা সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির সম্ভাবনা। যদি কোন পাঠকের একান্ত ঔৎসুক্য হয়, তিনি উক্ত অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে মালিনী বিবরণ নামে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে সমস্তই অবগত হইবেন।

এরূপ শোনা যায়, অভিরাম গোপাল এক সময়ে দ্বাদশ বৎসর দেশ পর্য্যটনে গমন করেন। সেই সময়ে মালিনী ঐ দেশবাসী অর্দ্ধ-যবন-ধর্ম্মাচারী এবং অর্দ্ধ হিন্দু ধর্ম্মাচারী “কাবাড়ী” জাতির বাটীতে বাস করিতেন। কাবাড়ীরা মালিনীকে অন্ন ব্যঞ্জন দিতেন; মালিনী কিন্তু সে সকল গ্রহণ না করিয়া পুষ্করিণীর জলে এবং বনজাত-ফল মূলে ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করিয়া অন্নব্যঞ্জন পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রামের খানায় অর্থাৎ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেন। যে গ্রামের গর্ত্তে এই সব নিক্ষিপ্ত হইত, উহাই অতঃপর “খানাকুল” নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইহাই “খানাকুল” নামোৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ।

(৮) অভিরামলীলামৃত, ৬ষ্ঠ, পরিচ্ছেদ, ৪১ পৃষ্ঠা।

মালিনীর সম্বন্ধে অন্য মতও প্রচলিত আছে। মালিনী অভিরাম গোস্বামীর সহিত মিলিত হইবার আশায় বহু দূর হইতে কৃষ্ণনগরে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় মুসলমানের আলয়ে নিশাতিবাহন করেন। সুতরাং এই যবন-গৃহ-বাসিনী স্ত্রীর সহিত অভিরামকে বাস করিতে দেখিয়া সকলে নানা রূপ কানাকানি করিতে লাগিল। অভিরাম গোস্বামী এই ঘটনার কিছুপরে চৈত্রী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে উপলক্ষে গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিয়াছিল। সকলে আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় মালিনী অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া পরিবেশন করিতে আসিলে, কেহ কেহ তাঁহার অন্ন গ্রহণে যে সময় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, সেই সময়েই বায়ুবেগে মালিনীর মস্তকের অবগুণ্ঠন স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়িল। নিমন্ত্রিত-গণের মধ্যে যাদবেন্দু রায় চৌধুরী সকলের সহিত একমত হইলেন যে, এই সময়ই মালিনীকে পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়। সকলেই স্থির করিলেন, মালিনী হয় নির্লজ্জার ন্যায় এই অবস্থাতেই অন্ন পরিবেশন করিবে, নয় যবনের আচারে এই হস্তেই মস্তকে অবগুণ্ঠন দিবে। কিন্তু মালিনী এতদুভয়ের কিছুই করিলেন না। তিনি দৈবী শক্তি প্রভাবে পৃষ্ঠদেশ হইতে অন্য দুই হস্ত বহির্গত হইয়া তদ্দ্বারাই মস্তকে অবগুণ্ঠন দিলেন (১)। উপস্থিত সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। কাহারও আর, বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু চৌধুরী শাপগ্রস্ত হইলেন—

'তোর মস্তক যবনে ছিন্ন করিবে।'

তথাপি কিন্তু সকলে আহার করিল না। মালিনীর চরিত্র-পরীক্ষার জন্য সেই সব অন্ন-ব্যঞ্জন পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে খানা কাটিয়া তথায় প্রোথিত হইল। যদি এক মাস পরেও ঐ সব অন্ন-ব্যঞ্জন উষ্ণ ও অবিকৃত থাকে, তবেই মালিনীর বিশুদ্ধ চরিত্র সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। প্রবাদ—অন্নাদি উষ্ণ ও অবিকৃত ছিল। মালিনীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি গোপীনাথ জীউর মন্দিরে বিরাজ করিতেছে।

(১) এইরূপ বৃত্তান্ত কৃষ্ণভক্ত মহাকবি চণ্ডীদাসের জীবনীতেও উল্লিখিত আছে।

যে গ্রামে ঐ সকল অন্নব্যঞ্জন প্রোথিত করা হইয়াছিল, উহাই পরে "খানাকুল" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিল। ইহাই "খানাকুল" নামোৎপত্তির তৃতীয় কারণ। এই সকল কারণ দেখাইয়া অনেকে বলেন, ঐ গ্রামের "খানাকুল" নাম আধুনিক। পূর্ব্বে উহার 'কাজিপুর' নাম ছিল।

একদা অভিরাম গোপাল, দ্বারকেশ্বরে নিজকৌপীন ধৌত করিতে-ছিলেন। দ্বারকেশ্বরের প্রবল প্রবাহে তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাহাতে তিনি কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করেন, "আজ হ'তে তুই কাণা হ'বি" সেই হইতেই এখানকার নদী "কাণা নদী" নামে বিখ্যাত।

অতঃপর অভিরাম গোস্বামী হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া দিবানিশি হরিনাম সংকীর্ত্তনে ধ্যানিমগ্ন থাকিতেন, যেমন নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ, তেমনই তিনি কৃষ্ণনগরে হরিনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরও নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সম্যক অনুশীলন হইতে লাগিল। সর্ব্ব রূপেই কৃষ্ণনগর তখন নবদ্বীপতুল্য হইয়া উঠিল। তাই অভিলীলামৃত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ——

"শ্রীকৃষ্ণনগর হইল দ্বিতীয় নদীয়া।
নিন্দন করয়ে লোক বৈষ্ণব দেখিয়া॥"

কেবল যে বৈষ্ণব নিন্দা সম্বন্ধে নবদ্বীপের সহিত কৃষ্ণনগরের তখন সমাবস্থা, তাহা নহে; সকল রকমেই কৃষ্ণনগর তখন নবদ্বীপ-তুল্য, ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার মনের ভাব।

সেই সময়কার নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ ছিল, জানা উচিত। মাননীয় শিশিরকুমার বাবু লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল, তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় নাই। নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল। ভদ্র অন্ন চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব—বিদ্যা উপার্জ্জনই জীবের পরম সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত, সেই মনুষ্য, সেই রূপবান্ সেই কুলীন ও সেই সুখী। * * * স্ত্রীলোক ঘাটে শাস্ত্রচর্চা করিতেছে। বালকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যা-যুদ্ধ করিতেছে। আর পড়ুয়াগণ নগর

একেবারে অধিকার করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহস্র পড়ুয়া। পুঁথী তাহাদের ভূষণ। পুঁথী তাহাদের সখা, বন্ধু ও বল।”

উপরে নবদ্বীপের যে অবস্থা বর্ণিত হইল, খানাকুল কৃষ্ণনগর সম্বন্ধেও ঐ সব কথা যথা-প্রযুক্ত। ভাবিতে কৃষ্ণনগর তখন বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান—খানাকুল গৌরবের কি অত্যুন্নত শিখরে সমারূঢ়! কিন্তু হায় সে সব আজ কোথায় গেল! এখন সে সব অনন্ত গৌরবের ছায়ামাত্র, অবশিষ্ট আছে সব গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশী।

পূর্ণিত চৌ-দিক্ সদা,
বিমল তোমার বাসে,
এই আশা ক'রে আমি,
এসেছিনু তব পাসে।
শুনেছি তোমার হাসি,
মনের বেদনা নাশে,
তাই আশা ছিল মনে,
ঘুচাব বেদনা হাসে।
কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট,
নিঠুর তোমার প্রাণ,
উপেক্ষা-সলিলে ঠেলে'
ফেলে' দিলে মোর গান।
আর না বাসিবে ভাল,
মনে কি করেছ স্থির ?
নাহি বাস, ক্ষতি নাই,
ক্লান্ত এ নয়ন নীর।
সদাই বহিবে ধুয়ে,
তোমার প্রতিমা-পদ।
বিবশ মানস-মাঝে,
তব পদ-কোকনদ।
ধুইয়া যে সুখ হবে,
সে সুখের তুলা কই ?
ভাল না বাসিবে যদি,
যাও তবে দূরে যাও,
দূরে দূরে বহু দূরে।
দূরে গিয়া গান গাও,
আর না কখন যেন,
তোমার মধুর গান।
ময়মে পশিয়া মোর,
আকুল করয়ে প্রাণ।
ও মধু মূরতি যেন
কভু না সমুখে আসে,
পরাণ আর না যেন,
পুলকিত হয় বাসে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মীর জাফর আলি।

ইংরেজ সেনাপতি প্রসন্ন হইলেন, সেই রাত্রিতেই জাফরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে ইংরেজ সেনাপতির স্বার্থও ছিল। বাঙ্গালী যুদ্ধের পরদিনই বঙ্গের অধিকার গ্রহণ করিলে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। পশ্চিমে মহারাষ্ট্রবল তখন, অক্ষুণ্ণ না হইলেও, একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, দীল্লির সম্রাট সাহ আলম হীনপ্রভাব হইলেও অকবরের বংশধর বলিয়া সাধারণের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিলেন, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও নির্জীব ছিলেন না; এই বিবিধ বল একত্র কার্য্য করিলে ইংরেজের বিলক্ষণ বিপদের শঙ্কা বুঝিয়া ক্লাইব তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। অধিকন্তু কামদুঘার ন্যায় বঙ্গের নবাবকে দোহন করিবারও সুবিধা থাকিবে না। জাফর আলি ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে যে প্রচুর অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাও পাওয়া যাইবে না। এই সাত পাঁচ ভাবিয়া চতুর-চূড়ামণি ক্লাইব কয়েক দিন পরে সদলে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া জাফরআলিকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে বসাইলেন। জাফরের পাশব প্রকৃতি পুত্র মীরণ নিষ্ঠুরতার সিরাজের প্রাণ সংহার করিল। যে জাফর একদিন আলি-বর্দ্দির অনুগ্রহ-লাভ-লালসায় তাঁহার চরণ প্রান্তে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পাইলেও আপনাকে সফল জন্ম জ্ঞান করিতেন। আজি তিনি বঙ্গেশ্বর হইয়া কত লোকের অদৃষ্ট পরিচালনার অধিকার লাভ করিলেন। জাফরের যাহা হইল. তাহা তাঁহার দুর্ম্মতিসম্ভূত দুষ্ক্রিয়ার আপাত-মধুর ফল, তাঁহার কর্ম্মফল নহে, সেই ফল তাঁহার ভবিষ্য জীবনের জন্য এখন হইতে কর্ম্মজপ কুসমের গর্ভকেশরে নিহিত রহিল।

জাফর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব হইয়াই দেখিলেন, তিনি ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে কুট্ট দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রাজ-কোষে সঞ্চিত নাই। টানাটানি করিয়া তাহার অর্দ্ধেক আন্দাজ পরিপূরণের সম্ভাবনা হইল। তখন ইংরেজ তাহাই পাইয়া সন্তুষ্ট

হইলেন। ঐ টাকা সাত শত বাক্সে একশত নৌকায় বোঝাই হইয়া কলিকাতা যাইবার জন্য ভাগীরথী বক্ষে ভাসমান হইল। নৌকায় ইংরেজের সিংহ শার্দ্দুলাঙ্কিত নিশান উড়িতে লাগিল, ইংরেজের তূর্য্য ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক শব্দিত হইয়া উঠিল। তৎসঙ্গে বঙ্গদেশস্থ ইংরেজের আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনে আশা ও উৎসাহের উচ্ছ্বাস উঠিতে থাকিল, নবাবের অর্থে সকলেই সঞ্চয়বান্ এতদুপলক্ষে সন্ধিপত্রে যাহাদিগের যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহারা ব্যতীত অপর সাধারণ ইংরেজের পক্ষেও বিবেচনার ত্রুটি হইল না; সকলেই অল্পাধিক হইলেন।

জাফর. ক্লাইবের অনুগ্রহে বঙ্গেশ্বর, তাঁহার যে কিছু সুখৈশ্বর্য্য ক্লাইব তাহার বিধাতা পুরুষ, সুতরাং তিনি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। জাফর মুর্শিদাবাদে আর ক্লাইব কলিকাতায়,—মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে মাছিটী উড়িলে, পতঙ্গটি ডাকিলে এমন কি একটু জোরে বায়ু বহিলে জাফরের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, পাপি-মাত্রেরই মন এইরূপ শান্তিশূন্য হইয়া থাকে। স্তনন্ধয় শিশু যেন জননীর অঙ্ক ছাড়া তিলেক থাকিতে ইচ্ছা করে না, জাফরও তদ্রূপ ক্লাইবকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পরে উপযুক্ত শাসনাভাবে রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার গোলযোগ—অসুখ অশান্তি প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া উঠিল। জাফরের পরম হিতেচ্ছু রাজা রায়দুলর্ভ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ আরম্ভ করিলেন, এই সময়ে অযোধ্যার নবাব বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এ বিপদে ক্লাইব ভিন্ন গত্যন্তর নাই, কিন্তু অঙ্গীকৃত টাকা সমস্ত পরিশোধ করিতে না পারায় ক্লাইব জাফরের প্রতি পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন ছিলেন না। সে যাহা হউক আশ্রিতের উপকারার্থে ক্লাইব নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে আসিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে পাটনা যাত্রা করিলেন। ক্লাইবের অভিযানে শত্রুগণ ভীত হইয়া আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনে ক্ষান্ত হইলেন। এই যাত্রাতেই ক্লাইব, ইংরেজ কোম্পানী ও সুবাদার উভয়েরই হিতার্থে দীল্লির সম্রাটের নিকট হইতে মীর জাফরের বঙ্গদেশের নবাবী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সকল দিক্

বজায় রহিল। এইরূপে মীর জাফারকে করিয়া ভীতিশূন্য ক্লাইব কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন. কিন্তু শিশুকে "জুজুর" ভয় দেখাইলে সে যেমন মাতৃ-অঙ্কে মুখ লুকায়িত করিয়া তাঁহার গলদেশ বাহু বেষ্টনে জড়িয়া-ধরে, ভীরুস্বভাব জাফরও, তদ্রূপে সামান্য ভয় পাইলেই ক্লাইবের শরণ লইতে আরম্ভ করিলেন।

ক্লাইবের কলিকাতা গমনের কিছু দিন পরেই মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে বিষম গোলযোগ চলিতে থাকে; মীরজাফের আলি কাজ কর্ম্ম কিছুই দেখিতেন না. সর্ব্বদা অহিফেন-সেবনে বারবিলাসিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখসেবায় নবাবজীবন সার্থক করিতেন। কাজ কর্ম্ম আমলাদের দ্বারাই চলিত; রাজ্যের শুভাশুভ, প্রজার সুখদুঃখের প্রতি কাহার দৃষ্টি ছিলনা, সকলেই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, অর্থ দ্বারা সকল কার্য্যই হইত। অন্যায় ন্যায় হইত, ন্যায় অন্যায় হইত। আদালতে বিচার বিক্রয় হইত; একের স্বত্ব অপরে গ্রহণ করিত, আদালতের বিচারক অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। "জোর যার মুলুক তার" এই সময়েরই কথা। দুর্ব্বলের বল ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ছিল না। মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কে কি করে, তাহার স্থিরতা নাই, সকলেই স্বেচ্ছাচারী।

এই সময়েই দীল্লির বাদসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ফরাসীদিগ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ কুলির সাহায্যে ও আপন প্রভুত্বয়ে বহুল সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক পাটনা আক্রমণ করিলেন। দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য মীর জাফরের বল বুদ্ধি ভরসা ক্লাইব। অগত্যা তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইল। ক্লাইব আপন অনুগত জনের সাহায্যার্থ যথারীতি আয়োজন করিয়া পাটনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাটপুত্র ক্লাইবের নাম শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইলে, বিশেষতঃ এই সময়ে অযোধ্যার নবাব, মহম্মদ ক্লাইব রাজধানী এলাহাবাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে অক্ষম হইয়াছিলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পিতার অবাধ্য, হইয়া এই রূপে নানা স্থানে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এজন্য তিনিও মীরজাফরকে আজ্ঞা দিলেন যেন অবাধ্য পুত্রকে ধরিয়া দীল্লিতে প্রেরণ করেন। ক্লাইব তাহা না করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ইহাকে

মীরজাফরের পক্ষে এই সুবিধা হইল যে, এ যাবৎ সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া আখ্যাত হইতেন এবং মীরজাফর নামে মাত্র তাঁহার সহকারী থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সুবাদারের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন, এখন হইতে তাহা ঘুচিয়া গেল। সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র এই অন্তঃসারশূন্য উপাধি পাইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় উপদ্রবী ছিলেন না।

ইহার পর জাফর, ক্লাইবকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা উপস্বত্বের জায়গীর দিয়া তাঁহাকে আপন দরবারের ওমরাহের উপাধি দান করিলেন। ক্লাইবকে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। বঙ্গদেশের সিংহাসনে উঠিতে না উঠিতেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তিনি অথবা তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ কখন কোন কারণে ইংরেজদিগের গমস্তাগণের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন এবং যাহাতে কোন প্রকারে তাহাদিগের কর্ম্মকাজের বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তৎ-পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করেন এরূপ অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লইয়াছিলেন। "The new Nabab was made to engage, "that he or his officers should on no account interfere with Gomastas of the English, but that care should be taken that their business might not be obstructed in any way." And these Gomastas so well availed themselves of this new acquired power that after the Company, had made their first Nabab Jaffer Ally Khan in the year, 1757, their bluck Gomastas in eyery District assumed a jurisdiction which even the authority of Rajas and Zemindars in the contrary durse not withstand—"Bolts on Indian affairs—এই সকল বাঙ্গালী গমস্তা এই নূতন ক্ষমতা লাভ করিয়া বঙ্গ দেশের প্রত্যেক জেলায় এত দূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজারাজড়া ও বড় বড় জমীদারের ও তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। শেষে স্বয়ং নবাবকেও তাহাদিগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতির ন্যায় ওলন্দাজেরাও এ দেশে বাণিজ্য করিতেন। চুচুড়ায় তাঁহাদিগের একটী কুটী ছিল। সিরাজের অত্যাচারে অপর সাধারণের ন্যায় তাঁহারাও যারপর নাই উৎপীড়িত হইয়া-

ছিলেন! এজন্য সিরাজের অধঃপতনে তাঁহারাও অসন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজের প্রতি ঈর্ষা বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁহারা জাফর আলির আধিপত্য স্বীকার করিতে ততটা সম্মত ছিলেন না। ইহাতে জাফর তাঁহাদিগের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার কলিকাতা যাত্রা কালে, চুচুড়া ও ওলন্দাজদিগের কুঠী হইতে উপযুক্ত সম্মান না পাইয়া তাঁহাদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ওলন্দাজেরা আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া উচিতাধিক বিনম্রভাব প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহারা নবাবের বিরক্তির কারণ বুঝিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তাহাতেই পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগের বাণিজ্য কার্য্য চলিতে লাগিল। এখন হইতে তাঁহারা নবাবের অনুগ্রহ লাভের নানা পথ দেখিতে লাগিলেন। নবাব মীর জাফর ইংরেজ অভিভাবকদিগের আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগের অধীনতা পাশ মোচনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। জননী জন্মভূমিকে পরহস্তে তুলিয়া দিয়া যে দুঃখ, যে যন্ত্রণা, তাহা মীর জাফরের ন্যায় হৃদয়হীন ব্যক্তিও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। গুপ্ত ষড়যন্ত্রে জাফর, বাল্যাবধিই অভ্যস্ত—তিনি ইংরেজদিগের প্রতিকূলাচরণ করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে এ দেশে প্রভূত পরিমাণে ওলন্দাজ সৈন্য আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওলন্দাজেরাও প্রস্তুত হইলেন। বাটেভিয়া নামক স্থানে তাঁহারা সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে অব্যবস্থিত নবাবের মনের গতি কতকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইংরেজ দুর্দ্ধর্ষ, ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহাদিগের শত্রু হইতে সাহসী হইলেন না। বাটেভিয়ায় সৈন্য সংগৃহীত হইলে মীর জাফরের মনোভাব ওলন্দাজদিগের গোচর হইল। ওলন্দাজদিগের সৈন্য-সমাগমের সংবাদ বুঝিয়া নবাব, ক্লাইবের শরণ গ্রহণ বোধের পরিচয় করিয়া দিবার পর কয়েক দিন মাত্র- অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ৮ই জানুয়ারি কলিষড় নবাবপুত্র মীরণকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল। সম্রাটপুত্র বিহার প্রবেশ করিতে করিতে তাঁহার পিতৃবিয়োগ কর্ত্তা অবগত হইয়া তদীয় উপাধি গ্রহণে আপনাকে পথিমধ্যে দিল্লীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিহার প্রদেশে পাটনা ও তন্নিকট বর্ত্তী

করিলেন। সৈন্য পরিপূরিত ওলন্দাজ-পোত, বঙ্গদেশে আসিয়া পঁহুছিল। নবাব তাহার প্রতিবাদ করিলেন। ওলন্দাজেরা এই উত্তর দিলেন যে নেগাপত্তন বন্দর যাইতে যাইতে বায়ুর প্রতিকূলতায় বিপথগামী হইয়া তাঁহাদিগের জাহাজ এ দেশে আসিয়াছে, ভোজ্য ও পানীয় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সংস্থান হইলেই জাহাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিবে। এরূপ উত্তরে ইংরেজের বিশ্বাসলাভ করিবে কেন:—জাহাজের ভিতর অনুসন্ধান করায় তন্মধ্যে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইল। এতদুপলক্ষে ইংরেজে ওলন্দাজে নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে। এই ঘটনার দুই মাস পরে আরও ছয়খানি ঐরূপ জাহাজ আসিয়া পঁহুছিল। ইহাতে ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মীর জাফরকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। কিন্তু একই সময়ে তিনি কি প্রকারে উভয় দিক্ রক্ষা করিতে পারেন? বিষম সমস্যা দাঁড়াইল। এক দিকে তিনি ওলন্দাজদিগকে অনুরোধ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, অপর দিকে চিরসুহৃদ্, মীর জাফরের পক্ষে তাহাতেও কিছু আসে যায় না, প্রবল পরাক্রম ও ভীতির পাত্র ইংরেজ যাঁহাদিগের কৃপাকণিকালাভের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, তিন চারি দিন হুগলীর দুর্গে অবস্থিতি করিয়া তিনি ওলন্দাজদিগকে তাড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু হুগলী ও চচুড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষগণকে যথোচিত সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা প্রদর্শন করিলেন এবং কয়েক দিন পরে ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি ওলন্দাজদিগকে এদেশে ব্যবসা করিতে দিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; তবে তাঁহারা উপযুক্ত সময় আসিলেই সেনিক পোত স্থানান্তরিত করিবেন। ক্লাইব তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, সকল কথাই বুঝিতে পারা গিয়াছে। তাহাদিগের চলিয়া যাইবার ইচ্ছাই ছিল না, তাঁহারা তাঁহার সম্মতি ক্রমেই সৈন্য আনয়ন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। ওলন্দাজেরা হুগলী নদী পরিত্যাগ না করিয়া চুচুড়া, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেই ইংরেজেরা বুঝিয়া লইলেন যে জাফরের সম্মতিব্যতিরেকে কখন তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। ইংরেজেরা

নবাবকে কিছু না বলিয়া ওলন্দাজদিগের মূলোৎপাটনে মনোযোগী হইলেন; দুই একটী যুদ্ধে তাঁহাদিগের জয়লাভ হইল; ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগের ক্ষতি-পূরণে সম্মত হইয়া সন্ধি করিলেন।

ইহার তিন দিন পরে জাফরের পুত্র মীরণ ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সজ্জায় চুচুড়ার অনতিদূরে শিবিরসংস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের অপরাধ এই যে, তাঁহারা ইংরেজদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছেন. এরূপ স্থলে নবাবের পক্ষে তাঁহাদিগের বন্ধুতা পরিপোষণ নিতান্ত অনুপযোগী। ওলন্দাজেরা ভীত হইয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলে তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় সন্ধি সংস্থাপিত হইল এবং নবাবের অদৃষ্টে কিঞ্চিৎ তৈলবট-প্রাপ্তিও ঘটিল। ইহার অব্যবহিত পরেই মান্দ্রাজ হইতে কর্ণেল কলিয়ড নামা সৈনিক পুরুষ বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। পঁহুছিয়া নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। উপর্য্যুপরি রণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, বিশেষতঃ কোর্ট অব ডিরেক্টর সভা তাঁহার কয়েকটী কার্য্যের প্রতি ঘোরতর দোষারোপ করায় বিলক্ষণ মনঃকষ্ট জন্মিয়াছিল, এ জন্য তিনি কলিয়ডকে সৈনিক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইহাতে জাফরের ভয়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি আপনাকে সর্ব্বদাই শত্রু পরিবেষ্টিত জ্ঞান করিতেন। ক্লাইবকে তুষ্ট করিতে গিয়া দেশের ছোট বড় ধনী নির্ধন সকলেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তাহারা কোম্পানীর গমস্তাগণের জ্বালায় অস্থির। ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণের অর্থের দাবী মিটাইতে তাঁহার রাজ-কোষ শূন্য হইয়াছে। সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট; স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ পুত্রের হস্তে তাঁহার ধন-প্রাণ সংশয়াপন্ন। তাই বলিয়া ক্লাইব তো চিরদিন এদেশে থাকিবেন না। এত দিন জাফর পর্ব্বতের অন্তরালে অথবা জননীর পক্ষ-পুটাশ্রিত পক্ষী শাবকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এইবার জাফরের সে আশ্রয় ঘুচিল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ও প্রামাণিক জীবনচরিতের আদর্শ পুস্তক

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ... ৸০ আনা।

(1) "As one of the framers of Bengali language and literature Akshayakumar's memoir possesses a general interest and importance."—Bengal Administration Report, 1885-86, pp 822-23.

(২) "অক্ষয় বাবু বাঙ্গালীর ঘরে কোহিনুর। * * মহেন্দ্র বাবু তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া, বাঙ্গালার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—[সঞ্জীবনী, ১২৯১ সাল, ২৮শে ভাদ্র।]

(৩) "এই জীবনী লিখিতে, গ্রন্থকার অনেক অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন।"—[পতাকা, ১২৯২ সাল, ১৩ই ভাদ্র।]

(৪) "গ্রন্থকার, অক্ষয় বাবুর স্থায় ব্যক্তির জীবনের চিত্র সাধারণের সুলভ করিয়া, একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন।"—[বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯২ সাল, আশ্বিন মাস।]

(৫) "অক্ষয় বাবুর ন্যায় এরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, গভীর গবেষণা, সার-গ্রাহিণী শক্তি, কোন বঙ্গীয় লেখকের নাই। সুখের বিষয়,—অক্ষয় বাবুর এই সমস্ত গুণ, অনেকাংশে তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ে বর্ত্তিয়াছে।"—[ঢাকাপ্রকাশ, ১২৯৪ সাল, ৬ই পৌষ।]

(৬) "আমরা মহেন্দ্র বাবুর প্রসাদাৎ অক্ষয় বাবুর এমন বিস্তৃত জীবন-চরিত বঙ্গভাষায় গ্রথিত দেখিয়া, বাস্তব অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি।"—[সারস্বত পত্র, ১২৯২ সাল, ২৪শে আশ্বিন।]

(৭) "মহেন্দ্র বাবুর ভাষা পরিপাটী এবং জীবনচরিত লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট আছে।"—নব্যভারত, ১২৯২ সাল, মাঘ।]

(৮) "আর্য্যদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। * * অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া যে, মহেন্দ্রবাবু ভাল করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"—[দৈনিক, ১২৯২ সাল, ১৮ই ভাদ্র।]

(৯) "লেখকের রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে। ভাষা স্থানে স্থানে অতি মনোরম।"—[তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৭ শক, ১লা মাঘ।]

(10) "It gives evidence of great research and industry, is well-arranged, well written and exhaustive."

—[Indian Nation, Sep. 14th, 1884]

(11) "The life of such an individual is full of solid instruction and Mahendranath Roy vidyanidhi has done a service to his country men."—[Indian Mirror, Nov. 24, 1884.]

(12) "The language of the work under notice is *chaste* and *simple* and the book is replete with interesting incidents and faithful descriptions throughout"—[News of the day, Aug 22, 1884.]

"পুরোহিত ও অনুশীলনের" নিয়মাবলী।

১। "পুরোহিত ও অনুশীলনে" সকল বিষয়েরই আলোচনা হয়।

২। "পুরোহিত ও অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধ, বিনিময়ের ও সমালোচনের পুস্তক ও পত্রিকাদি, ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী"তে সহকারী বাবু শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৩। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাক মাশুল ১৷৹ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৶৹ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

৪। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ দুই আনা মাত্র। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট,
চোরবাগান,—কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকাবলী—

১। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত... ... ... ৸৹
২। প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত... ... ... ।৶৹
৩। ব্যাকরণ প্রবেশিকা (৩য় সংস্করণ)... ... ... ৶১০
৪। হানিমানের জীবনী ... ... ।৶৹
৫। সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর ... ... ৷৷৹
৬। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর ... ... ।৹
৭। ভূ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর ... ... ।৹
৮। বংশাবলী

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

১৩০২ সাল, আশ্বিন—কার্ত্তিক।] [২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

অনুশীলন ও পুরোহিত

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

সম্পাদক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কলিকাতা।

২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, "কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

সংবাদপত্রের মতামত।

(1) "Anusilan—vol I, nos 1 and 2 (together)—"A literary journal conducted with ability. The numbers under notice contain some interesting articles, Vig, one on Budhistic Monstery at Howra and another on the history of amateur theatricals in Bengal."—Calcutta Gazette, 8th Sep, 1895.

(2) Anusilan and Purobit.—Vol II, no I.

"Devoted to literary criticism".—Calcutta Gazette, January 1st, 1896.

(3) "One of the objects of the Editor seems to be to develope the critical faculties of the young men under his educational charge, and hence perhaps the preponderance of literary and theatrical notices in the pages of the journal, under review. The Editor's own serial on the history of the Bengali stage, however a valuable contribution [illegible]) The present issue deals with the production of *Sarmistha* (শর্ম্মিষ্ঠা) on the board of the Belgachia stage. The other contributions of the Editor in this double number of the magazine, namely those headed "Khanakul-Krishnagar-Samaj" and *Bangsabali* promise valuable reading."—*Indian Mirror, Sep 15, 1895.*

(৪) "অনুশীলন—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত। বিদ্যানিধি মহাশয় সাময়িক-পত্র-জগতে সুপরিচিত; সুতরাং 'অনুশীলন' যে সুপরিচালিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। 'অনুশীলনে' সকল বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি সুপাঠ্য ও সারগর্ভ। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃতিত্ব, তিনি সেই 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়' নামজাদা লেখকগণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ পুনঃপ্রকাশে মনোযোগী না হইয়া কতকগুলি নূতন লেখক তৈয়ার করিতেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে সম্পাদকগণের এরূপ চেষ্টা ভিন্ন উন্নতির আশা নাই।"

—হিতৈষী, ১৩০২ সাল, ১ম ভাগ, ৩০ সংখ্যা।

ভরদ্বাজ-গোত্র।

(চতুর্থ প্রস্তাব।)

২০ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মুখোপাধ্যায়

(অনুশীলনও পুরোহিত, ২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৪০ পৃষ্ঠা দেখ)

২১ রামাচার্য্য

২২ রাঘবেন্দ্র, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপাল, গোপীনাথ, পার্ব্বতীনাথ

২৩ নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, যাদবেন্দ্র, মহাদেব, মাধব

২৪ গঙ্গাধর ঠাকুর, রঘুনাথ ঠাকুর, মুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীধর ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর, রতিকান্ত ঠাকুর, রাধাকান্ত ঠাকুর, রামেশ্বর ঠাকুর

২৫ গোপীরমণ

২৬ গৌরীচরণ

২৭ হরেকৃষ্ণ

২৮ নন্দলাল

২৯ জগন্মোহন

৩০ জয়কৃষ্ণ, ৩০ রাজকৃষ্ণ, ৩০ নবকৃষ্ণ, ৩০ বিজয়কৃষ্ণ, ৩০ নবীনকৃষ্ণ

উপেন্দ্রনাথ (বি, এল্)

৩১ হরমোহন ৩১ (রাজা) প্যারীমোহন ৩১ রাজমোহন

৩২ রাসবিহারী, শিবনারায়ণ, ৩২ রাজেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, ৩২ সুরেশ, পরেশ, প্রবল

গত বারে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ কীর্ত্তন করা গিয়াছে। তাঁহার পুত্রের নাম রামাচার্য্য। 'আচার্য্য' উপাধি দেখিয়া আমরা রামের বিজ্ঞতার পরিচয় পাইতেছি। রামাচার্য্যের ৬ ছয় তনয়, সর্ব্বাগ্রজাত রাঘবেন্দ্র। তৎসুত নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের ৮ আট সন্তান। সকলেরই উপনাম "ঠাকুর"। এই "ঠাকুর" সংজ্ঞা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান কালের 'পিরালীঠাকুর' বলিয়া কেহ যেন নির্দ্ধারণ না করেন। পূর্ব্বে "ঠাকুর" অতিমাত্র পূজ্যপাদ জনগণের গুণ-জ্ঞানের প্রখ্যাপক ছিল (১)। নীলকণ্ঠাত্মজ গোপীরমণ (২)। তিনি গৌরীচরণের পিতা। গৌরীচরণের হরেকৃষ্ণ নামে পুত্র জন্মে। হরেকৃষ্ণের পুত্র নন্দলাল। পুস্তকান্তরে তাঁহার নাম নন্দগোপাল। তালিকা দেখিলে আমাদের বর্ণিত বিষয়ের বোধসৌকর্য্য জন্মিবে বলিয়া, বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

নন্দলাল মুখোপাধ্যায়।—হুগলীজেলার খামারগাছী নামক স্থান হইতে আসিয়া শ্বশুরালয়ে (উত্তরপাড়ায়) বাস করেন। ইনি ঢাকার কালেক্টরী আদালতে মুন্সীগিরী করিতেন। সেকালের মুন্সীগিরিতে বেশ দশ টাকা লাভ ছিল। আজকালিই বা কোন্ নাই? ফলে তিনি সুখে সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সাবর্ণ গোত্রীয় চৈতন শ্রীরাম নিধির আত্মজা শিবানী, তাঁহার পত্নীত্বে গৃহীত হইয়াছিলেন।

নন্দলালের পুত্র জগন্মোহন, তৎকালোচিত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের চতুর্দ্দশ-সংখ্যক সৈন্য-সম্প্রদায়ের কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নানা বিভাগে কাজ করেন। তাহার পর বেনিয়ানের কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া উক্ত সৈন্য সম্প্রদায়ের সহিত পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে মিরাট নগরে কিছু দিন কাজ করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের চতুর্দ্দশ-সংখ্যক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সহিত যাত্রা করেন। ভরতপুরের যুদ্ধাবসানে সাহেবদিগকে

(১) বাবু রোহিণীনন্দন মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত "কুলসার-সংগ্রহ" ১ম ও ২য় খণ্ডে ইঁহাদের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাইবার উপায় নাই। ১২৯২সালের ৩০ শে আষাঢ়ে উহার ১ম খণ্ড ও ১২৯৩ সালে ২য় খণ্ড মুদ্রিত হয়।

(২) এই গুলি "বংশাবলিঃ" পুস্তকের সাহায্যে সংগৃহীত। ১৭৭৮ শাকে (১২৬৩ সালে) ফাল্গুনে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরামপুর তমোহর-যন্ত্রে যে এচ পিটর্স সাহেব কর্ত্তৃক উহা মুদ্রিত। 'বংশাবলিঃ' বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত পুস্তক।

ও এতদ্দেশীয় কেরাণীদিগকে লুণ্ঠিত অর্থাদি বিতরিত হয়, তদুপলক্ষে তিনি কিছু অর্থলাভ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিতেন। তাহার পর তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ বাবু হুগলীর কালেক্টরীতে চাকরী করিতে করিতে যে সমস্ত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন, পিতাপুত্রে সেই সকল সম্পত্তির উন্নতি-সাধনে উদ্যোগী থাকেন। ১২৪৯ সালে জগন্মোহন পরলোকগত হন।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১২১৫ সালের ৯ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তর ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া গ্রামে জয়কৃষ্ণ মুখেপাধ্যায়, রাজেশ্বরীর উদরে জন্ম গ্রহণ করেন। বিপুল-বিভবশালী হইলেও, জয়কৃষ্ণ বাল্যকালে যথারীতি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতেন। দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই সমস্ত শুভঙ্করী ও গণিতপ্রক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া জমিদারী ও মহাজনী হিসাব রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর উত্তরপাড়ার কোন ভদ্রলোকের পারিবারিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী বর্ণমালা ও তৎকাল প্রচলিত স্পেলিঙ্‌বুক, বাক্যাবলী প্রভৃতি ৩।৪ খানি পুস্তক পাঠ করিয়া পিতার সহিত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমোত্তরাঞ্চলে মিরাট নগরে যাত্রা করেন। সেখানে ইংরেজ বালকদিগের সহিত কিয়দ্দিন সৈনিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া মিলিটারী পে আপিসে শিক্ষানবিশী করিতে থাকেন। অনন্তর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সের সময় মিরাটের ব্রিগেড্ মেজর-আপিসে প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বালক জয়কৃষ্ণ যেমন সুখ্যাতির সহিত আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তেমনই যত্ন, শ্রম স্বীকার করিয়া সৈনিক কর্ম্মচারিগণের নিকট ইংরেজী শিখিতে থাকেন। সাহেবেরা জয়কৃষ্ণের অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বিদ্যানুরাগিতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিলক্ষণ যত্ন সহকারে তাঁহাকে উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। এইরূপে জয়কৃষ্ণ অল্পদিন মধ্যে ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তিং লাভ করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্রে ভরতপুর-যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। লর্ড কম্বর-মিয়র কর্ত্তৃক ভরতপুর-দুর্গ বিজিত হইলে, দুর্গ, কোষাগার, রাজবাড়ী

প্রভৃতি লুঠ হইয়াছিল। সেই লুন্ঠিত অর্থাদি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, সৈনিক কর্ম্মচারিগণকে বণ্টন করিয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। ভরতপুর হইতে আগ্রা যাত্রা করিয়া কয়েক মাস তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে তাঁহারা যে চতুর্দ্দশ-সংখ্যক সৈন্যের সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা ইংলণ্ড-প্রত্যাগমনের আজ্ঞা পাইলে, তাঁহারাও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ড প্রত্যাগমন কালে সকল সৈন্যই কিয়ৎকাল চুঁচুড়ার বারিকে অবস্থান করিবার পর কলিকাতায় জাহাজারোহণে ইংলণ্ড যাত্রা করিত। চতুর্দ্দশ-সংখ্যক বাহিনীর চুঁচুড়ায় অবস্থিতি কালেও তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। তাহার পরেও তিনি ঐস্থানে থাকিয়া পে আপিসে কাজ করিতেন। এই সময়েই সুপ্রসিদ্ধ সার্ হেন্‌রি হাবেলকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। হাবেলক, জয়কৃষ্ণকে বিলক্ষণ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। জয়কৃষ্ণ তাঁহার নিকট সেক্‌সপিয়রের নাটকগুলি অধ্যয়ন করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে চুচুড়ার গোরা-বারিক উঠিয়া গেলে তিনি হুগলীর কালেক্টরী আদালতে নিযুক্ত হয়েন। এইখানে থাকিয়া তিনি ইংরেজী-ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এক বৎসরের পরেই তিনি কালেকটরের মহাফেজের পদ প্রাপ্ত হন। মহাফেজের কাজ করিতে করিতেই জমিদাদারী ক্রয়ের সূত্রপাত। কয়েকখানি-মাত্র মহল ক্রয় করিবার পরেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত না হইয়া অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া জমিদারী বাড়াইতে লাগিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কালেক্টরীর চাকরী যায় এবং রেভিনিউ বোর্ডে রেজিষ্টারের পদ প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু ঐ পদ গ্রহণ করিলে জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে না বুঝিয়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া জমিদারীর উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন এবং ৬।৭ বৎসর-মধ্যে হুগলী জেলার মধ্যে একজন প্রধান জমিদার বলিয়া পরিগণিত হয়েন। হুগলী জেলার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি জন্য তিনি সাধারণের যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। কানা দামোদর উদ্‌ঘাটন, ডানকুনী, ইডেন কেনাল এবং মেদিনীপুর জেলায় শিলাই নদীর বাঁধের ও জল-নিকাশের সুব্যবস্থা কেবল তাঁহারই একমাত্র যত্ন ও

উদ্যোগের ফল। তিনি কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য এদেশে অনেক লাভজনক জিনিষের চাষ প্রবর্ত্তিত করেন। নানাজাতীয় ইক্ষু, আলু, শিম ও বেগুন প্রভৃতির চাষ, তাঁহারাই উদ্যোগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জয়কৃষ্ণ আপন জমিদারীর স্থানে স্থানে কৃষিজাত দ্রব্য-ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য অনেক হাট বাজার বসাইয়াছেন। প্রজাগণের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য কত যে পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা খাত করিয়াছেন, তাঁহার সংখ্যা হয় না, বলিলেও হানি নাই।

সাধারণ শিক্ষা বিস্তার জন্য তিনি প্রভূত অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যখন গবর্ণমেণ্ট, পল্লীগ্রামে সাধারণ শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই না করিয়াছিলেন, তখন জয়কৃষ্ণ প্রতিবৎসর আপন জমিদারীতে গিয়া গ্রাম্য পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে পুরস্কৃত করিতেন। পল্লীগ্রামে ইংরেজী ও বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের জন্য জয়কৃষ্ণ বারংবার গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে থাকেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্দ্ধেক সাহায্য পাইলে তিনি নিজাধিকারে স্কুল স্থাপন করিয়া সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের পথ প্রসারিত করিতে পারেন, এইরূপ প্রার্থনা-পত্র হইতেই রাজকীয় সাহায্যের সূত্রপাত হয়। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে উক্ত প্রথা প্রচলিত হইলে তিনি আপন জমিদারীর নানা গ্রামে প্রায় ৪০টী স্কুল সংস্থাপন করেন।১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঠশালার ও ছাত্রগণের পাঠোন্নতি দর্শনে গুরু ও ছাত্রগণকে পুরস্কৃত ও ইনস্পেকটীং পণ্ডিতপদের সৃষ্টির জন্য প্রথম প্রস্তাব করেন। উহা সরজর্জ ক্যাম্বেলের উদ্ভাবিত প্রথা নহে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এদেশে নর্ম্মাল স্কুল সৃষ্টির কথা উত্থাপন করেন। সাধরণ শিক্ষা বিস্তারার্থে জয়কৃষ্ণ বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা লিখিতে হইলে প্রবন্ধটী দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। তিনি আপনি যেমন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যানুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন, সাধারণের শিক্ষার নিমিত্তও তদ্রূপ চেষ্টা করিতেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে যখন সংহারক-মূর্ত্তিতে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন জয়কৃষ্ণ দুঃস্থ জনগণের সাহায্য জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ দান করিয়াছেন, প্রজাদিগের খাজনা মাপ করিয়াছেন, তাহাদের আহার যোগাইয়াছেন। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করেন। মেলেরিয়া জ্বরে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলা যখন প্রজাশূন্যপ্রায় হয়, তখনও জয়কৃষ্ণ আহার

নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া পীড়িত জনের পথ্যৌষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যে জয়কৃষ্ণের অশেষ সুখ্যাতি আছে। উত্তরপাড়ার কালেজ, বালিকা-বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, চিকিৎসালয়, বালির খালের পুল, হাবড়া হইতে শ্রীরামপুরের রাস্তা, জয়কৃষ্ণের সাধারণ হিতানুষ্ঠানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। হুগলী জেলার যাবতীয় রাস্তা, ঘাট, খাল প্রভৃতি যাবতীয় শুভকর কার্য্যে সংক্ষেপতঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধশতাব্দীতে এদেশে যে কোন শুভানুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার সংস্রব ও সাহায্য ছিল। সে সমস্তই তাঁহার উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের ফল। তাঁহার মত প্রবল জমিদার অতি বিরল। তিনি কত নিরন্ন প্রজার অন্ন যোগাইয়াছেন, তাহাদের চাষের জন্য বীজধান্য, গোরু, কৃষিযন্ত্র কিনিয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে উৎসাহ ও উপদেশ-দানে তাহাদিগকে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষকের অবস্থা চিত্রিত করিয়া ইংরেজ জাতিকে দেখাইবার জন্য তিনি ৫০০ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। তদ্দ্বারা ইংরেজী ভাষায় "গোবিন্দসামন্তের" সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইতে পারিয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে যে জমিদার সভা সংস্থাপিত হয়, জয়কৃষ্ণ তাহার একজন প্রধান অনুষ্ঠাতা। তিনি অনেক দিন উহার সম্পাদকের কাজ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উক্ত সভা দ্বারা দেশের যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি তাহার কতক প্রশংসা-ভাগী। সময়ে সময়ে তিনি উহাতে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তার প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা রাজনৈতিকেরা এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহার ভূয়সী সুখ্যাতি করিয়াছেন। প্রাচীন পুলিশের সংস্কার, আদালতের আমলাগণের উৎকোচ গ্রহণের প্রাবল্যও তাঁহারই উদ্যোগে অনেকটা প্রশমিত হয়। জমিদার-প্রজাস্বত্ব সম্পর্কীয় আইনের যখন যে কোন পরিবর্ত্তন বা অপরাপর আইনের প্রণয়ন ও সংশোধন হইয়াছে, তখনই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জয়কৃষ্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য চৌকিদারী সম্বন্ধে

জমিদার ও গ্রাম্যসমিতির প্রাধান্য-রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। নাথরাজ-বাজেয়াপ্তি-সম্বন্ধে তাঁহার একটী কুখ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত জীবনী আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতে ততটা দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রজাদের ষড়যন্ত্রে একবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন, কিন্তু আপীল আদালত তাঁহার প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। তাহার পরেও আর একবার তাঁহাকে কারাক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে বারেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। জমিদারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বা স্বয়ং জমিদার হইয়া অনেকেই নিরবচ্ছিন্ন সুখে সোহাগে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। অদৃষ্টচক্রের এক দিকেই তাঁহাদিগের জীবনের সীমা নিবদ্ধ থাকে, প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জয়কৃষ্ণের পক্ষে তাহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। তিনি আপন উদ্যোগে প্রভূত সম্পত্তি উপার্জন করিয়া যেমন অপার-সুখ-সাগরে সন্তরণ করিয়াছিলেন, তেমনই দুঃখের তুফানে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কত বার প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন! নির্বাত বাত্যাহীন সাগরে পোত চালনা সহজ; কিন্তু উত্তালতরঙ্গ-সমাকুল আবর্ত্তময় বারিধিবক্ষে পতিত না হইলে কর্ণধারের নৈপুণ্য বুঝিতে পারা যায় না। জয়কৃষ্ণ, সংসার-সাগরে এক জন সুদক্ষ কর্ণধার। তিনি অনেক বিপদ্ কাটাইয়া অটল ছিলেন।

অতিরিক্ত অধ্যয়ন হেতু জয়কৃষ্ণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দৃষ্টিশক্তি-হীন হয়েন। তাহার পর অষ্টাদশবর্ষ জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ কালেও তাঁহাকে এক দিনের জন্য অলস বা উদ্যোগশূন্য দেখা যায় নাই। তিনি সমভাবে সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইতেন; আপনার যাহা কিছু বলিবার থাকিত, বলিতেন; যাহা করিবার থাকিত, করিতেন; জমিদারীর কাজ কর্ম্ম নিজেই করিতেন; মামলা মোকর্দ্দমার কথা পূর্ব্ববৎ শ্রবণ করিতেন; কর্ম্মচারী-দিগকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। এই সময়ে তিনি যাবতীয় ইংরেজী, বাঙ্গালা, ও হিন্দী সংবাদ পড়িয়া শোনাইবার জন্য একজন লোক রাখিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রাদি জীবধর্ম্মের ন্যায় বিদ্যানুশীলনও তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম ছিল। তাহা না হইলে তিনি কখন বড় মানুষ হইতে পারিতেন

না। জমিদারীর কার্য্যে সুপটু তাঁহার মত জমিদার এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া গেল না।

১২৯৫ সালে ৫ই শ্রাবণ (৩) ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই তারিখে তিনি বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতাদি সদ্‌গুণসম্পন্ন পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, বাহাদুর ও সাতটী পৌত্র রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। (৪)

রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

ইনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বরে ভূমিষ্ঠ হন। যে যে বৎসর ইনি যে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পশ্চাৎ তাহার তালিকা দিতেছি; দেখিলেই পাঠকের তাঁহার উপর অনুরাগ-সঞ্চার হইবে। যথা—

১। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা—১৮৫৭। ৪ঠা এপ্রিল।

২। এফ,এ পরীক্ষা—১৮৬১ খৃষ্টাব্দ (৫)।

৩। বি, এ পরীক্ষা—১৮৬২। ২৯ মার্চ্চ।

৪। বি, এল্ পরীক্ষা—১৮৬৪। ১১ই মার্চ্চ।

৫। এম,এ পরীক্ষা—১৮৬৫। ১১ই মার্চ্চ

৬। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সদস্যপদ—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

৭। রাজ-প্রতিনিধির ব্যবস্থাপক সভার ঐ —১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

৮। ঐ ঐ (পুনর্নিয়োগ)—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

৯। "রাজা" উপাধি প্রাপ্তি—১৮৮৭। ১৬ই ফেব্রুয়ারি।

ইঁহার অপরাপর বৃত্তান্ত, লেথব্রিজ সাহেবের "গোল্‌ডেন্ বুক্ অব্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে এইরূপ আছে,—

---

(৩) পুনর্যাত্রার পর একাদশীতে।

(৪) আমার আশীর্ব্বাদভাজন শ্রীমান্ বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্তের প্রণীত প্রকাশ্যমান জয়কৃষ্ণের বিস্তৃত জীবনীর বিশেষ আনুকূল্যে ও তৎপ্রদত্ত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া জয়কৃষ্ণ বাবুর, তাঁহার পিতার ও পিতামহের বিবরণ সংগৃহীত হইল। এ জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

(৫) প্রশংসা-পত্র নষ্ট হওয়ায় মাস ও তারিখ দিতে পারা গেল না।

"Pearymohun Mookerjee C. S. I. Raja. Born 17th September 1840. The title of Rajah was conferred on 16th February, 1887, as a personal distinction, on the occasion of the Jubilee of the reign of Her most gracious Majesty. At the same time the Raja was created a Companion of the most Exalted Order of the Star of India, in recognition both of his eminent service to the state, of the position of his Family, as Zamindar of Uttarpara, and of the great public services of his late father. Is the son and heir of the late Babu Jai Krisna Mukerjee (better known as Joy Kissen Mookerjee"—as the Rajah also is known as Pearymohun Mukerjee,) Zaminder of Uttarpara, who was renowned throughout India for his splendid public spirit, his large charities, and his liberal encouragement of education. Belongs to a Kulin Brahman Family of the highest rank, was educated in the University of Calcutta, where he graduated M. A. and B. L in 1862. Having served on Comimittees from 1865 to 1879, was appointed a member of the Legislative Council of Bengal in 1879. Was appointed a member of the Viceroy's Legislative Council in 1884, and re-appointed in 1886, in which capacity he took a prominent part in the discussions of the Bengal Tenancy Bill, which drew the following remarks from the official member in charge of the Bill, Sir Steuart C. Bayly, Lieutenant Governor of Bengal:—

'And though the death of our lamented colleague, Rai Kristo das Pal Bahadur, in the middle of our discussions, was a grievous loss to them (the Bengal Zamindars), and indeed to all of us, yet their interest could hardly have found a better representative than in his successor, who, with inflexible constancy and even with a perfect knowledge of detail than his predecessor, contested every inch of ground, and displayed a temper and ability which showed how wisely the British Indian Association had made their selection'

"Is honorably known as one of the leading land-owners of Bengal.

"Residence—Uttarpara, Bengal." (6)

ফলতঃ রাজা পিয়ারীমোহন, লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী এই দুয়েরই বরপুত্র। তিনি অমায়িক পুরুষ, উদারস্বভাব, মহানুভব জন। তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রাসবিহারী ও বাবু শিবনারায়ণ বিদ্যার্থী, বিদ্যোৎসাহী ও প্রশস্তমনা মনস্বী।

(6) The Golden book of India by Sir Roper Lethbridge, K. C. I. E. New York, 1893, p 419.

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত। (১)

১৭। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ—১২৭১ সাল।

কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও উদয়কৃষ্ণ দেব (২), গোপালচন্দ্র রক্ষিত ও কালীকৃষ্ণ বসু ইহারা মিলিত হইয়া প্রথমতঃ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের (৩) পুত্র ৺ চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষের বৈঠকখানায় রিহার্সেল চালাইতেন। তৎসময়ে প্রিয়মাধব বসু মল্লিক ও প্যারীমোহন দাসেরও তথায় গতিবিধি চলিত। "প্রাইভেট্ থিয়েট্রিকাল্‌স" নামে তখন উহা অভিহিত হইত। বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে উহার নাম পরিবর্ত্তিত হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহিকা সমিতিও প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহাই ধারাবাহিক শৃঙ্খলার পূর্ব্বানুষ্ঠান।

মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" এখানকার প্রথমাভিনীত পুস্তক। হাইকোর্টের উকীল বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ এই সভার সভাপতি, ডাক্তার বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র (এল্ এম্ এস্) ইহার অবৈতনিক সম্পাদক, আর অভিনেতারা সদস্য ছিলেন। ইহা প্রথমে একটী অপ্রকাশ্য নাট্যশালা থাকে। একবার মাত্র অপ্রকাশ্য অভিনয় হইয়াছিল। ঠিক্ কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত, জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা জানা যায়, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই বা আগষ্ট

(১) শোভাবাজারের রাজা প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, প্রবীণ বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র (এল, এম, এস) ও বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ (হাইকোর্টের উকীল) এই তিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমাদিগকে এ বিষয়ে প্রায় যাবৎ প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিশেষতঃ রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অযাচিত আনুকূল্যে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

(২) রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের মধ্যম পুত্র ইনি নহেন।

(৩) কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভাগিনেয়।

মাসে ইহা নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে থাকে। তিনটী প্রকাণ্ড অভিনয় হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের আলয়ের নিম্নতলে অভিনয় হইত। এখন যাহা ২।৫ ও ২।৬ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, তাহাই রাজা দেবীকৃষ্ণের ভবন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্টে বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়, বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে যে এক পত্র লেখেন, তাহাতে কার্য্যালয়ের ঠিকানা "১নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্" লেখা আছে। ঐ পত্রপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ইঁহাদের সভাধিবেশনাদি রীতিপূর্ব্বক সমাহিত হইত।

সুসম্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ, অভিনয়-দর্শনার্থে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদকেরা ও শ্রোতৃমণ্ডলী, অভিনয়-পরিপাটীতে মহানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবাক্যে ইহার ভূয়সী সুখ্যাতি প্রচার করেন। হাইকোর্টের উকীল কবিবর বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ বিএল্ অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হন। অভিনয়াবসানে অনেক লেখালিখি সংবাদ-পত্রে মুদ্রিত হয়। বিশেষতঃ তৎকালের প্রধান সংবাদপত্র হিন্দুপেট্রিয়টে বিস্তর সুখ্যাতির কথা নিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক ইংরেজ টিকিট চাহিয়া লইয়াছিলেন।

এই স্থলে অভিনেতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল,—

১। নববাবু	মণিমোহন সরকার
২। কালীবাবু	কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
৩। কর্ত্তা মহাশয়	শ্রীপ্যারীমোহন দাস
৪। মাতাল	ঐ
৫। মন্ত্রিগণ (৪)	ঐ (৫)
৬। বাবাজী	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক
৭। বৈদ্যনাথ	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব
৮। পাহারাওয়ালা	ঐ
৯। চৌকীদার	ঐ

(৪) ছাপার দোষে মূল পুস্তকে 'মন্ত্রিগণ' পরিবর্ত্তে "মৈত্রীগণ" মুদ্রিত হইয়াছে। বলা উচিত, এ প্রহসনে 'মন্ত্রী' বা মন্ত্রিগণ নাই।

(৫) যে যে নামের অগ্রে "শ্রী" আছে, তাঁহারা জীবিত।

১০।	খানসামা	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব
১১।	সার্জ্জন	শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু
১২।	বারবিলাসিনী (১ম)	শ্রীহরলাল সেন
১৩।	ঐ (২য়)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
১৪।	প্রসন্নময়ী (নববাবুর ভগিনী)	ঐ
১৫।	মুটে (১নং)	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
১৬।	কমলা	ঐ
১৭।	ঐ (২নং)	গোপালচন্দ্র রক্ষিত
১৮।	বাবু (১ম)	ঐ
১৯।	ঐ (২য়)	কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
২০।	দ্বারওয়ান	ঐ
২১।	পয়োধরী (নর্ত্তকী)	শ্রীকালিদাস সান্যাল
২২।	নিতম্বিনী (ঐ)	রামকুমার মুখোপাধ্যায়
২৩।	মালী (বেলফুলওয়ালা)	শ্রীউমেশচন্দ্র মিত্র (এখন ডাক্তার)
২৪।	বরফওয়ালা	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দেব
২৫।	গৃহিণী	জয়কৃষ্ণ বসু
২৬।	হরকামিনী (নব বাবুর ভগিনী)	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
২৭।	নৃত্যকালী	কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
২৮।	বেহারা	——

আমরা অভিনেতৃবৃন্দের নাম যে প্রণালীতে সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছি, তাহাতে সুস্পষ্ট বোঝা যাইবে, এক এক জন কয়টী অংশ লইয়াছিলেন। অভিনেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। মণিমোহন সরকার—দর্জিপাড়ায় নীলমণি সরকারের নামে একটী গলি আছে। ইনি ঐ সরকারের পুত্র। মণিমোহন বাবু, কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি করিতেন।

২। কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—"হরিদাসের গুপ্তকথা" প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের উৎসাহদাতা।

৩,৪,৫,। শ্রীপ্যারীমোহন দাস—চার্টার্ড মার্কাণ্টাইল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী।

৬। প্রিয়মাধব বসু মল্লিক—হোগলকুঁড়িয়া-নিবাসী ছিলেন। গীত-রচনায় বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। অন্ত প্রবন্ধে তাঁহার পরিচয় ভাল করিয়া দিব।

৭,৮,৯,১০। শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব—শোভাবাজার-রাজ-পরিবারের জ্ঞাতি।

১১। শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু—গোরাবাগানের কৃষ্ণ দেওয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র। কমিসারিয়েটের বৃত্তিভোগী হেড্ ক্লার্ক।

১২। শ্রীহরলাল সেন—আহিরীটোলাবাসী গোপীনাথ সেনের পুত্র। গোপীনাথ বাবু, আলিপুর অব্জারভেটরির কর্ম্মচারী।

১৩,১৪। অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—কলিকাতা মিউনিসিপলিটির ওয়ারেণ্ট বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন।

১৫,১৬। শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৭নং দেখ।

১৭,১৮। গোপালচন্দ্র রক্ষিত—ইণ্ডিয়ান্ ফীল্ড সংবাদপত্রের প্রিণ্টার।

১৯,২০। কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—দেবীকৃষ্ণ দেবের পুত্র। দেবীকৃষ্ণ দেব, মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র।

২১। শ্রীকালিদাস সান্যাল—বর্দ্ধমান-রাজকর্ম্মচারী।

২২। রামকুমার মুখোপাধ্যায়।—তাঁহার পরিচয় অজ্ঞাত।

২৩। শ্রীউমেশচন্দ্র মিত্র—বর্ত্তমান সময়ের এক সুচিকিৎসক।

২৪। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দেব—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেবের মধ্যম ও শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেবের অগ্রজ সহোদর। ৭,৮,৯,১০, ১৫,১৬ নং দেখ।

২৫। জয়কৃষ্ণ বসু—শ্রীকালীকৃষ্ণ বসুর ভ্রাতা। ১১ নং দেখ।

২৬। কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—সার মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—অধুনা পরলোকগত। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের দেড় শত টাকা বেতনে প্রধান কর্ম্মচারিত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২৭। কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র ও রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

২৮। নাম-ধাম-পরিচয়াদি অজ্ঞাত।

বন্ধু-বিয়োগ।

হাসিছে সুধাংশু, সুনীল অম্বরে,
চালিছে কিরণ অবনী'পর।
ভূধর, তটিনী, তরু লতা-গুলি
উল্লাসে মাখিছে চাঁদের কর।
সান্ধ্য সমীরণ, করিছে শীতল
নিরাশা-পীড়িত মানব-প্রাণ;
করি' ছুটাছুটি, ফুলের নিকটে
ধরিছে সোহাগে ভাঙিতে মান।
ফুটিছে কুসুম, সোহাগে ঢলিয়া
কোমল অধরে মধুর হাসি।
হেলিয়া, দুলিয়া, নাচিয়া সলাজে
বিতরে গরবে সুরভি-রাশি।
দূরে প্রবাহিণী কল কল রবে,
বহিছে গাহিয়া মরম-গান।
বকুলের শাখে, বনপ্রিয় পাখী
পঞ্চমে ধরেছে মধুর তান।
প্রকৃতি এখন সেই একভাবে,
জীবের কল্যাণে নিয়ত রত।
স্নেহে পাগলিনী, পবিত্রহৃদয়া
সজীব দেবতা মায়ের মত।
আছে তো সকলি, পূর্ব্বের মতন,
নবীন নধর জীবন্ত ভাব।
বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ের মাঝে,
হেরি হে সতত তব অভাব।

আশা, তৃষা, মোহ— মায়া মরীচিকা,
তথাপি অন্তরে বাড়য়ে আশ।
কে জানে ছুটিয়া, হরিণের সম,
গলায় পড়ি গো সুদৃঢ় ফাঁশ!
সুমধুর স্মৃতি, অতীত-আলাপ,
ভুলিতে চাহে না কদাপি প্রাণ।
মরমের কোলে, লুকান যতনে,
পবিত্র মূরতি অতীত-গান।
গত জীবনের কত কথা আজ,
তরঙ্গের পর তরঙ্গ যেন,
আসে—চলে' যায় একে, একে, একে
মথিত করিয়া স্মৃতিরে হেন।
বিমল উষায় শ্যামল ধরণী,
কুসুম-অধরে মোহন হাসে।
স্নেহতীর্থ-ঘেরা দম্পতি-হৃদয়ে,
প্রথম প্রেম যেরূপ বিকাশে।
তেমনি একটি, সুরাগ-রঞ্জিত,
হাসিটি ফুটিলে অধর'পরে।
পুলকে নাচিত, পরাণ আমার।
মাধুরী ক্ষরিত নয়নাসারে।
কৌমুদী-বিধৌত ছাদের উপরে,
এক দিন, সখা! বদন-পানে,
চেয়েছিনু আমি, সংসার ভুলিয়া,
তুলনা করিতে হিমাংশু-সনে।
সেই এক দিন— গত দিন এবে।
গিয়াছ চলিয়া আপন ঘরে!
আপনার জন, তাহারা কেমন!
তা'রা কি তেমন যতন করে!

পিতার কোলেতে, পুত্রের মরণ

মহান্ বিশ্বের এই কি রীতি?

তোমার আদর্শে, গঠিব জীবন

স্মরিয়া তোমার উন্নত নীতি।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন সেন।

বিজয়া।

না শুনি উৎসব-রব, তিন দিনে শেষ সব,

পুনঃ সে, বিষাদ গীতে পূরিল ভারত,

নবমী অতীত হ'ল, পুনঃ দুঃখ-ভোর হ'ল,

বিজয়া-সঙ্গীতে মত্ত হ'ল যে ভারত।

এই ছিল কোথা গেল, দেখি না যে আর

সে, যে ছিল ধরা যেন দেবীর আকার

পাখী গায় শোক-ভরে ফুলের পাপড়ি ঝরে

বিজয়া-সঙ্গীত বড় বিষাদিত তান

দেবী ঐ চলে' গেল রে সম্বৎসরের তরে,

চলিল শরৎ ঋতু করিল প্রয়াণ,

দারুণ প্রখর রবি উঠিল অম্বরে।

অমনি দশমী যে, সে দৈব্য দীপ্তি হরে

সঙ্কটে তোমার স্মরি' তোমা-সনে যুক্তি করি'

অকাল-বোধনে মা! তোমার আগমন

ভুলায়ে সন্তানে ছলে একা রেখে' গেলে চলে'

দয়াময়ী! রাখ মা গো পদরজঃ দিয়ে

সংসারের নিষ্পীড়নে নিষ্পীড়িত হ'য়ে

সহে না যাতনা আর দুঃখ সহি অনিবার

অধমে অভয়-পদে স্থান দাও দীনে

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা! থাকিব কেমনে?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

পুনর্ম্মিলন।

সখী! আজি শুভদিনে হাস এক বার!
আকাশে উঠেছে চাঁদ,
ভাঙ্গিয়া লাজের বাঁধ,
পাত লো প্রেমের ফাঁদ—
লাজ-ভরে কত দিন   কাটাবে লো আর?
ফুটিল মালতী-জাতি
এমন জ্যোছনা রাতি
এমন মধুর ভাতি
এ সময়ে সখী! তুমি   হাস এক বার!
ঘুচাও ত্বরায় সখী!   বিরহ দুর্ব্বার!
দুরূহ বিরহ-জ্বালা
করিয়াছে ঝালা পালা
এই বার তুমি বালা
প্রাণে মোর কর ত্বরা   অমৃত-ঝঙ্কার!
সহি কত শিলা-পাত-বিরহ-ঝঙ্কার
বলিতে পারি না ভাষে
কেন আসি তোর পাশে
পূরে হিয়া কিবা আশে
আবেগে উথলি' উঠে   হৃদি পারাবার!
ঘুচাবে কি বল সই বিরহ দুর্ব্বার?
ফুটিয়া উঠে না ভাষা
মিটাবে কি মম আশা
ঢালিবে কি ভালবাসা
বল সই! বল তুমি   বল এক বার!
ত্বরায় ঘুচাও সখী! বিরহ দুর্ব্বার!

দারুণ প্রেমের ভার,
বহিতে পারি না আর
দেখি তব হৃদে আছে কি প্রেম অপার
কি প্রেমে গঠিত তব হৃদয় আগার?
ও প্রেম-সমুদ্র-তীরে
বসি আমি ধীরে ধীরে—
দেখিব ও প্রেম-নীরে
পড়ে কি না প্রতিবিম্ব স্মৃতির আমার।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।

১। "অনুশীলন ও পুরোহিতে" নির্ভীক সমালোচনা হইয়া থাকে, এ সংবাদ "জন্মভূমি" "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতিতে পাঠ করিয়া এই প্রবন্ধ প্রকাশার্থে পাঠাইতেছি। যখন আপনার পত্রিকায় প্রথম বারে অধিক ভাগ প্রশংসাই মুদ্রিত করিয়াছেন, তখন কিঞ্চিৎ অপ্রশংসা মুদ্রিত করিয়া ন্যায়পরতা প্রদর্শন করা কি আপনার ন্যায় নির্ভীক সমালোচকের অকর্ত্তব্য?

(ক) "পুণ্যস্রোতস্পর্শে" (৮ পৃষ্ঠা)।

'স্রোতঃস্পর্শে' এরূপ হওয়া উচিত ছিল।

(খ) "মর্ম্মস্তল" (১০ পৃষ্ঠা)।

হয় মর্ম্মস্থল, না হয় মর্ম্মতল হওয়া উচিত ছিল।

(গ) "অন্ত পরে কা কথা?" (১১ পৃষ্ঠা)।

'অন্তে পরে' ইত্যাদি হইবে।

(ঘ) মুঞ্জুরিল (২ ও ২৬ পৃষ্ঠা)।

মুঞ্জরিল হওয়া উচিত।

(ঙ) "গুণীন্ গ্রন্থকার"—(৩২ পৃষ্ঠা)।

গুণী গ্রন্থকার হইবে। "গুণীন্" শুনিলে "সাপের রোঝা" ও 'ভুতের চিকিৎসকের' কথা মনে পড়ে।

(চ) "প্যারিচাঁদ" (৪ পৃষ্ঠা)।

প্যারীচাঁদ হইয়া থাকে। "প্যারী" ঠিক্ সংস্কৃত-মূলক না হইলেও, ঈকারান্ত লেখার প্রথা আছে।

(ছ) "উদগীরণ" (২৪ পৃষ্ঠা)।

"উদ্গিরণ" এরূপ হওয়াই উচিত। "উদগীর্ণ" দৃষ্টে উদিগরণ শব্দে দীর্ঘ ঈকার দেওয়া ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়।

(জ) "ভাইয়েই"—বঙ্কিম জীবনী ।√ পৃষ্ঠা)।

"ভায়েই" হওয়া সঙ্গত। ভাই, দুই, বাই ইত্যাদি ইকারান্ত শব্দে ষষ্ঠী বা সপ্তমী যোগ করিতে গেলে ভায়ে দুয়ে, বায়ে হইবে। লেখকই তাহার বিধান করিয়াছেন। যথা—"দুয়েরই প্রয়োজন।" (১০৮ পৃষ্ঠা)। এখানে "ভাইয়েই" শব্দের ন্যায় 'দুইয়েরই' কেন লিখিত হয় নাই? বিধি সর্ব্বত্র একবিধ হওয়া কি উচিত নয়!

২। আর এক শ্রেণীর ভুল দেখাইতেছি।

ক। "সংস্কৃতপক্ষপাতীগণ"—(২০ পৃষ্ঠা)।

লেখক হারাণচন্দ্র বাবু, এখানে "সংস্কৃত পক্ষপাতীগণের" উপর কটাক্ষ করিতে ও সংস্কৃতের বিরাগ দেখাইতে গিয়াই যেন অসংস্কৃতের পক্ষপাতী হইয়াছেন! ফলে আমরা তাঁহার "পক্ষপাতীগণের" দীর্ঘ'ঈ' সমর্থন করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে এখানে হ্রসত্বে দেখিতে পাইলেই সব দিক্ বজায় হয়। বলাই বাহুল্য, 'সংস্কৃতপক্ষপাতিগণ' এরূপ হওয়া উচিত ছিল।

খ। "সতর্কতার সহিত"—(৮১ পৃষ্ঠা)।

তর্কের সহিত সতর্ক। তাহার ভাব "সতর্কতা"। ইহাতে আবার "সহিত" যোগ করিতে দেওয়া অসহ্য। যদি গ্রন্থকারের গ্রন্থ-মধ্যে এরূপ প্রমাদ থাকিতে দেওয়া যায়, তবে বালকে 'সবিনয় পূর্ব্বক নিবেদন' 'সদর্পের সহিত বলিল' এরূপ লিখিবে, এর আর বিচিত্র কি!

গ। "পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন" (৯১ পৃষ্ঠা)।

হন্ ধাতুর মনুষ্য কর্ত্তা হইলে হন্ স্থানে "ঘ্ন" হয়। যেমন "বাতঘ্ন তৈল" "পতিঘ্নী হস্তলেখা"। কিন্তু মনুষ্য কর্ত্তা হইলে "ঘ্ন" না হইয়া "হা" হইয়া থাকে। যথা—পিতৃহা, মাতৃহা, পুত্রহা ইত্যাদি।

ঘ। "পিশাচিনী হীরা" (৯২ পৃষ্ঠা।

পিশাচ জাতিবাচক শব্দ। তাহার স্ত্রীলিঙ্গে পিশাচী হইবে। পিশাচিন্ যদি ইন্‌ভাগান্ত শব্দ হইত, তবে পিশাচিনী হইত।

ঙ। "ভাষা শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্যশালী" (৬ পৃষ্ঠা)।

চ। "মর্ম্মস্পর্শী রসিকতা"(৪৩ পৃষ্ঠা)।

"ভাষা * * * সৌভাগ্যশালিনী" ও "মর্ম্মস্পর্শিনী রসিকতা" হওয়া উচিত। "ভাষা" ও "রসিকতা" স্ত্রীলিঙ্গ। উহার বিশেষণও ঐ প্রকার হই- লেই বিশুদ্ধ হইবে।

ছ। "পিতৃ-মাতৃ-আজ্ঞা" (১০১ পৃষ্ঠা)।

'পিতামাত্রাজ্ঞা' হইলে খুব সংস্কৃত যদি মনে হয়, তবে 'পিতা মাতৃ-আজ্ঞা' লিখিত হউক। সমাসে "পিতৃ-মাতৃ' হইবার নিয়ম নাই। বরং তাহাতে নিষেধ আছে। আরও এক কথা। 'মাতাপিত্রাজ্ঞা' হওয়াই আবশুক। দ্বন্দ্ব সমাসে পূজ্য শব্দ ও অল্পস্বর-যুক্ত শব্দ অগ্রে বসে। 'মাতা' সর্ব্বপূজ্যা। (১)

জ। "রূপসী-সম্বন্ধে কিছু না বলিলে সঙ্গতি রক্ষা হইবে কেন "—(১০০ ও ১০১ পৃষ্ঠা)।

"সঙ্গতি" অর্থে 'সঞ্চয়'। 'তাহার "সঙ্গতি" নাই'। ইহার অর্থ, তাহার সঞ্চয় নাই, সে নির্ধন; কন্‌সিস্‌টেন্‌স (Consistent) শব্দের অনুবাদে 'সঙ্গত' হয়। অতএব কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (Consistency) শব্দে সঙ্গতি (২) করায় দোষ আছে। কারণ, 'সঙ্গতি' অর্থে ভাষার সঞ্চার বুঝায়। কন্‌সি- টেন্‌সি শব্দের অর্থ 'সামঞ্জস্য' হওয়াই বিধেয়।

ঝ। "বক্তৃতা দিয়া" (২৭ পৃষ্ঠা)।

"বক্তৃতা দেওয়া" "বক্তৃতা প্রদান" বাঙ্গলা নয়। উহাকে ইংরাজি বলিতে হইবে। ইহার সম্বন্ধে "নব্যভারতে" (১৩০১ সাল, আষাঢ় মাসে ১৩৫ পৃষ্ঠায়

---

(১) স্থলবিশেষে উহার বিপর্য্যয় হয়।—সম্পাদক।

(২) 'সামঞ্জস্য" অর্থে মধ্যে মধ্যে 'সঙ্গতি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উহা সর্ব্বাঙ্গ- সুন্দর নয় বটে, তথাপি নিতান্তই দোষাবহ নয়।—সম্পাদক।

প্রথমে আলোচনা হয় (৩)। তৎপরে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহোদয় 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায় ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসে এক পত্রে 'বক্তৃতা দান' বিষয়ে লেখেন। বসুজ মহাশয়ও উক্ত প্রয়োগ-সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। 'বক্তৃতা করিয়া' লিখিলেই বিশুদ্ধ ভাষা হইত।

ঝ। "এলোমেলো বিশৃঙ্খল ভাব" (৫২ পৃষ্ঠা)।

"বিশৃঙ্খল" বলিলেই তো "এলোমেলো" বুঝায়। আবার "এলোমেলো" কেন?

ঞ। "কপালকুণ্ডলা ও চন্দ্রশেখরের কবির লেখনী জীবিকা অর্জ্জনের জন্য খড়চুরী ও ধানচুরীর মকদ্দমার রায় লিখিয়া অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।"—(বঙ্কিমজীবনী), ১০ পৃষ্ঠা।

"লেখনী" "অতিবাহিত" হওয়া ভুল। সময়ই অতিবাহিত হয়; কিন্তু লেখনী অতিবাহিত হয় না। এখানে কেহই অন্বয় করিতে পারিবেন না। লেখনী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে? কি চমৎকার! যদি বল সময়, অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, বলিব,—তাহা হইলেও, জিজ্ঞাসা করিব, "লেখনী" কোন্ কারক?

ট। "নিজস্বধন" (১৬০ পৃষ্ঠা)।

ইহার অর্থ নিজের ধন হয়। অতএব নিজস্য এরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু "নিজস্য" সংস্কৃত কথা। উহার অর্থ, নিজের; সুতরাং নিজস্য লিখিলে বাঙ্গালার দোষ হয়। আর "স্ব" এই শব্দের অর্থ ধন। এদিকে নিজস্ব অর্থে নিজের ধন। নিজস্ব ধন অর্থে, নিজের ধন ধন দাঁড়াইতেছে। সুতরাং "ধন" শব্দটী অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। অতএব নিজস্ব লেখাই পর্য্যাপ্ত। অথবা 'নিজস্ব' বলাই ঠিক্।

ঠ। "তরুশাখে" (২ পৃষ্ঠা)।

ড। "অজস্রধারে" (৩ পৃষ্ঠা)।

গদ্যে তরুশাখে না লিখিয়া তরুশাখায় লিখিলে ভাল হয়। অজস্রধারে না লিখিয়া "অজস্রধারায়" লিখিলেই বিশুদ্ধির মান বজায় থাকে।

(৩) "পুরোহিত ও অনুশীলনের" পাঠকদিগকে জানান আবশ্যক যে, ঐ প্রবন্ধ, এই পত্রিকা-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়েরই লিখিত।—লেখক।

৩। এইবার বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে অবিকল ইংরেজি শব্দ, ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা বিভক্তির সংযোগ, বাঙ্গালা অক্ষরেই কেবল ইংরেজি শব্দ লেখা এই তিন প্রকারের উদাহরণ প্রদর্শন করি।

(ক) "তাঁহার Haro Worship নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে।"—১৬৪ পৃষ্ঠা।

হিরো ওয়ার্‌শিপ্ Hero worship অর্থাৎ বীরপূজা—এইরূপ লেখা আবশ্যক।

(খ) "কথাটা abstraot formএ না বলিয়া একটা conoret formএ বুঝা ভাল।" (১৫৯ পৃষ্ঠা)।

এবষ্ট্রেক্‌ট ও কন্‌ক্রিট্ ফরম্—যাঁহারা না বোঝেন, লেখক তাঁহাদের জন্যে কি করিয়াছেন ? সুতরাং তাহাতে "ভাল" হইবে কিরূপে ?

(গ) "সম্পূর্ণ original ও oriental"—(১২৪ পৃষ্ঠা)।

(ঘ) "অপূর্ব্ব Tragedy" ৮০ পৃষ্ঠা।

(ঙ) "আবার Sequelস্বরূপ"—ঐ পৃষ্ঠা।

(চ) "গল্পের origin কোথায়"। ৬৩ পৃষ্ঠা।

(ছ) "তরুণ বয়সে Indian field নামক"।—৪০ পৃষ্ঠা।

(জ) "কাগজে Rajmohan's wife নামক"—৪০ পৃষ্ঠা।

"formএ" (১৫৯ পৃষ্ঠা) culture"এ (১৪২পৃ), "reactionএর" (১৫৯ পৃষ্ঠা), "Knightগণ" (৬০পৃ), "Spritএ" (৬০ পৃ) ইত্যাদি ভাষা-সঙ্কর, প্রচলিত বা অপ্রচলিত সকল ভাষাতেই হেয়।

৪। এইবার কেবল বঙ্গাক্ষরে ইংরেজি শব্দের তালিকা তুলিতেছি।

(ক) "নিখুঁৎ ফটো"। ১৫৯ পৃষ্ঠা।

(খ) "ধর্ম্মবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়াও"। ৭১ পৃষ্ঠা।

(গ) "একজন ফিলসফার সারাটা জীবন"। ১৬৪ পৃষ্ঠা।

৫। স্থানে স্থানে আমাদের প্রদর্শিত তিনটী নিয়মের দুইটী প্রবর্ত্তিত আছে,—

(ক) "আদর্শমূলক উপন্যাস (idealistic novels)"।—১৩১ পৃষ্ঠা।

(খ) "সত্যমূলক উপন্যাস (realistic uovels)"—ঐ পৃষ্ঠা।

(গ) "স্থূলঘটনামূলক গল্পে (tales)" ঐ পৃষ্ঠা।

৬। অন্য বিষয়ে আর তিনটী উদাহরণ দিব।

(১) "বঙ্গভাষর যখন সব থাকিয়াও যেন-কিছু নাই,—যখন ভাষা শব্দসম্পদে সৌভাগ্যশালী হইলেও একরূপ অচেতন ও প্রাণহীন।" (৬ পৃষ্ঠা)

"যেন-কিছু" শব্দদ্বয়ে হাইফেন অর্থাৎ ক্ষুদ্র রেখা দিয়া সমাস নিষ্পন্ন করা অপ্রথা। এ রীতিতে ভাষার পিংগলীত্ব উৎপাদন করিয়াছে। "ভাষা সৌভাগ্যশালিনী" লিখিলেই সব দিক্ বজায় হইত না? বঙ্গভাষার লিঙ্গবিচার সর্ব্বত্র হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু কোন্ স্থলে ঐ নিয়মের ব্যভিচার হয়? যেখানে শ্রুতিকঠোরতা জন্মে, সেখানে লিঙ্গবিচার দূষ্য।

যেমন—"ভাষা তেজস্বিনী, সরল ও মধুর"। এস্থলে "তেজস্বিনীকে" দেখিয়া 'ভাষা সরলা মধুরা' লিখিলে শ্রবণমধুর না হইয়া বরং শ্রুতিকঠোরই হইবে। ওখানে 'ভাষা সৌন্দর্য্যশালিনী, বলিলেই মধুরতর হয়। আর এক কথা। লেখকই অন্যত্র কহিয়াছেন, "বঙ্কিমের প্রাণময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা" (১০ পৃষ্ঠা)।

(২) ইংরাজি ভাষায় বাঙ্গালা বিভক্তি বা প্রত্যয় কেন? যদি ইংরাজি কথায় বাঙ্গালা শব্দ লিখিলে না চলে, তবে সেই ইংরাজি কথার বাঙ্গালায় লিখিয়া তার উত্তর বিভক্তি বা প্রত্যয় দেওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ"নাইট-গণ সিভ্যালরিক্ স্পিরিটে" এরূপ লিখিলেও বরং মধ্যম রকমের হইত।

(৩) "দৃষ্টান্তের দ্বারা" ২১ পৃষ্ঠা।

"দৃষ্টান্তে" বা "দৃষ্টান্ত দ্বারা" লিখিলে ভাল হইত।

শ্রীক—ম। (৪)

যে যে বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত এই পত্র-সম্পাদকের মত-দ্বৈধ আছে, এখন তৎসমুদায় পাঠকগণকে দেখাইতেছি।

১। "কবির প্রধান কার্য্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি" (১৭ পৃষ্ঠা)।

আমরা একথা অমূলক বলি। কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির কার্য্য নয়। প্রকৃতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেখানই কবির কার্য্য। বরং তত্ত্ব-নির্দ্দেশ

(৪) প্রবন্ধ-লেখক, অনেক সূক্ষ্ম ও কিয়ৎপরিমাণে অনাবশ্যক ভুল ধরিয়াছেন। কতক কতক ভ্রম মার্জ্জনীয়।—সম্পাদক।

করাই কবির ধর্ম্ম। যাহা প্রকৃত সুন্দর,—সেই সুন্দর বস্তুর আলেখ্য চিত্র করাই কবির বাহাদুরী। দেশ-ভেদে যাহা সুন্দর, সমাজ-ভেদে যাহা সুন্দর, সেই সুন্দর চরিত্রই কবির আঁকিবার জিনিস। যদি ইহাই লেখকের মনোগত ভাব হয়, তবে তিনি আমাদের সহিত একমত হউন। নতুবা কবির প্রধান কার্য্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে অমূলক বলিব।

২। "বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতে বাঙ্গালী ভাবিতে লাগিল।" ৩০ পৃষ্ঠা।

এখানে আমরা লেখককে জিজ্ঞাসা করি, "বঙ্গদর্শনের" পূর্ব্বে এমন কি কোন পুস্তক বা পত্রিকা বাহির হয় নাই, যদ্দ্বারা বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়? "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়-কুমার দত্তের সম্পাদিত তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় ও ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে বা রহস্য-সন্দর্ভে কি এমন কোন বিষয় বাহির হয় নাই, যদ্দ্বারা ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়! অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা পড়িয়া কি তত্তৎকালের লোকে ভাবুকতা শিক্ষা করেন নাই? তবে আমরা এই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, "বঙ্গদর্শন" সৃষ্টি হইবার পর বাঙ্গালী "অধিক পরিমাণে" ভাবিতে শিখিল। লেখক "অধিক" প্রয়োগ করিলেই গোল মেটে।

৩। "এই সময়ে প্রকৃতির অন্তরালে নব্যবঙ্গের নেতা, প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী, প্রকৃত সাহিত্য-গুরু জন্ম গ্রহণ করিলেন।" ৫ পৃষ্ঠা।

এখানে "পূর্ণ" ও "প্রকৃত" এই দুইটী শব্দ, অতি অসংযত ভাবে প্রযুক্ত। এখন দেখা যাউক, বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্র বাবু, সাহিত্য-গুরু কি না। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত "ব্যাকরণাদি", অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি, ভূদেব বাবুর মত "সমাজিক প্রবন্ধ", কালী-প্রসন্ন বাবুর ন্যায় গভীর ভাব পূর্ণ "নিভৃত চিন্তা" বা "প্রভাত চিন্তা" ইত্যাকার কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বা "রহস্য সন্দর্ভ" প্রণেতা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, শকুন্তলা-তত্ত্বপ্রণেতা চন্দ্রনাথ, "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রণেতা রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি কি কম প্রতিভাবান্ ছিলেন? মহাকাব্য, সকলের শক্তির অধীন নয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বা ইতি-

হাস লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে এমন কোন অমূল্য রত্ন রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি ? গদ্য পদ্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাসাদি সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত অঙ্গের তিনি কি বিশেষ সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন ? আজীবন সাধারণতঃ উপন্যাস লিখিয়াছেন,এবং সেই পথ দিয়া কীর্ত্তিশৈলে আরোহণ করিয়াছেন। তবে উপন্যাস-ভাণ্ডারে অনেকগুলি অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন বটে। তিনি উপন্যাস রাজ্যের মহারাজ। এক জন লোকের সকল রকম ক্ষমতা থাকে না এবং আশাও করা যায় না। তাই তিনি উপন্যাস লইয়া আজীবন কাটাইয়াছেন এবং উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। যে সমস্ত উপন্যাস তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় থাকিবে।

৪। "ভ্রমর আদর্শ হিন্দু রমণী নহে" (৮৮ পৃষ্ঠা)।

লেখক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য ভ্রমরের দুইটী অপরাধ বা চরিত্রের দোষ দেখাইয়াছেন। প্রথমটী ভ্রমর, স্বামীকে "সেবিকা" পাঠ লেখে নাই। দ্বিতীয়টী স্বামীকে মৃত্যুকালে বলিয়াছিল—"আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তে সুখী হই।" "সেবিকা-পাঠ" না লেখা ও "জন্মান্তরে সুখী হওয়া" এই দুইটী দোষ দেখাইয়া রক্ষিত বাবু বলিলেন, ভ্রমরকে "আদর্শ হিন্দু রমণী" বলিব কিরূপে ?

এতৎসম্পর্কে "পুরোহিত" (৫) পত্রিকায় লিখিত হয়,—

"গোবিন্দলাল হীনাবস্থায় পড়িয়া, নিজ দুঃখ জানাইয়া এবং পূর্ব্বকৃত দোষ স্বীকার ও সেইজন্য অনুতাপ করিয়া ভ্রমরকে পত্র লিখিলে, ভ্রমর, তাহার উত্তরে লিখিল "আপনার সহিত আমার ইহ জন্মে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আর নাই। ইহাতে আমিও সন্তুষ্ট, আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"ভ্রমর আন্তরিক জ্বালাতন হইলেও স্বামীর দশা-বিপর্য্যয়ে ওরূপ মিলিটারি ওয়াইফ্ (Military wife) বৎ পত্রোত্তর দেওয়া ভাল হয় নাই। এই খানেই ভ্রমরের আদর্শ হিন্দু রমণীর চরিত্র নষ্ট হইয়াছে।"

---

(৫) পুরোহিত, ১৩০০ সাল, ফাল্গুন, ১৮৭ পৃষ্ঠা। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র সরকার-লিখিত "কৃষ্ণকান্তের উইল-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা" প্রবন্ধ দেখ।

যদিও আজ কাল অনেক ঘরে গোবিন্দলালের মত স্বামীর হস্তে ভ্রমরের মত গুণবতী স্ত্রীর মৃত্যু অকালে ঘটিতেছে, এবং সেই দৃশ্য দেখাইবার জন্য কবি, ভ্রমর-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু এই পত্র লেখায় সেই আদর্শ চরিত্রের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে।

৫। মিষ্ট ভাষাও দুই এক স্থলে শব্দবিন্যাস-দোষে দুষ্ট হইয়াছে,—

(ক) "গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্কিমের গুরু" (২০ পৃষ্ঠা)

এখানে "গুপ্ত" দুই বার প্রয়োগে মিষ্টত্ব বিনষ্ট। 'গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র' বড়ই মধুর। অথবা 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' বলাও বরং ভাল।

৬। পুস্তকের স্থলে স্থলে ঐতিহাসিক ভ্রম ঘটিয়াছে। যথা,—

(ক) "হুগলী কালেজে পাঠের সময় বঙ্কিম সুপ্রতিষ্ঠিত "সংবাদ প্রভাকর" ও "সুধীরঞ্জন" নামক সংবাদ পত্রে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। —(বঙ্কিম জীবনী, ৮০ পৃষ্ঠা)

"সুধীরঞ্জন" নামে কোন সংবাদ-পত্রিকা আমাদের বোধসুলভ নয়। "সুধীরঞ্জন" একখানি পদ্যগদ্যময় গ্রন্থ। উহা কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য দ্বারকানাথ অধিকারীর প্রণীত।

(খ) "প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা লইয়া পণ্ডিত-মহলে সমস্ত ঘোঁট হইতে লাগিল। "শব পোড়ান" ও "মড়া দাহ"রূপ ভাষা বঙ্কিম,প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ; অতএব বাঙ্গালা সাহিত্য মাটী হইল,—এইরূপ ধুয়া ধরিয়া কোন কোন পণ্ডিত আপন বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। নির্ভীক বঙ্কিম কিছুতেই বিচলিত হইলেন না! স্থিরলক্ষ্যে আপন গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন।"—২৩পৃষ্ঠা।

ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া ভাব-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিলে, সকল দিক্ই শোভা পায়। এ বিষয়ে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বড়ই নিপুণ ছিলেন। বাগ্মিতা, কবিত্ব, শোকপ্রকাশ, আনন্দসংবাদ-প্রকটন সকল সময়েই তিনি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন। তৎপ্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের নানা স্থল, ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এখানে যে কথাটী উঠিয়াছে, তাহার ঘটনা বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাবু, "চারিহস্ত খাদিত গড়" ইত্যাদি অপূর্ব্ব শব্দ সৃষ্টিদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার মস্তক চর্ব্বণ করিতেছিলেন, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়কপ্রস্তাবের প্রথম সংস্করণে 'তাঁহার

প্রতিবাদ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক পরে সকলগুলি না হউক, কতকগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং "বিচলিত হইলেন না" কেমন করিয়া বলি!

৭। মতের অনৈক্য এই বার কিছু কিছু দেখাইতে হইবে।

(১) "সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ, সৌন্দর্য্য কাব্যেরও প্রাণ; সুতরাং কবির প্রধান কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি"।—১৭ পৃষ্ঠা।

অমূলক ভাষার আবরণে মুগ্ধ হইলে চলে কৈ? ইহা ঠিক কেমনে বলিব? সকল পরিবর্জ্জন করিয়া কি কবি কেবল সৌন্দর্য্যেরই স্রষ্টা হইবেন? ইহাকে "কবির প্রধান কাজ" না বলিলে বরং নির্ব্বিঘ্ন স্থানে থাকা যায়। সমাজের বিপরীত চিত্র অঙ্কিত করায় মহাদোষ। কোন বৈদেশিক বা স্বদেশীয় পরবর্ত্তী লোকে কল্পিত বর্ণনাকেও সমাজের প্রকৃত চিত্র বলিয়া মনে করিবে। ইহা দূষ্য। বাবু রাজনারায়ণ বসুজ, বাঙ্গালা ভাষা ও সহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় উহাই বলিয়াছেন। আমরা 'সুচিন্তা' পত্রিকায় ইহাই বলিয়াছি।৬

(২) "বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নৈপুণ্য, অপূর্ব্বত্ব, উদ্ভাবন শক্তি ও জাতীয় ভাব এইবার গদ্য সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল।" ২১ পৃষ্ঠা।

(৩) "স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয় ভাব, বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম প্রবেশ লাভ করিল"—(২৩ পৃষ্ঠা)

একমাত্র "জাতীয় ভাব" শব্দ প্রয়োগে আমাদের আপত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে কি জাতীয় ভাব আদৌ ছিল না? একই কথা তিন পৃষ্ঠায় বার বার দৃষ্ট হইল। পুনরুক্তি দোষও ঘটিয়াছে।

(৪) "বাঙ্গালীর দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ও কাব্য সাহিত্য এই বার আপন পথ পাইল" (২৭ পৃষ্ঠা)

বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বে কি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব পথ পাইতেছিল না? তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা যতকাল বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত না হইবে, ততদিন একথা বলা চলিবে না। এস্থলেও গ্রন্থকারের লেখনী বড়ই উশৃঙ্খল—নিতান্তই উদ্দামগতি।

(৫) "তিনি এক হস্তে পুষ্পমাল্য ও অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সমা-লোচকের আসন গ্রহণ করিলেন। (৩১ পৃষ্ঠা)

(৬) সুচিন্তা, ১২৯৯ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র।

একার্য্যে তিনি একাকী ছিলেন না। যিনি তাঁহার সাহায্য করিতেন, তিনি তাঁহার সমালোচন কার্য্যের অৰ্দ্ধেকের অধিক কার্য্যেও সাহায্য করিতেন। সেই প্রবীণ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নাম এখানে অনুল্লিখিত কেন? রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও এই সকল স্থলে বড়ই অসংযত।

(৬) "বঙ্গ সাহিত্যে তাই তখন তেমন আবর্জনা প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। কচিৎ কদাচিৎ যে দুই একখানি অসার গ্রন্থ প্রকাশ হইত, তাহাও শেষে আত্ম-পরীক্ষার ভয়ে দূর হইতে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিত।"—৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা।

"বলদ-মহিমা" প্রভৃতি অগ্রাহ্য পুস্তক, যখন "বঙ্গদর্শনের" সমালোচনার পরেও প্রকাশিত হইত, তখন এপ্রকার লেখার সার্থকতা কি?

(৮) "সমাজ যেমন আছে, ঠিক্ তেমন নহে—কিন্তু সমাজ যেমন হইতে পারে—বা হওয়া উচিত, সেইরূপ আদর্শ লইয়া তিনি তাঁহার উপন্যাসের "ছক" প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই ছক সম্মুখে রাখিয়া এক একটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।"—১৭ পৃষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র, আপনার ঐ ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য শেষাবস্থার উপন্যাসে বৈদেশিক স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র ততটা পূর্ব্ববৎ অঙ্কিত হইত না।

(৯) "এমন অকপট ও উদার-প্রকৃতি না হইলে কি প্রকৃত কবি হইতে পারে? এমন সাফ সত্য কথা বলিতে পারে, আজকার দিনে কয়টা লোক?"—৫৪ পৃষ্ঠা।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র, নিজ-জীবনী লিখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন কেন?

(১০) "মনের কথা খুলিয়া বলিলে বোধ হয় কতকটা গোঁড়ামী প্রকাশ পাইবে,—তথাপি অম্লান বদনে বলিতে পারি, সমগ্র বাঙ্গালা ভাষা একদিকে, আর একা বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে। কারণ, সমগ্র বঙ্গ-নরনারীর হৃদয়ের উপর তিনি প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।"—৬ পৃষ্ঠা

(১১) "মুখে কেহ স্বীকার করুন, আর নাই করুন, কোন না কোন প্রকারে এ যুগে বঙ্কিমের শিষ্য নয় কে? যিনি বঙ্কিমকে গালি পাড়েন, তিনিও সেই বঙ্কিমী ঢঙে "সাদার পীঠে কালি" দিয়া থাকেন।"—৭ পৃষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র একাকী একদিকে, আর বঙ্গসাহিত্য অপর দিকে ইত্যাদি

কথা অসতর্কতার পরিচায়ক। একা বঙ্কিমচন্দ্রই গুরু! তাঁহার কেহই গুরু নাই?

গ্রন্থকার, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় তাবৎ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র-সংক্রান্ত সমালোচন, প্রবন্ধ, পুস্তক ও অন্যান্য অনেক বিষয় পাঠ করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই সুখ্যাতির কথা। সেগুলির তালিকা এই,—

১। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ।

২। "জন্মভূমিতে" প্রকাশিত বিহারিলাল সরকারের লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তল ও পদ্মপুরাণ"।

৩। "সাধনায়" প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র"।

৪। "সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায়" প্রকাশিত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত প্রাচীন সাহিত্য সমালোচন।"

৫। "নব্যভারতে" প্রকাশিত বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু-লিখিত "বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব"।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুর "কাব্যসুন্দরী" এবং পুরোহিতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ নাই কি কারণে? ইহাতে দোষও ঘটিয়াছে। যথা,—

"মনরো সাহেবকে দেখিতে পাইয়াও তিনি 'সেলাম' করেন নাই।"—১৶০ পৃষ্ঠা।

ইহা ভুল। "মনরো" পরিবর্ত্তে "মেকলে" হইবে। "পুরোহিতে" (৭) এই ভুল ছাপা হয়। রক্ষিত বাবু তাহাই লিখিয়াছেন। "পুরোহিত" ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি এ ঘটনা নাই।

পুস্তকখানির ভাষা পড়িয়া সাধারণতঃ আনন্দ লাভ হইয়া থাকে এবং স্থানে স্থানে যে মনোহর বর্ণনা আছে, তাহাও বলা যাইতে পারে। এইবার কতিপয় স্থলের সুন্দর ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি। অন্যথা আমাদিগকে অবিচার-দুষ্ট হইতে হইবে। লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-গ্রহণের পূর্ব্বে বঙ্গভাষার দশা ক্ষীণা ছিল। তৎপরে তিনি লিখিতেছেন,—

(৭) পুরোহিত, ১৩০১ সাল, জ্যৈষ্ঠ, ৭৩ পৃষ্ঠা। এই প্রবন্ধ আমাদের সোদরকল্প শ্রীমান্ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-লিখিত।

(ক) "এই বার নদীতে কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। স্রোতস্বতী কুলুকুলু রবে সাগরাভিমুখে ছুটিল। সাহিত্যকাননে মধুর বসন্তের সমাগম হইল। নানা জাতীয় নয়নতৃপ্তিকর, অতিমনোহর মধুগন্ধময় ফুলদল প্রকাশিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোলে, কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমরগুঞ্জনে, পাদতল-বিধৌত তটিনীর গানে প্রকৃতি, অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চাঁদের হাঁসি, ভাবুকের সেই আত্মবিস্মৃতি সকলই মনে হয়।" (৮)

আর একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

(খ) "আমার বোধ হয়,বঙ্কিমের প্রতিভা ও মনের ক্রম-বিকাশ ঠিক পর্ব্বতের সহিত তুলনীয়। পর্ব্বত যেমন আঁকা বাঁকা,সূক্ষ্ম স্থূল,বন্ধুর ও বিশৃঙ্খলতায় অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, বঙ্কিমের প্রতিভাও সেইরূপ শৃঙ্খলা-হীন। কিন্তু, অসীমশক্তিশালিনী ও লাবণ্যময়ী পর্ব্বতমালা সুন্দর কেন? তাহা বিচিত্রময়। এই প্রস্তর, ঐ গহ্বর, ওখানে প্রস্রবণ, এই আলো, ঐ ছায়া, আবার ঐ গগনভেদী শিখর ইত্যাদি প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য, অতি বিশৃঙ্খল হইয়াও সুন্দর—অতুলনীয় সুন্দর! বিশৃঙ্খল বলিয়াই সুন্দর, অথবা এই বিশৃঙ্খলতাই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। (৯)

উপরি উদ্ধৃত অংশের তুলনা ও বর্ণনা অতিমাত্র সুশোভনা।

(গ) "চিত্র অঙ্কিত করিতে যেমন আলো ও ছায়ার প্রয়োজন, চরিত্রে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সেইরূপ আলো ও ছায়ার প্রয়োজন। যেমন কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, অমৃতে গরল, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু, তেমনই ধর্ম্মের পশ্চাতে পাপ, পাশাপাশি দুইটী বিপরীত প্রকৃতি না রাখিলে জীবনে ঘাত প্রতিঘাত হইবে কেন?" (১০)

আমরা অনেক কথা বিরুদ্ধে বলিয়াছি; অতএব সপক্ষে যাহা কেহ বলিয়াছেন, উদ্ধৃত হইল,—

(৮) বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ২৫ পৃষ্ঠা।

(৯) ৫০ ও ৫১ পৃষ্ঠা)।

(১০) ১০৮ পৃষ্ঠা)

"This is a successful prize essay on the subject of the position of the Late Babu Bankim Chandra Chatterjee in Bengali literature written by Babu Haran Chandra Rakshit, a rising young Bengli author. Babu Haran Chandra has a great command of the Bengali language. His language rises and falls with his sentiments and the cadence produces a great effect. He is a novelist himself. He has produced one character, at least that of the wicked Tribakra, which is strikingly original; and thus what a young aspirant after literary fame has to say about an old veteran of his own trade, especially at the excited moment immediately following his death, deserves a hearing. Babu Haran Chandra gives the very highest position, that of Rajarajesvar to his hero, and attempts to prove this by arguments by quotations. In one place he says that the feeling and the literary finish of George Elliot, the penetration and experience of human character of Victor Hugo, the deep and touching humour of Dickens, and the the plot interest of Scott, all of these combind make Bankim Chandra's novels so charming. In another passage he says, that if Bankim's novels be translated into various languages, he will be regarded not only as the best poet of Bengal, but as one of the best novelists of the world All this is high and enthusiastic praise, quite, in consonance with the character of a young literary enthusiast. But the sober estimate he has given of the character and writings of Babu Bankim Chandra will, perhaps be accepted by all. Babu Bankim Chandra had a master hand in delineating idealistic characters, and his language was brilliant and charming. He wrote not only novels, but articles and essays on a variety of subjects and though he was not often very deep he was always brilliant. Clearness and perspicuity, he used to say, should be the aim of every one who intended to be a good writer, and he himself added briliancy to these qualities. That he devoted his whole life to the improvement of Bengali literature, there can be no doubt, that he will occupy

the first position in that literature for a long time, is certain. The public should be greatly indebted to Babu Haran Chandra Rakshit for his elloquent essay which, though from the nature of the case, it is not very deep, is brilliant."

—Calcutta Review, No ccii. October, 1895.

"কলিকাতা রিভিউ" পত্রের লিখিত উক্ত মতের সহিত সর্ব্ব স্থলেই না হউক, সাধারণতঃ আমাদের মতৈক্য রহিয়াছে। উপন্যাস-লেখকেরা ভাষা-বিৎ, ইতিহাসজ্ঞ, দার্শনিক পণ্ডিত বা বিজ্ঞানবেত্তা নহেন, তাহা আর কাহাকেও ধারণা করিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণ মাত্রায় ঐ সকল গুণ না থাকুক, অনেকাংশে ছিল। আজকাল অনেকেই আপ-নাকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থানীয় ভাবিয়া লন। কেহ কেহ বা কোন না কোন লেখককে ইতিমধ্যে ঐ পবিত্র উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এক দল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের স্মরণ হয়, নব্যভারতে যেন কোন লেখক, এই কথা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বাবু তো "বঙ্গনিবাসী" পত্রে নাম ধরিয়াই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির প্রিয় পুত্র, বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক এই মর্ম্মে মত দিয়াছিলেন—বঙ্কিচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হও। বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, এক শ্রেণীর মতে বঙ্গের বর্ত্তমান সময়ের প্রধান ঔপন্যাসিক। সুসমালোচক প্রসিদ্ধ বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুজ "কল্পনা"-সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর গল্প-লেখার প্রশংসা করেন। অনেকের বিবেচনায় তিনি বঙ্কিম-ত্যক্ত আসনের যোগ্য। বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাস-রচনায় বহুল সুখ্যাতি-ভাজন হইতেছেন। এক শ্রেণীর তিনি উপজীব্য গ্রন্থকার।

আর, শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র বাবু, 'এই উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী, এই মত অনেকেরই মনে স্থান পাইতেছে। কিন্তু এই যে কথাটা উঠিয়াছে, তাহার খণ্ডনার্থে এইমাত্র বলি,—বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গে কেবল ঔপন্যাসিক ভাবের নেতা ছিলেন না। তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, সমালোচন, ইতিহাসাদিতে আশানুরূপ না হউক, কতক দূর অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার আসন সকলের স্পৃহণীয় বটে। সেই আসনে যাঁহারা উপবিষ্ট হইবার

বা উপবিষ্ট করাইবার বাঞ্ছা রাখেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই মাত্র ইঙ্গিতে বলিব, কেবল উপন্যাসে কৃতিত্ব প্রকাশ করিলেই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

এখানে আমরা "নব্যভারত"-সম্পাদক মহাশয়ের একটা কথার প্রতিবাদ করিব। চরিত্রাংশে "মডেল ভগিনীর" "রাধাশ্যামের" সঙ্গে "চন্দ্রশেখরের" তুলনার বিষয়, "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমে" তিনি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। কেন না, রক্ষিত বাবু বঙ্কিম-ভক্ত। তিনি রক্ষিতকে যতটা বঙ্কিম-ভক্ত ভাবিয়াছেন, তিনি তো ততটা নন। ততটা হওয়াও উচিত, কি অনুচিত, সে বিচারের ইহা প্রকৃত ক্ষেত্র নয়। সম্পাদক মহাশয়কে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিব। যিনি যে ধর্ম্মাশ্রিত, তিনি সেই মতেই কি সকল বিষয়ের বিচার করেন না? হিন্দু, হিন্দুমতে বিচার করেন। খৃষ্টান, স্বীয় শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে চালিত হন। ব্রাহ্ম, আপনাদের নিয়মে কার্য্য করিতে বাধ্য। হিন্দু হারাণচন্দ্র, হিন্দু চন্দ্রশেখরে হিন্দুত্বের ন্যূনতা দেখিয়াছেন; তাই প্রকৃত হিন্দু রাধাশ্যামকে চন্দ্রশেখরের চিত্র, লোক-লোচনের সমীপে ধরিয়াছেন। "মডেল ভগিনী" প্রণেতা উপন্যাসলব্ধনামা "বঙ্গবাসীর" কর্ত্তা বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়ের কর্ম্মচারী বলিয়া রক্ষিত বাবু ঐ তুলনা করেন নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্রের গদ্যে বর্ণনা-শক্তি রসবতী; সুকবি ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যে তেমনই অতুলনা বর্ণনা-ক্ষমতা ছিল, এই দুই কথা হারাণচন্দ্র স্বীয় পুস্তকে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। অতএব "বঙ্গবাসীর কর্ম্মচারী" বলিয়াই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ বাবুর তিনি স্তুতিকারী, এ কথা বলা কি সম্পাদক মহাশয়ের উচিত কর্ম্ম? যিনি মৃত রাজকৃষ্ণকেও সম্মান দেখাইলেন, তাঁহাকে পক্ষপাতিতা-দোষে সাপরাধ বলা বৈধ কি?

ভাষাতে ও বিষয়াংশে কোন কোন ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা বলিব, হারাণচন্দ্রের বঙ্কিমচন্দ্র-সংক্রান্ত এই পুস্তকখানি আদর পাইবার যোগ্য। এতটা না হইলেও, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরই যখন ত্রুটি বা অভাব ছিল, (কাহারই বা নাই?) তখন তাঁহার জীবনীলেখক ও সমালোচকেরও কতকটা তাহা ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আপনার কতক দোষ সংশোধন করিয়া এক দিকে নিজের মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন,—অন্যদিকে সুতরাং বঙ্গভাষার গৌরব

বাড়িয়াছে, সেইরূপ শ্রীমান্ রক্ষিত বাবু শোধনকার্য্যে অগ্রসর হইলে, তৎকৃত কর্ম্ম, বিশুদ্ধির জন্য অধিকতর আদরণীয় হইবে। শুদ্ধাশুদ্ধ বোধ প্রথম প্রথম সকলের শক্তিসাধ্য থাকে না। যে আডিসন্ ও গোল্ডস্মিথ্, এখন যত সমাদৃত, জন্সন্ কর্ত্তৃক তাঁহাদের দোষ শোধিত না হইলে, কি তাঁহাদের এত দুর সমাদর লাভ হইত? অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা, বিদ্যাসাগরের হস্তে প্রথম প্রথম শোধিত যদি না হইত, তবে কি দত্তজের এতটা গৌরব প্রাপ্তি ঘটিত? (১১)

শেষে সংক্ষেপে এইমাত্র বলি, দোষ ও ত্রুটি থাকিলেও, "বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম" আলোচনীয় ও পঠনীয়।

সমালোচনা।

১। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ১৩০৩ সালের এই পঞ্জিকা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পঞ্জিকার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ তো রাখিয়াছেই; তদ্ভিন্ন ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ও নূতন বিষয়ের সন্নিবেশন হইয়াছে, দেখিলাম। বঙ্গদেশের সম্প্রতি এক বিলাতী অনুকরণে কুরীতির প্রাদুর্ভাব পড়িয়া গিয়াছে। এই গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভারি নকল চলিতেছে। ক্রেতারা এ বিষয়ে সাবধান হইবেন। আসলে ও নকলে স্বর্গ-নরক প্রভেদ।

২। সংস্কৃত-ব্যাকরণাঙ্কুর—শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্ন-সঙ্কলিত। সংক্ষেপে সংস্কৃত-ব্যাকরণের কতিপয় স্থূল স্থূল পাঠোপযুক্ত বিষয় নিবদ্ধ আছে।

৩। প্রতিধ্বনি। বিগত বৈশাখ হইতে এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত থাকে। প্রচলিত

---

(১১) এই পত্রিকার ২৫৪ পৃষ্ঠায় আমরা বলিয়াছি, রক্ষিত বাবুর নির্দ্দেশিত "সুধীরঞ্জন" নামক কোন সংবাদ-পত্র নাই। "সাধুরঞ্জন" না বলিয়া হারাণচন্দ্র বাবু ভ্রমক্রমে "সুধীরঞ্জন" লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে (১২৫৩ সালে) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকতায় উহার প্রকাশ হয়।—লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী ৬৯ পৃষ্ঠা ও "নবজীবন" দ্বিতীয় ভাগ, ৭২৫ পৃষ্ঠায় "বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস" দেখ।

মাসিক পত্র হইতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি ইহাতে উদ্ধৃত হয়। ইহা অবশ্যই প্রশংসার কথা। তবে নগণ্য পত্রের ও নগণ্য লেখকের রচনা কখন কখন সমুদ্ধৃত হইয়া থাকে। তাহা আমাদের অনুমোদনীয় নয়। সম্পাদকের লিখিত নূতন প্রবন্ধ গুলি পাঠোপযোগী। কোন কোন রচনায় বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছে, দেখা গিয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ করি, সাধু উদ্দেশ্যে যেন ইহা অটল থাকে।

৪। পঞ্চপুষ্প—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব প্রণীত। এই গ্রন্থকার "রাজা" উপাধিপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমরা উপাধির বড় পক্ষপাতী নহি। তবে সৎপুরুষে সুপাত্রে বিদ্বান্ জনে উপাধি প্রযুক্ত দেখিলে হৃষ্ট বৈ রুষ্ট হই নাই। বিদ্যাদেবীর সেবক, উপাধি-মণ্ডিত হইলে বেশ শোভা পায়। গ্রন্থকর্ত্তা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উদ্দেশ্য সাধু। পুস্তক-প্রণয়নে তিনি আপনার হৃদয়ের ঔন্নত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। "ইতিহাস পাঠের ফল" দেখিয়া তাঁহার মনের গতি কেমন সূক্ষ্ম, তাহার প্রমাণ নিরীক্ষণ করিতেছি। পুস্তকটী নির্দ্দোষ নয়। আশা করি, তাঁহার উদ্যোগে সাহিত্যের ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল দেখিব।

৫। শিক্ষারত্নম্—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীদীননাথ বিদ্যারত্ন-সঙ্কলিত। ইহাতে বিদ্যার্থিবৃন্দের শিক্ষণীয় বিষয়, যথাসম্ভব লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রণালী, নূতন ধরণের। সাহিত্যের শিক্ষা-পক্ষে এতদ্দ্বারা ছাত্রকুলের বিস্তর আনুকূল্যের আশা করা যায়। বিশেষতঃ, স্থূল স্থূল প্রয়োজনীয় বিষয় সমুদয়, সহজে বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত গ্রন্থকারের চেষ্টা দেখিলাম। ভুল ও ত্রুটি যে ইহাতে নাই, তাহা বলি না। দুই চারি বিষয়ের এক একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) বানানের সাধারণ ভ্রম শীর্ষকে ৮৪ পৃষ্ঠায় "আবশ্যকীয়" অশুদ্ধ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরাই "অনুসন্ধানের" ষষ্ঠ খণ্ডে "বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা" প্রস্তাবে প্রথমতঃ উহা ভুল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, বিদ্যারত্নও উহাকে অবিশুদ্ধ বলেন। আমরা ঐ লেখার পরেই প্রমাণ পাইয়াছি, "আবশ্যক" বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হইতে পারে। সুতরাং বিশেষ্য "আবশ্যক" শব্দে 'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করিয়া "আবশ্যকীয়" সিদ্ধ করিলে তাহা ভুল হইতেছে না। আমরা নিজ ভ্রম

শোধন করিয়াছি ; এখন বিদ্যারত্নের "শিক্ষারত্নে" উহার শোধন হউক।

(২) আর এক কথা। ২১৬—২৯৭ পৃষ্ঠায় বিষয়টীর সন্নিবেশ প্রথায় ত্রুটি আছে। তাহারও যেন ভবিষ্যতে সুব্যবস্থা হয়।

(৩) আর এক শ্রেণীতে গোলযোগ দেখিলাম। বিদ্যারত্ন, শুদ্ধাশুদ্ধের এইরূপ ভাগ করিয়াছেন,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নঙ	নঞ
অস্তি	অস্থি (Bone)
সর্গ	স্বর্গ (Heaven)

এ স্থলে সঙ্কলয়িতার হৃদ্গত অভিপ্রায় অস্পষ্ট। নঙ্ একটী প্রত্যয় আছে। সুতরাং ভুল নয়। তবে নিষেধবাচক "নঞ" স্থলে প্রত্যয়বাচক 'নঙ' লিখিলে ভুল হইবে। অস্তি ও অস্থি দুইই নির্ভুল। "অস্তি" (ক্রিয়াপদ) লিখিতে 'অস্থি' (বিশেষ্য পদ) লেখা কি ভ্রমের কার্য্য? সর্গ ও স্বর্গ শুদ্ধ। প্রথমের অর্থ—সৃষ্টি। আর "স্বর্গ" অর্থে দেবলোক। ইহাও সুব্যক্ত হওয়া উচিত।

(৪) স্ত্রীলিঙ্গ 'অজহল্লিঙ্গের' দৃষ্টান্ত ও উল্লেখ নাই। বিংশতিঃ পুরুষাঃ, ত্রিংশৎ ফলানি, চত্বারিংশৎ নার্য্যঃ ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ 'অজহল্লিঙ্গের' দৃষ্টান্ত।

ফলে ত্রুটি প্রভৃতি সত্ত্বে পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে, ইহা আবশ্য স্বীকার্য্য।

৬। নীতিশতক—শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সঙ্কলিত। এই সংগ্রহ-পুস্তকখানিতে সুনির্ব্বাচিত কবিতা ও সরল বাঙ্গালায় তাহার পদ্যানুবাদ নিবেশিত আছে। সংগ্রহ উত্তম হইয়াছে। চাণক্যের শ্লোক ব্যতিরেকে অন্যান্য উৎকৃষ্ট শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সংগ্রহকার সুবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন। কেননা, কেবল চাণক্যের সংগ্রহ, ইতিপূর্ব্বে নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বটতলার অসংখ্য প্রচারাণ ভিন্ন সুশিক্ষিত বাবু সারদাচরণ মিত্রজ (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট), পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু ঈশানচন্দ্র বসুজ, বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী— ইহাঁদের সঙ্কলিত চাণক্য উত্তম গ্রন্থ। তাহার উপর কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে হইলে, যাহা যাহা আবশ্যক, অবিনাশচন্দ্র বাবু তাহার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সঙ্কলিত "নীতিশতক" সুপাঠ্য গ্রন্থ, তাহার সন্দেহ নাই।

[বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ও প্রামাণিক জীবনচরিতের আদর্শ পুস্তক]

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ... ৸০ আনা।

(1) "As one of the framers of Bengali language and literature Akshayakumar's memoir possesses a general interest and importance."—Bengal Administration Report, 1885-86, pp 822-23.

(২) "অক্ষয় বাবু বাঙ্গালীর ঘরে কোহিনুর। * * মহেন্দ্র বাবু তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া, বাঙ্গালার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—[সঞ্জীবনী, ১২৯১ সাল, ২৮শে ভাদ্র।]

(৩) "এই জীবনী লিখিতে, গ্রন্থকার অনেক অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন।"—[পতাকা, ১২৯২ সাল, ১৩ই ভাদ্র।]

(৪) "গ্রন্থকার, অক্ষয় বাবুর ন্যায় ব্যক্তির জীবনের চিত্র সাধারণের সুলভ করিয়া, একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন।"—[বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯২ সাল, আশ্বিন মাস।]

(৫) "অক্ষয় বাবুর ন্যায় এরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, গভীর গবেষণা, সারগ্রাহিণী শক্তি, কোন বঙ্গীয় লেখকের নাই। সুখের বিষয়,—অক্ষয় বাবুর এই সমস্ত গুণ, অনেকাংশে তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ে বর্ত্তিয়াছে।„—[ঢাকাপ্রকাশ, ১২৯৪ সাল, ৬ই পৌষ।]

(৬) "আমরা মহেন্দ্র বাবুর প্রসাদাৎ অক্ষয় বাবুর এমন বিস্তৃত জীবনচরিত বঙ্গভাষায় গ্রথিত দেখিয়া, বাস্তব অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি।"—[সারস্বত পত্র, ১২৯২ সাল, ২৪শে আশ্বিন।]

(৭) "মহেন্দ্র বাবুর ভাষা পরিপাটী এবং জীবনচরিত লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট আছে।"—নব্যভারত, ১২৯২ সাল, মাঘ।"]

(৮) "আর্য্যদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। * * অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া যে, মহেন্দ্রবাবু ভাল করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"—[দৈনিক, ১২৯২ সাল, ১৮ই ভাদ্র।]

(৯) "লেখকের রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে। ভাষা স্থানে স্থানে অতি মনোরম।"—[তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৭ শক, ১লা মাঘ।"]

(10) "It gives evidence of great research and industry, is well-arranged, well written and exhanstive."

—[Indian nation, Sep. 14th, 1884]

(11) "The life of such an individual is full of solid instruction and Mahendranath Roy vidyanidhi has done a service to his country men."—[Indian Mirror, Nov. 24, 1884.]

(12) "The language of the work under notice is *chaste* and *simple* and the book is replete with interesting incidents and faithful descriptions throughout"—[News of the day, Aug 22, 1884.]

"পুরোহিত ও অনুশীলনের" নিয়মাবলী।

১। "পুরোহিত ও অনুশীলনে" সকল বিষয়েরই আলোচনা হয়।

২। "পুরোহিত ও অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধ, বিনিময়ের ও সমালোচনের পুস্তক ও পত্রিকাদি, ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী"তে সহকারী বাবু শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৩। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাক মাশুল ১৷৹ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৵৹ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

৪। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান,—কলিকাতা। } শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকাবলী—

১।	অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত	৸৹
২।	প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত...	।৶৹
৩।	ব্যাকরণ প্রবেশিকা (৩য় সংস্করণ)...	৵১৹
৪।	হানিমানের জীবনী	।৵৽
৫।	সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর	।৹
৬।	স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর	।৹
৭।	ভূ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর	।৹
৮।	বংশাবলী (যন্ত্রস্থ)	

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।